প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৫৮
মিহিরকুমার দাশ

প্রকাশক

শ্রীজানকীনাথ বসু, এম-এ
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১ শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

মুদ্রক

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চৌধুরী
লোকসেবক প্রেস
৮৬এ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-১৪

উৎসর্গ

মা ও বাবা

শ্রীচরণকমলেষু

সূচীপত্র

ভূমিকা

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) বাংলা সাহিত্যের এক অতি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর নীলদর্পন (১৮৬০) নাটকটি যে ঔৎসুক্য এবং উত্তেজনা একদা সৃষ্টি করেছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। অনেকেই Uncle Tom's Cabin এর সঙ্গে এই গ্রন্থটির তুলনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে আর কোন গ্রন্থ বোধ হয় এমন জনপ্রিয়তা এবং ঐতিহাসিক মর্যাদার অধিকারী হয়নি। কিন্তু দীনবন্ধুর পরিচয় শুধু নীলদর্পণ রচয়িতা হিসেবে নয়, তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং হাস্য রসিক। দীনবন্ধুর প্রথম নাটক ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হলেও তার অনেক আগে থেকেই তাঁর সাহিত্য জীবন সুরু হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' সমকালীন অনেক লেখকের মতই তাঁরও সাহিত্য চর্চার সূচনা। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের কিছু কাল আগে থেকে তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে আর তাঁর শেষ রচনা সুরধুণী-কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড তাঁর মৃত্যুর তিন বছব পরে প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধুর প্রতিভা এবং তাঁর দান বাংলা সাহিত্যের সমালোচকেরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত তাঁব সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। বাংলা সাহিত্যের আর কোন প্রধান লেখক এতটা অবহেলিত হন নি। দীনবন্ধুর কোন জীবনী নেই, তাঁব সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থও নেই। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত রচনা অবশ্যই রচিত হয়েছে।

দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্য কীর্তির আলোচনা সুরু হয় তাঁর জীবিতাবস্থায় বিভিন্ন পত্রিকায়।১ তাঁর কাব্য নাটকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি এখন লুপ্ত প্রায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রামগতি ন্যায়রত্নের

১। শ্রীযুক্ত রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর নীলকরদিগেব বিপক্ষে 'নীলদর্পন' নামক একখানি সর্বজন প্রশংসনীয় ও অত্যুৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিয়া বঙ্গবাসীর অশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। এই নাটকের কয়েকটি অশ্লীল ভাগ পরিত্যাগ করিলে ইহাকে আমাদিগেব বঙ্গভাষার সর্বোৎকৃষ্ট প্রথম নাটক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গদেশে হিতান্বেষী শ্রীযুক্ত মেংলং সাহেব উক্ত নাটক ইংরেজী ভাষায় ভাষান্তরিত করিবার জন্য একমাস কারাবাস দ্বারা রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইহা জার্মান রুশিয়ার ভাষাদ্বয়েও ভাষান্তরিত হইয়াছে, এবং রুশিয়ার প্রধান প্রধান নাট্যশালায় ইহার অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গসুহৃদ, ৫ম সংখ্যা ১ম ভাগ, অগ্রহায়ণ (১২৭৯) ১৮৭২

বাঙগালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থে দীনবন্ধু সম্বন্ধে প্রথম কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কাজেই দীনবন্ধুর নাটকের আলোচনা খুব দীর্ঘ বা গভীর সমালোচনামূলক হওয়া সম্ভব ছিল না। প্রধানত তা তথ্য পরিচায়িকা। রামগতি ন্যায়রত্ন দীনবন্ধুর প্রহসনগুলির আলোচনা করেছেন এই ভাষায়—"বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী ও জামাই বারিক এ তিন খানি প্রসহন। দীনবন্ধুবাবুর বিদ্যা, বুদ্ধি, রসিকতা ও উপাখ্যান রচনাচাতুর্য যেরূপ প্রসিদ্ধ, এই তিনখানিই তাহার উপযুক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এই তিন পুস্তকেরই আদ্যোপান্ত হাস্যরসে পরিপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে করুণ রসেরও আবির্ভাব আছে। সেগুলিও অতি মনোহর হইয়াছে। কিন্তু কনকবাবু বিজ্ঞ লোক হইয়াও স্কুলের অল্প বয়স্ক ছেলেগুলিকে অমনতর বেলাল্লাগিরি কাজ করিতে শিক্ষা দিয়া ভাল করেন নাই। আর তা ছাড়া ঐ ছেলেগুলো বাসর ঘরে শালী শালাজ প্রভৃতি সাজিয়া যে ঘোরতর ইয়ারকি দিয়াছে, প্রৌঢ়া যুবতীরাও সকলে সেরূপ পাকা ইয়ারকি দিতে পারে না। সুতরাং সেগুলি কিছু অস্বাভাবিক হইয়াছে।"

"সধবার একাদশী খানি মদের কথাতেই আরব্ধ ও মাতালের কথাতেই পর্যবসিত। ইহাতে হাস্যরসোদ্দীপক অনেক বিষয় বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু আদ্যোপান্ত অশ্লীল বখামি ও মাতলামীর কথাতেই পরিপূর্ণ। সমাজ প্রচলিত কোন দোষের সবিস্তর বর্ণন, সেই দোষ জন্য অনিষ্ট সংঘটন ও তৎপরে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যক্তির অনুতাপ ও চরিত্র শোধন প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে বর্ণন করিয়া সেই দোষের প্রতি সমাজের ঘৃণা উৎপাদন করাই, বোধ হয়, প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ কতকগুলো বখামীর গল্প লিখিলেই যদি প্রহসন হইত, তাহা হইলে কলিকাতার মেছোবাজার...... প্রভৃতি স্থানে দৈনন্দিন যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়, সেইগুলি অবিকল লিখিয়া লইলেও অনেক প্রহসন হইতে পারিত। উল্লিখ্যমান প্রহসনে অটল ও নিমেদত্ত বরাবর সমান মাতলামী ও বেশ্যা পল্লীতে লইয়া সমান ঢলাঢলি করিয়াছে। তাহাদের চরিত উত্তমরূপে চিত্রিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তৎপাঠে সমাজের কিছু মাত্র শিক্ষালাভ নাই। সুতরাং ওরূপ বিবরণ লিখিয়া প্রহসন রচনার কি প্রয়োজন ছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ফলত বড়ই দুঃখের বিষয় যে দীনবন্ধুবাবুর ন্যায় সুসামাজিক লোকের হস্ত হইতেও এরূপ জঘন্য পদার্থ বহির্গত হইয়াছে"।১

১। রামগতি ন্যায়রত্ন, **বাঙগালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব**, ৪র্থ সংস্ক (১৩৪২) ১৯৩৫, ২৩৩-৩৪।

রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থে গত শতকের নৈতিক বুদ্ধির প্রকাশ প্রায় সর্বত্র ঘটেছে। ফলে সাহিত্যের ইতিহাস অনেক সময়েই নৈতিক মানদণ্ডে আলোচিত হয়েছে। অবশ্য রামগতি ন্যায়রত্ন যে সর্বত্রই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন এমন নয়। কোথাও কোথাও নতুন সাহিত্যকে সমালোচকের দৃষ্টিতেও গ্রহণ করেছেন। লীলাবতী নাটকের আলোচনা কালে তিনি এই দৃষ্টির অধিকারী।১

দীনবন্ধু মিত্রের পর বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব প্রথম দীনবন্ধুর জীবনী ও সাহিত্য কীর্তির পরিচয় দুটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকাশ করেন।২ এই আলোচনা সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত স্পর্শে, চিন্তার গভীরতায় ও সমালোচনায় দীনবন্ধু মিত্র সংক্রান্ত আলোচনায় পরবর্তী লেখকদের আদর্শ হয়ে আছে।

পরবর্তী আলোচক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর Literature of Bengal গ্রন্থে একাধারে ঐতিহাসিক ও রসবেত্তার আসন গ্রহণ করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের জীবন ও সাহিত্য কীর্তির পরিচয় দানে তাঁর দৃষ্টি কোথাও বিভ্রান্ত হয়নি। সাধারণত সমকালের বর্ণনা ও আলোচনায় অধিকাংশ লেখকের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার মাত্রা লক্ষ্য করা যায় কিন্ত রমেশচন্দ্র তার ব্যতিক্রম। নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী, সধবার একাদশী, জামাইবারিকের আলোচনায় দীনবন্ধু ও ঈশ্বর গুপ্তের হাস্যরস ও ব্যংগ রসের পার্থক্য রেখাটি নির্ণয় করেছেন সমালোচকের দৃষ্টিতে।

"The lash of Iswar Chandra's satire cuts deep, Dinabandhu's milder and gentler admonitions inflict no wound, but hold up vice

১। দীনবন্ধুবাবু খুব রসিক লোক। তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অনেক খোশগল্প সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সেইগুলি পুস্তক মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন। সেরূপ করায় অনেক স্থলেই মধুর হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন কোন স্থলে বোধ হয় সেই গল্পগুলি প্রকাশ করিবার জন্যই সেই সেই প্রকরণের অবতারণা করিয়াছেন। কন্যাপ্রদর্শনাবসরে বধূয়া ভৃত্যকে আনয়ন করিয়া তন্মুখ হইতে আলপকে সালপকে, লোকে ইত্যাদি উড়িয়া শ্লোক প্রকাশ করা এবং মাতাল সভায় বস ও ভূতের বিচার করাই তাহার প্রমাণ। আমাদের বিবেচনায় ঐগুলি নিতান্ত অপ্রাসংগিক হইয়াছে। গ্রন্থকার হেমচাঁদের বক্তৃতামুখে পয়ারকে গয়ার বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিই বলুন দেখি, লীলাবতী, সারদাসুন্দরী ও ললিত প্রভৃতির মুখে যে সকল দীর্ঘ দীর্ঘ মাইকেলী ছন্দ নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহা কি গয়ার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে! যাহারা লীলাবতীর অভিনয় দর্শন করিয়াছেন, তাহারা বুঝিয়াছেন, ঐ সকল কবিতা শ্রোতার কিরূপ কর্ণশূল হয়। রামগতি ন্যায়রত্ন, **পূর্বোক্ত** ২৭০-৭১।

২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, **রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা** (১২৮৩) ১৮৭৬।

only in its natural and hideous colours. Iswar Chandra is a more powerful satirist, Dinabandhu is a pleasanter humourist. Iswar Chandra's ready and witty verse was the war cry of his party, and the barbed and pointed shafts of his vigorous if course sarcasm were the weapons of their war. Dinabandhu waged no party strife; his good natured humour spread a sunshine of gladness around him, and his ridicule of vice and folly was appreciated by all".১

রামগতি ন্যায়রত্ন ও রমেশচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁদের সাহিত্যের ইতিহাসে। কিন্তু রাজনারায়ণ বসু তাঁর বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য২ গ্রন্থে সাধারণভাবে নাটক সম্পর্কেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। নাটকের আলোচনায় তিনি লিখেছেন—"গম্ভীর ভাবের প্রথম শ্রেণীর নাটক এখনও আমাদিগের ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর হাস্যকর নাটক প্রকাশিত হইয়াছে বটে, রামনারায়ণ তর্করত্ন ও দীনবন্ধু মিত্র তাহাদের প্রণেতা। ইহার মধ্যে রামনারায়ণ শ্রেষ্ঠ। ইঁহাদিগের প্রণীত গম্ভীর নাটক রচয়িতাদিগের মধ্যে যে স্থানে হাস্যরসের বর্ণনা আছে সেখানে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে।" রাজনারায়ণ বসু নাট্যকার হিসাবে রামনারায়ণকে শ্রেষ্ঠত্ব দিলেও সমকালের দৃষ্টিতে তা গৃহীত হয়নি। বস্তুতঃ এই তিনটি সাহিত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধু সর্বত্র তাঁর যথার্থ মর্যাদা পান নি। সমকালীন পত্র পত্রিকায় নাটক সম্পর্কিত আলোচনায় বিভিন্ন নাট্যকারের পরিচয় আছে। কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত 'বান্ধব' পত্রিকায় নাটক সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়।৩ মধুসূদন, রামনারায়ণ, দীনবন্ধু মিত্র ও অন্যান্য নাট্যকারের আলোচনায় লেখক সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন—যদিও কোথাও কোথাও তাঁরা নৈতিকতার মানদণ্ডে আলোচিত হয়েছেন।

একালে অবশ্য সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ করে নাট্য সাহিত্যের বা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে দীনবন্ধুর আলোচনা কিছু হয়েছে। এই আলোচনাগুলি তথ্যধর্মী, আর যেখানে সমালোচনা-দৃষ্টি প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে দীনবন্ধুকে বুঝতে বাধা সৃষ্টি করেছে আধুনিক রুচি। *The Bengali Drama, Its*

১। Dutt, Ramesh Chunder, *Literature of Bengal* (revised edition) 1895, 190-1.

২। রাজনারায়ণ বসু, **বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য**, (সম্বৎ ১৯৩৫) ১৮৭৮।

৩। কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত **বান্ধব** শ্রাঃ, ভা, (১২৮৩) ১৮৭৬, ১১৭-১১৯।

Origin & Development গ্রন্থে১ প্রভু গুহঠাকুরতা দীনবন্ধুর নাটকগুলির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি নীলদর্পণ নাটককে বলেছেন—'Nildarpan is an insignificant production. It is neither well-written nor does it lend itself to successful production on the stage.'

যদিও নবীনতপস্বিনীর প্রধান চরিত্র ও লীলাবতীর কাহিনী প্রভু গুহঠাকুরতার গ্রন্থে প্রশংসিত হয়েছে, তবু হাস্যরসিক হিসাবে দীনবন্ধুকে তিনি উচ্চ মানের অধিকারী বলেন নি এবং দীনবন্ধুর মধ্যে গ্রাম্যতা, রুচিবিকার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করেছেন।২

বর্তমান শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্য রচনা হিসেবে স্মরণ করতে হয় মহেন্দ্র নাথ দত্তের একটি প্রবন্ধ৩। প্রবন্ধটি গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পর এই আলোচনায় চিন্তার এবং ভাবনার নতুন উপকরণ পাওয়া গেল। দীনবন্ধু সমকালের পরিচয় এবং সেইকালের প্রেরণা কি ভাবে তাঁর সাহিত্যে কাজ করেছে, দীনবন্ধুর ভাষা ও মানসিকতা, নীলদর্পনেব ইংরেজী অনুবাদক৪ ইত্যাদি নিয়ে তিনি নতুন প্রশ্ন তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। অনুরূপ মূল্যবান সমালোচনামূলক প্রবন্ধ(৫) লিখেছেন মোহিতলাল মজুমদার। তিনি তাঁর প্রবন্ধে দীনবন্ধুর নাট্যকীর্তি ও নাট্যস্বভাবের একটি বিশিষ্ট পরিচয় উপস্থিত করলেন। প্রকৃত পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধের পর মোহিতলাল মজুমদারের এই আলোচনাটি বিশিষ্ট সংযোজন। মোহিতলাল দীনবন্ধু-প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রকৃত humourist এর ক্ষমতা দীনবন্ধুব নাটকগুলিতে হাস্য ও করুণের সংমিশ্রণে, জীবন্ত ভাষা ব্যবহারের যে উজ্জ্বল তা মোহিতলাল এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন।

১। Guha Thakurta, P, *The Bengali Drama, Its Origin & Development,* 1930.

২। 'Dinabandhu was a born humourist, but humour was of a rather peculiar kind. It was coarse and even indecent at times. Guha Thakurta P, ibid.

৩। Dutt, Mohendra Nath, *Appreciation of Michael Madhusudan and Dinabandhu Mitra,* 1931.

৪। 'One of his (Rev. Edward Stewart) advanced students, named Ramchandra translated the "Nildarpan" into English and he himself revised the language.' Dutt, Mohendra Nath, ibid, 34.

৫। মোহিতলাল মজুমদার, দীনবন্ধু **আধুনিক বাংলা সাহিত্য, (১৩৪৩)** (১৯৩৭)।

সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(১) গ্রন্থে দীনবন্ধুর নাটকগুলির ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন। চরিত্রসৃষ্টি, কাহিনীগঠনের প্রতিভা, মধ্যে মধ্যে অসার্থকতার কারণও সংগতভাবে প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে এর চেয়ে দীর্ঘ আলোচনার স্থান নেই।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত The Indian Stage(২) গ্রন্থের একটি বিভাগকে 'Dinabandhu Era' বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য নাটকের বিচার-বিশ্লেষণে ও ইতিহাসের চেয়ে রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের কথাই এই গ্রন্থের বিষয়। কিন্তু দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে কিছু সুচিন্তিত মন্তব্য এখানে আছে। অবশ্য অজিতকুমার ঘোষ তাঁর বাংলা নাটকের ইতিহাস (৩) গ্রন্থে দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলির দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং তাঁর অনেক কথাই মূল্যবান। পরবর্তী আলোচক জে, সি, ঘোষ তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস(৪) গ্রন্থে দীনবন্ধুকে পূর্ববর্তী নাট্যকারদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করলেও নাট্যকার হিসেবে বড় মনে করেন নি। নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী ও লীলাবতী সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"Their plots are muddled, their characters are unreal, and their dialogue is lifeless and unatural. Navin Tapaswini comes to life only in the comic scenes where Jaladhar, based on Shakespeare's Falstaff, appears."(৫)

বস্তুত সুশীলকুমার দে'র গ্রন্থেই(৬) সর্বপ্রথম দীনবন্ধুর সমগ্র নাট্য-সাহিত্যের একটি বিশদ ও গভীর আলোচনা পাওয়া গেল। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক ভাষণ হিসেবে 'দীনবন্ধু মিত্র' গ্রন্থটি প্রথম পঠিত হয়। সুশীলকুমার দে তাঁর ক্ষুদ্র কিন্তু মূল্যবান গ্রন্থে পূর্ববর্তী আলোচকদের স্মরণ করেছেন এবং কোথাও কোথাও তাঁদের মন্তব্যের সমালোচনাও করেছেন। প্রকৃত পক্ষে দীনবন্ধু-কালের মানসিকতা, দীনবন্ধুর হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা, চরিত্রসৃষ্টি, কাহিনী ও সর্বোপরি, দীনবন্ধু-নাটকে বাঙ্গালী-চেতনার পরিচয় এই গ্রন্থের পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও মোহিতলালের প্রবন্ধে যদিও দীনবন্ধুর

১। সুকুমার সেন, **বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস,** ২য় খণ্ড (১৯৫০) ১৯৭৩।

২। Das Gupta, Hemendra Nath, *The Indian Stage,* (Revised Edition) 1946

৩। অজিতকুমার ঘোষ, **বাংলা নাটকের ইতিহাস** ১৯৪৬।

৪। Ghosh, J. C., *Bengali Literature,* 1948.

৫। Ghosh, J. C., *Ibid,* 150.

৬। সুশীলকুমার দে, **দীনবন্ধু মিত্র,** (১৩৫৮) ১৯৫১।

প্রতিভা, অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি ও শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের পরিচয় আছে, তবুও তা দীনবন্ধুর সামগ্রিক প্রতিভা ও সাহিত্যকীর্তিকে সম্পূর্ণ তুলে ধরে না। তার অন্যতম কারণ দীনবন্ধু নাট্যশিল্পের সম্পূর্ণ আলোচনা ঐ প্রবন্ধ দুটিতে করা সম্ভব নয়। সুশীলকুমার দে'র গ্রন্থে অবশ্য দীনবন্ধুর এক সামগ্রিক পরিচয় আছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস(১) ও বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা(২) গ্রন্থ দুটি স্মরণযোগ্য। অবশ্য এই দুটি গ্রন্থে দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে কোন নতুন কথা নেই।

ঊনিশ ও বিশ শতকের বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধে দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে তার এক দিকে সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির প্রাধান্য, অন্য দিকে সাহিত্যবুদ্ধির প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে দীনবন্ধু ও দীনবন্ধুর সাহিত্যসৃষ্টিকে অনুভব ও বিশ্লেষণের আশ্চর্য প্রকাশ ঘটেছে। প্রকৃত পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের পববর্তী কোন আলোচকই দীনবন্ধু সম্পর্কে নতুন কিছু বলেন নি। মোহিতলাল মজুমদাব ও সুশীলকুমার দে তাঁদের প্রবন্ধে ও গ্রন্থে দীনবন্ধুর বিশিষ্ট মানসিকতা ও উৎকৃষ্ট হাস্যরসিকের চিত্রটি উপস্থিত করেছেন। অন্যান্য আলোচকদেব অধিকাংশই আধুনিক নীতি ও রুচির আলোকে দীনবন্ধুকে বিচার করেছেন। রামগতি ন্যায়বত্নের মানসিকতা একালেও দুর্লভ নয় তার স্পষ্ট প্রমাণ বহু সমালোচনার মধ্যেই আছে। সুতরাং একথা বলা চলে যে, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, মোহিতলাল ও সুশীলকুমার ছাড়া দীনবন্ধুর সাহিত্য-বিচারে আর কেউ বিশেষ নতুনত্বের সন্ধান দিতে পারেন নি।

বাংলা সাহিত্যের নবীন ঐতিহাসিকেরা দীনবন্ধু মিত্রেব ছাত্রাবস্থার কবিতা, দ্বাদশ কবিতা ও সুরধুনী কাব্য সম্পর্কে প্রায় সকলেই নীরব। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের এই কাব্যগুলির সম্পর্কে ইঙ্গিত মাত্র করেছেন। অন্যান্য ইতিহাসকারেরা নামোল্লেখ করা ছাড়া আর অন্য কোন দায়িত্ব পালন করেন নি। এর প্রকৃত কারণ দীনবন্ধুর নাট্যকার-পরিচয়। কিন্তু দ্বাদশ কবিতা ও সুরধুনী কাব্যে এমন এক কবি ও কথাবস্তুর সন্ধান আছে, যার ঐশ্বর্য কম নয়। দীনবন্ধুর এই অবহেলিত ও প্রায়বিস্মৃত কাব্য-কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস তাই স্বাভাবিকভাবে বর্তমান নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

দীনবন্ধু সম্পর্কে একটি প্রচলিত ধারণা, তিনি পরিপূর্ণ দেশজ সংস্কৃতির মানুষ। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কের ফলে

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য, **বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস** ১ম খণ্ড, ১৯৫৫।

২। ভূদেব চৌধুরী, **বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা**, (দ্বিতীয় পর্যায়) ৩য় সং, ১৯৬৪।

বাঙালীর যে চিত্তমুক্তি ঘটেছিল দীনবন্ধু যেন সেই ধারা বহির্বর্তী—যেন তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেরই উত্তরসাধক, এমন বোধ কাজ করে। প্রকৃত পক্ষে দীনবন্ধু মিত্রের অধিকাংশ আলোচকেরাই দীনবন্ধুকে ঠিক নবজাগরণের কেন্দ্রে লক্ষ্য করেন নি। অর্থাৎ মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র যে অর্থে আলোচিত হন সেই অর্থে দীনবন্ধুকে গ্রহণ না করে তাঁকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হিসেবেই অধিকাংশ আলোচকেরা দেখতে চেয়েছেন। এটি ভ্রমাত্মক। দীনবন্ধুও আপন প্রতিভা ও শক্তিতে নবজাগরণের বোধ ও ধারণাকে আত্মস্থ করেছিলেন। তাঁর উপলব্ধির প্রকাশ বিষয়বস্তু, ভাবনা ও শিল্পরূপে বিশিষ্টতা পেয়েছে। ইংরেজী নাটকের, বিশেষ করে Restoration যুগের মিশ্র কমেডির ভাবনা, রীতিভঙ্গী তাঁর নাটকে পরিস্ফুট। অথচ ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু করে দেশ স্বাধীন হবার কাল পর্যন্ত এক তীব্র স্বদেশানুরাগ দীনবন্ধুকে নিতান্ত বাঙালী করে রেখেছে। কিন্তু দীনবন্ধুও তাঁর সমকালের শ্রেষ্ঠ কবি ও ঔপন্যাসিকের মতই বিদেশী সাহিত্য-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই আলোচনা এখানে করা হয়েছে।

দীনবন্ধু নাটকের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক কোন আলোচনা ইতিপূর্বে যেমন হয়নি তেমনি হয়নি তাঁর নাটকের ছড়া ব্যবহারের। অথচ এই আলোচনায় দীনবন্ধু নাটকের এক নতুন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁব হাস্যরস সৃষ্টির কৌশলের আলোচনাও দীনবন্ধুর হাস্যরসাত্মক নাটকগুলি বুঝতে সাহায্য করবে।

দীনবন্ধুর হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে ঊনিশ শতকের এক বিশিষ্ট মানসিকতার সঙ্গে যেমন পরিচয় হয় তেমনি পরিচয় হয় এক হাস্যরসিকের জগতের সঙ্গেও। এই পাপপুণ্যের সংসারে ভালোমন্দের মাঝখানে এক অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী প্রকৃত হাস্যরসিক। সামাজিক চৈতন্য সেখানে অন্তরালে কাজ করে। নৈতিকবুদ্ধির অতীত হতে পারেন বলেই হাস্যরসিক এমন এক বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করেন—সেখানে দোষ ত্রুটি স্খলন পতন অসঙ্গতির স্পর্শে বেদনা ও বিচ্যুতিকে প্রকাশ করেও তা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হাস্যরসিকের ব্যঙ্গে তাই জ্বালার প্রকাশ নয়—প্রকাশ ঘটে স্নিগ্ধ হাসির। সমাজ ও ব্যক্তির সমস্ত অসঙ্গতি তাদের বিকৃতিকে তুলে ধরেও ঘৃণা বা অবহেলার পাত্র হয় না। এই জগতের সৃষ্টি করেছেন দীনবন্ধু আর এই humourist-এর জগৎ বিভিন্ন হাস্যরসিকেব ক্ষেত্রে বিভিন্ন। দীনবন্ধুর হাস্যরসেও তার প্রকাশ আছে।

বাঙালী-সমাজের বিশেষ করে ব্রাহ্মধর্মের সুনীতি-সুরুচির পাশাপাশি এক বলিষ্ঠ আপাত-অশালীন চেতনা ঊনিশ শতকের বাংলা দেশে প্রচলিত

ছিল। এখনো বাংলা দেশের গ্রামে সেই চেতনা কাজ করে বলেই তারা নাগরিকদের কাছে গ্রাম্য। বস্তুত মধুসূদনের প্রহসনে, বঙ্কিম-উপন্যাসের অনেক নারী-চরিত্রের কথোপকথনে ও দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে তার প্রকাশ দেখা যায়। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের সাহিত্যকে বাস্তবজীবনের অতীত ভাবলোকে স্থাপিত করে উচ্চতর কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু দীনবন্ধুর সাহিত্যে বাঙ্গালীর এই বলিষ্ঠ সংস্কার নাটকের প্রয়োজনেই পরিত্যক্ত হয়নি। Bengali humour বলে কোন কথার প্রচলন থাকলে এই কথাগুলি স্পষ্ট হত। দীনবন্ধুর সাহিত্যে যে রসিকতার ও কৌতুকরসের প্রকাশ তার উদ্দেশ্য নাটকের পক্ষে অনিবার্য এবং প্রকৃত পক্ষে এই তরল হাস্যরসে ঊনিশ শতকের হিন্দু বাঙ্গালীর রসিকচিত্রটিও অপ্রকাশিত থাকেনি। দীনবন্ধুর নাটককে অশালীনতার অভিযোগে যুক্ত করার অর্থ স্বভাবতঃই সেই বিশেষ কাল ও সমাজকেই অভিযুক্ত করা। অথচ ঊনিশ শতকের প্রাণস্পন্দনকে অনুভব করতে গেলে এ সমাজকে অস্বীকার করা যায় না।

পূর্ববর্তী সমস্ত ঐতিহাসিক এবং সমালোচকের কাছে ঋণস্বীকার করেই এই বর্তমান নিবন্ধের সূচনা। এখানে দীনবন্ধুর কবি এবং নাট্যকার এই পূর্ণ পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর নাটকের আঙ্গিক, ভাষা, কাহিনীবিন্যাস, হাস্যরস সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি যেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, তেমনি তাঁর ঐতিহাসিক নীলদর্পণের পটভূমিকাটির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সর্বোপরি ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ দীনবন্ধুর সাহিত্যচর্চায় কোন প্রেরণা দান করেছিল এবং দীনবন্ধু-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার শিল্পীসত্তার মিলন কোথায় এই ইঙ্গিতটুকু দেবার চেষ্টা হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে।

দীনবন্ধু মিত্র ঃ জীবন ও ব্যক্তিত্ব (১৮৩০—৭৩)

'এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে না চিনিত কে'?(১) 'নীলদর্পণের স্রষ্টা', অগণিত দীনদরিদ্রের বন্ধু, বিশুদ্ধ হাস্যরসের উৎস, 'সধবার একদাশী' প্রণেতা, যুগনায়ক বঙ্কিম সুহৃদ দীনবন্ধুর পরিচয় অনাবশ্যক। কিন্তু আমাদের আক্ষেপ দীনবন্ধুর পূর্ণাঙ্গ জীবনী এতদিন পর্যন্ত অলিখিত। 'সাহেবেরা যদি পাখি মারিতে চান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়'—একথা বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র অথচ নীলদর্পণ প্রণেতা, 'বঙ্গীয় বঙ্গালয় স্রষ্টা' দীনবন্ধু-জীবনের ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত। মাইকেল মধুসূদন তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে লিখেছিলেন—

এই ভাবি মনে,
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবেব দলে,
তব চিতাভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহশিল্পে গড়ি মঠ, বাখে তাব তলে।

এই কথাগুলি দীনবন্ধু সম্পর্কেও সত্য। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম সুহৃদ বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুব একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছিলেন। তাব পরিসর স্বল্প হলেও তা ব্যক্তি ও কবি দীনবন্ধুর সামগ্রিক পরিচয়কে তুলে ধরতে সক্ষম এবং দীনবন্ধু-সংক্রান্ত আলোচনায় এই জীবনীটি প্রায় একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। বঙ্কিমচন্দ্রেব এই বচনাটি ছাড়া দীনবন্ধু-জীবন সম্পর্কে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নেই. দীনবন্ধুব বান্ধবেবা যেমন এ সম্পর্কে উদাসীনতা দেখিয়েছেন অনুরূপ উদাসীনতাব পরিচয় দিয়েছেন তাঁর উত্তব-পুরুষেরাও. তাই তাঁর রচনাগুলিব পাণ্ডুলিপি ও চিঠিপত্র লুপ্ত। তাঁব জীবনীর উপাদান এবাবণে এত দুর্লভ। অথচ দীনবন্ধুর প্রতি আমাদেব শ্রদ্ধা কম ছিল না।

'সুরধুনী কাব্যের' অষ্টম সর্গে ত্রিবেণীতে জাহ্নবীর কাছে বিদায় নিয়েছে যমুনা। তাব যাত্রাপথে পবিত্র হয়েছে অজস্র স্থান ও মানুষ। দীনবন্ধুব জন্মস্থান চৌবাড়িয়াও এই সূত্রে যুক্ত। যমুনার কথায়—পাক দিয়ে বেড়ে যাব চৌবাড়িয়া গ্রাম

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, **রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা** (১২৮৩) ১৮৭৬।

বিগত দিনের যথা অতি দীনধাম...... (পৃঃ ১১২)

যমুনা বেষ্টিত বলেই এর নাম চৌবাড়িয়া। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"এ গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত। বাংলা সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নদীয়া জেলার বিশেষ গৌরব আছে, দীনবন্ধুর নাম নদীয়ার আর একটি গৌরবের স্থল।"(১) সাধারণতঃ জন্মভূমি বলতে পূর্বপুরুষের বাসস্থান বা ভিটা বোঝায়। দীনন্ধুর জন্ম নদীয়ার চৌবাড়িয়াতে হলেও দীনবন্ধুর পিতৃ-পুরুষের বাসস্থান অন্যত্র। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বেলিনী গ্রামে বাস করতেন তাঁর পূর্বপুরুষেরা। দীনবন্ধুর পিতা কালাচাঁদ মিত্র প্রতিপালিত হয়েছিলেন চৌবাড়িয়ায় তাঁর মাতুলালয়ে।(২) এই গ্রামে দীনবন্ধু ১২৩৬ সালের (১৮৩০ খৃঃ) চৈত্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

দীনবন্ধুর শৈশব অতিবাহিত হয়েছ দুঃখের মধ্যে। বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় কিংবা রামতনু লাহিড়ী, এঁদেরই মত দীনবন্ধুর প্রথম জীবনে দুঃখের অভিশাপ ছিল। কিন্তু দুঃখ-যন্ত্রণা এঁদের শক্তিকে ম্লান করে না বরং আরো কঠিন দুঃখ উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে। দীনবন্ধু-জীবনেও এই কঠিন পরীক্ষা এসেছিল।

কালাচাঁদ মিত্রের ছয় পুত্র, কেশবচাঁদ, যাদবচাঁদ, সুখময়, নরেন্দ্র, নরনারায়ণ ও গন্ধর্বনারায়ণ। গন্ধর্বনারায়ণ পিতৃদত্ত নাম পরিত্যাগ করে গ্রহণ করেছিলেন দীনবন্ধু নাম। পিতৃদত্ত গন্ধর্বনারায়ণ ও স্বকৃত দীনবন্ধু নাম গ্রহণ, দীনবন্ধু জীবনের দুটি সত্য দিক বলা যায়। তাঁর বাল্যকাল সম্পর্কে সামান্য তথ্য 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে আছে,—"বাল্যকালে তিনি (দীনবন্ধু) গ্রামস্থ পাঠশালায় লেখাপড়া আরম্ভ করেন এবং তাহা সমাপন হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে জমিদারী সেরেস্তায় অতি সামান্য বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু বালক দীনবন্ধুর কিছুতেই চাকুরীতে মন টিকিল না। তিনি পিতাঠাকুরের কথায় অবাধ্য হইয়া চাকুরী পরিত্যাগ করিলেন এবং কলিকাতায় আসিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। তখন বাহির সীমুলিয়ায় পিতৃব্যের বাটী আসিয়া খুড়তুতা ভাইগণের আশ্রয়ে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এখানে তাহাকে পালাক্রমে রন্ধন কার্যও করিতে হইত।"

"কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাহার ভাবী নীলদর্পণ নাটকের ইংরাজী অনুবাদক মহাত্মা লঙ সাহেবের অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা, (১২৮৩) ১৮৭৬।

২। নগেন্দ্রনাথ বসু, **বিশ্বকোষ** (১৩০৪), ১৮৯৭, ৮ম খণ্ড, ৫৮৫।

হইলেন। লঙ সাহেব বালক দীনবন্ধুকে পুস্তক ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। কলিকাতায় ইংরেজী লিখিতে আরম্ভ করিয়া দীনবন্ধু পিতৃদত্ত গন্ধর্বনারায়ণ নাম পরিত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। তখন হইতে দীনবন্ধু নামে পরিচিত হইয়াছেন"।১

কালাচাঁদ মিত্রের মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হওয়া এবং পাঠশালা পাঠ সমাপনান্তে দীনবন্ধুর জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করা, এই তথ্য থেকে অনুমান করা চলতে পারে কালাচাঁদের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। নিতান্ত বালক বয়সে দীনবন্ধু তাঁর পিতার অবাধ্য হয়েছিলেন। লঙ সাহেবের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে যোগদানও দীনবন্ধু জীবনের একটি বিশেষ শুভ মুহূর্ত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দীনবন্ধু মিত্রের জীবনীতে২ ছাত্র দীনবন্ধুর পরিচয়ে লঙ ও তাঁর স্কুলের কথা অনুল্লেখিত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন "তাঁহার বাল্যকাল সম্বন্ধীয় কথা অধিক বলিবার নাই। দীনবন্ধু অল্প বয়সে কলিকাতায় আসিয়া, হেয়ার স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন।......দীনবন্ধু হেয়ার স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে যান. এবং তথায় ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কয় বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন"।৩ 'সাহিত্য সাধক চরিত মালা'র দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থে বলা হয়েছে—"দীনবন্ধু কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রবেশ করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি সে সময়ে হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল বা হেয়ার সাহেবের স্কুল নামেও পরিচিত ছিল; ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্রাঞ্চ স্কুলেরই নামকরণ হয় হেয়ার স্কুল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে পরীক্ষা দিয়া জুনিয়ার বৃত্তি লাভ করেন"। 'দীনবন্ধুর ছাত্র জীবনের কাল খুবই অল্প কেননা ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাটনার পোষ্টমাষ্টার পদে যোগ দিয়েছিলেন। অবশ্য ছাত্র হিসাবে দীনবন্ধু কৃতি। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হিন্দু কলেজের সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে বাংলায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন তিনি। পরীক্ষায় সাফল্য ও বৃত্তিলাভ ছাত্র দীনবন্ধুর জীবনে বার বার ঘটেছে। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ও ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দেব এপ্রিল

১। নগেন্দ্রনাথ বসু, **বিশ্বকোষ** (১৩০৪), ১৮৯৭, ৮ম খণ্ড ৫৮৫।

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **সাহিত্য সাধক চরিত মালা**, ১৯ সংখ্যক গ্রন্থ ১৯৫৫।

৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, **পূর্বোক্ত**।

মাসে দীনবন্ধু সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৩ খৃীষ্টাব্দে দীনবন্ধু শিক্ষকতা কাজের পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছিলেন।১

দীনবন্ধুর ছাত্রাবস্থায় এই সামান্য পরিচয় ছাড়া অন্য পরিচয় অজ্ঞাত। হিন্দু কলেজের ছাত্র থাকাকালীন তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং তাঁকে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছিলেন গুপ্ত কবি। সংবাদ প্রভাকরে (১৮৩১-৫১) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে আশ্রয় করে যে তরুণ ছাত্র সমাজ ও পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরেরা দেখা দিয়েছিলেন, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বারকানাথ অধিকারীর কবিতা-যুদ্ধের প্রকাশ স্থল২ ছিল সংবাদ প্রভাকর। দীনবন্ধুর সাহিত্য প্রতিভার অঙ্কুর সংবাদ প্রভাকর ও অন্যান্য পত্রিকাতে মুদ্রিত হয়েছিল। ঐ রচনা-গুলিতে ছাত্র দীনবন্ধুর সহজ সুন্দর অথচ অপরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন,—"বোধ হয় ১৮৫৫ সালে, দীনবন্ধু কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ১৫০৲ টাকা বেতনে পাটনার পোষ্টমাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। ঐ কর্মে তিনি ছয় মাস নিযুক্ত থাকিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। দেড়বৎসর পরেই তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি উড়িষ্যা বিভাগের ইনস্পেকটিং পোষ্টমাষ্টার হইয়া যান। পদবৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু বেতন বৃদ্ধি হইল না, পরে হইয়াছিল।" উড়িষ্যা বিভাগ থেকে দীনবন্ধু প্রেরিত হলেন নদীয়ায় এবং সেখান থেকে ঢাকায়। নীল আন্দোলন৩ ইতিপূর্বে সারা বাংলা দেশে দেখা দিয়েছিল। দরিদ্র কৃষকসম্প্রদায়ের ওপর নীলকরদের ভয়াবহ নিষ্ঠুর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছিলেন বহু দেশদর্শী দীনবন্ধু

ঢাকায় থাকা কালীন দীনবন্ধু তাঁর প্রথম নাটক প্রকাশ করলেন ১৮৬০ খৃীষ্টাব্দে (২রা আশ্বিন ১৭৮২ শকাব্দ)। এই বছরেই নীল কমিশন নিযুক্ত হয়। ঐ নাটকে লেখকের নাম ছিল না। 'কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং' নামে শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিকের বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত হল ঐ গ্রন্থ। নীলদর্পণ প্রকাশ বাংলাদেশের সাহিত্যে ও ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নীলদর্পণ নাটকের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। দীনবন্ধুর বয়স

১। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পরে তমোলুক পত্রিকা, (১ম পর্ব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৮) লিখিয়াছিলেনঃ দীনবন্ধু বাবু বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর কিছুদিন কলিকাতায় হিন্দু কলেজের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকেন—কলেজ ছাড়িয়া দীনবন্ধু যে কিছু দিন শিক্ষকতা কার্য করেন ভারত সংস্কারকও (৭ নবেম্বর ১৮৭৩) তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **পূর্বোক্ত** ১৩১।

২। দ্রষ্টব্য, দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম জীবনের কবিতা।

৩। ১৮৫৯ খৃঃ।

তখন ত্রিশ। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন লঙ। নীলদর্পণ নাটকের এই ইংরেজী অনুবাদ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ইংরেজ সম্প্রদায়কে পাঠানো হয়। এই গ্রন্থের মুদ্রাকর 'সি, এইচ ম্যানুয়েল' এর বিরুদ্ধে ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক ওয়ালটার ব্রেট মানহানির মামলা উপস্থিত করেন। গ্রন্থের প্রকাশক লঙের বিরুদ্ধে এই মামলা হয়।১ বিচারে ম্যানুয়েলের জরিমানা ও লঙের একমাস কারাবাস ও একহাজার টাকা জরিমানা হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ বিচারালয়ে উপস্থিত থেকে এই জরিমানার অর্থ দিয়েছিলেন।২ বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন এই বছরেই ঢাকা প্রত্যাগত দীনবন্ধুকে পাঠান হল নদীয়ায়। কিছুকাল পরে দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক 'নবীন তপস্বিনী' ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে (১২৭০ সাল) কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত হল। যে মুদ্রণ যন্ত্র থেকে 'নবীন তপস্বিনী'র প্রকাশ যেটি দীনবন্ধু ও অন্যান্য কয়েকজনের চেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল। এই গ্রন্থ তিনি উৎসর্গ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও সধবার একাদশী প্রকাশিত হল। নবীন তপস্বিনী ও পরবর্তী রচনার মধ্যবর্তী তিন বছরে দীনবন্ধুর একাধিক এবং দ্রুত স্থান পরিবর্তন হয়েছে। নদীয়া বিভাগ থেকে ঢাকায় আবার সে স্থান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর উড়িষ্যায়, পুনর্বার নদীয়ায় এতগুলি স্থান পরিবর্তন আর যাই হোক সাহিত্য রচনার পরিপোষক নয়। শারদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'। অবশ্য লীলাবতী (১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৬৭), সুরধুনী কাব্য ১ম ভাগ (৪ঠা আগষ্ট ১৮৭১), জামাই বারিক (২০শে মার্চ ১৮৭২), দ্বাদশ কবিতা (২৮শে মে ১৮৬২) ও কমলেকামিনী (১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৩)—এই রচনাগুলির মধ্যবর্তী কালব্যবধান নেই বললেই চলে। সুরধুনী কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। দীনবন্ধু তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থগুলি বন্ধুদের উৎসর্গ করেছিলেন। গুরুচরণ দাস, মহেন্দ্রলাল সরকার, রাসবিহারী বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে যথাক্রমে উৎসর্গ করেছিলেন, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, জামাই বারিক, দ্বাদশ কবিতা ও কমলেকামিনী নাটক।

এত স্থান পরিবর্তনের মধ্যে দীনবন্ধু কৃষ্ণনগরেই ছিলেন সব চেয়ে বেশি এবং কৃষ্ণনগরে একটি বাড়িও তিনি কিনেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যে

১। জুলাই (১০, ২০, ২৪) ১৮৬১।

২। বিপুল বিভব, যেন অবনী ধনেশ
দেশের কল্যাণে প্রায় করিয়াছে শেষ। —সুরধুনী কাব্য, ১৩৯

সন ১৮৬৯ সালের শেষে বা সন ১৮৭০ সালের প্রথমে তিনি কলকাতার সুপরনিউমারি ইনস্পেকটিং পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লুসাই যুদ্ধের ডাক ব্যবস্থার জন্যে ভারত সরকার দীনবন্ধুকে কাছাড় পাঠায়। এই দুরূহ কাজের দায়িত্ব পালন করে দীনবন্ধু অল্পকাল পরেই কলকাতায় ফিরে আসেন। এই সময়ে তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধিতে সম্মানিত করেছিল ইংরেজ সরকার। সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।১ অবশ্য দীনবন্ধুর কর্মজীবন সুখকর ছিল না। ডাক বিভাগের গুরুতর দায়িত্বগুলি দীনবন্ধু ও সূর্য নারায়ণ এই দুজন সুদক্ষ কর্মচারীর ওপর ন্যস্ত হত। বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন—, "পোষ্টাল বিভাগের যে পরিশ্রমের ভাগ তাহা তাঁহার ছিল, পুরস্কারের ভাগ অন্যের কপালে ঘটিল।" দীনবন্ধুর প্রতি কর্তৃপক্ষের এই অবিচারের কথা সে সময়কার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এমন কি পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্তিত হওয়ার ফলেই যে দীনবন্ধুর স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়েছে অমৃত বাজার পত্রিকাতে তারও উল্লেখ আছে। কিন্তু দীনবন্ধু তাঁর সততা ও দক্ষতার পরিবর্তে পেয়েছিলেন অবিচার ও অসম্মান। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, পোষ্টমাষ্টার জেনেরাল এবং ডাইরেক্টর জেনেরলের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় দীনবন্ধু সাহায্য করেছিলেন পোষ্টমাষ্টার জেনারলের। ফলে বারংবার স্থান পরিবর্তন জনিত দুঃখ তাঁকে পেতে হয়েছে। ১৩ই অক্টোবর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের অমৃতবাজার পত্রিকার খবর অনুযায়ী দীনবন্ধু তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়ার রেলওয়ের ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত।২ কিন্ত কিছু দিনের মধ্যেই তাঁকে অন্য স্থানে নিয়োগ করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র

১। সাপ্তাহিক সংবাদ—১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার। আমরা সন্তোষ সহকারে প্রকাশ করিতেছি, বার্তাবহ বিভাগের বিচক্ষণ কার্যসচিব শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র এবং শ্রীযুক্ত বাবু সূর্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে, এডুকেশন গেজেট ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮ (২৬শে মে ১৮৭১)। দ্রষ্টব্যঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **পূর্বোক্ত**, ১৪১।

২। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। দীনবন্ধুবাবু দীর্ঘদিন ইনস্পেক্টরী কর্ম করিয়া শেষে তাঁহার গত কার্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি কলিকাতায় আনীত হন। এখানে তাঁহার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইত, কিন্তু তিনি তথাচ দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া একস্থলে থাকায় কতক বিশ্রাম পাইয়াছিলেন। এক্ষণ আবার তাঁহাকে ভ্রমণ কার্যে নিযুক্ত করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। যাবজ্জীবন ভ্রমণ করিয়া শেষে একটু শান্তি প্রাপ্ত না হইলে ভাবি কষ্টকর বিষয়। (১৩ অক্টোবর ১৮৭২)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **পূর্বোক্ত**, ১৪৩।

লিখেছেন সেই শেষ পরিবর্তন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর মাত্র ৪৩ বছর বয়সে দীনবন্ধু স্বর্গত হন।

দীনবন্ধুর ব্যক্তি পরিচয়ের উপাদান নিতান্তই স্বল্প। তবু বিভিন্ন লেখকদের ইতঃস্ততঃ লেখায় তাঁর সামান্য পরিচয় আছে। দীনবন্ধুর বন্ধুত্ব ও তাঁর হাস্যরসিক চরিত্র দীনবন্ধু সংক্রান্ত লেখাগুলিতে প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দীনবন্ধুর বন্ধুত্ব এই দুই ব্যক্তিত্বের এবং বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। দীনবন্ধুর মৃত্যুর কিছুকাল পরে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ শ্রুত হয়েছে "আর একজন আমার সহায় ছিলেন। সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ দুঃখের ভাগী তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গ দর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য তখন বঙ্গ সমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু বঙ্গদর্শনে তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে। কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে। অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু আমার সঙ্গী"।১ বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর এই অকৃত্রিম ক্ষণভিন্ন সৌহার্দ্য দুই ব্যক্তিত্বকেই কতগুলি দুর্লভ ব্যক্তিগত স্পর্শে বিধৃত করেছে।

দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুত্বের প্রথম সূত্র রচিত হয়েছিল, সংবাদ প্রভাকরের কবিতাযুদ্ধের আসরে। দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বারকানাথ অধিকারী রচিত কবিতাগুলিতে উৎকর্ষ যাই থাক পরবর্তীকালের সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে রচিত এই কবিতাগুলির মধ্যে অনেক সময় প্রতিপক্ষের প্রতি অকাব্যিক ও গ্রাম্য ভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই বিরোধী ভূমিকাতে থেকেও দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সংবাদ প্রভাকরে কবিতা লেখার সময়েই চিঠির মাধ্যমে এঁদের বন্ধুত্ব হয়। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"ইঁহারা যখন উভয়েই বালক তখন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হইয়া প্রভাকরে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন তের কি চোদ্দ বৎসর হইবে। উভয়েই কবিতা লিখিতেন। কখনও দেখাশুনা নাই, চোখাচোখি নাই, পত্রের দ্বারা এই সময় ইহাদের বন্ধুত্ব জমিল। সর্বদাই উভয়ে উভয়কে পত্র লিখিতেন, কখনও কখনও পত্রের ভিতর কবিতা থাকিত, আদরের কবিতা কখনও গালাগালির কবিতা

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, **বঙ্গদর্শনের বিদায়**, ১৮৮২।

থাকিত"।১ দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় আরো পরে। যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর রূপে বঙ্কিমচন্দ্র নিযুক্ত হলেন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে। বঙ্কিমচন্দ্র "সম্ভবতঃ ২৩-এ আগষ্ট প্রথম কার্যে যোগদান করেন। এই যশোহরেই দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়"।২ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পত্নীর মৃত্যু হয় এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। বঙ্কিমের প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর, পূর্ণচন্দ্রের কথায়,—"বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে ছুটি লইয়া বাটী আসিলেন, সুহৃদ প্রধান দীনবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্থানে স্থানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন"।৩ শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এই সম্পর্কে লিখেছেন—, "তারপর পাত্রী অনুসন্ধানের জন্য বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল। একখানা বাসোপযোগী বড় বোট ভাড়া করা হইল। স্থির হইল, সঞ্জীবচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্র নৌকা আরোহণে পাত্রী অনুসন্ধানার্থে দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবেন। জানিনা কি মনে করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের সঙ্গী হইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন।...তারানাথ অথবা তাঁরাচাঁদ নামধেয় হালিসহব নিবাসী জনৈক ভদ্র সন্তান, একটি পাত্রীর কথা লইয়া কাঁঠালপাড়ায় কয়েকদিন যাতায়াত করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন কেহই তাঁহার কথায় কান দেন নাই। অবশেষে যখন সাহিত্য রথিত্রয় পাত্রী অনুসন্ধানে মহাড়ম্বর সহকারে যাত্রা করিলেন, তখন তারানাথ পূর্বোক্ত পাত্রী দেখিবার জন্য তাঁহাদের হালিসহরে নাবিতে অনুরোধ করিলেন। হালিসহর কাঁঠালপাড়া হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। হালিসহরের সন্নিকটে বাঁশবেড়িয়া। আমার মনে হইতেছে এই বাঁশবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধুবাবুর শ্বশুরালয়। নৌকারোহিরা তারানাথের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া হালিসহর অতিক্রম করিয়া চলিলেন এবং দীনবন্ধুবাবুর শ্বশুরালয়ে রাত্রিযাপন করিবার মানস করিলেন"।৪ পাত্রী অনুসন্ধানের এই অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে দীনবন্ধুর নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে।৫ সেই সঙ্গে অসার খলু সংসারে শ্বশুর মন্দির ও শ্বশুর কামিনীই যে একমাত্র সত্য এমন বৈশিষ্ট্যও তাঁর নাটকের কোন কোন চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিম জীবনে পত্নী বিয়োগ জনিত যে দুঃখ অথবা দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের যে ঘটনা ঘটেছে, দীনবন্ধুর এ অভিজ্ঞতা হয়নি।

১। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু, **কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র** সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত), ১৯৬৪।

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **পূর্বোক্ত**, ৮৮।

৩। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, **পূর্বোক্ত**।

৪। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, **বঙ্কিম জীবনী**, (১৩১৮) ১৯১১, ৩০।

৫। দীনবন্ধু মিত্র, **নবীনতপস্বিনী**, ১।৪

নবীনতপস্বিনীতে ঘটকদের পাত্রীর বর্ণনা দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করায় এবং নিতান্ত ক্ষীণ হলেও বঙ্কিমচন্দ্রকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করার সূত্রে যোজিত করে তা বঙ্কিম জীবনের কোন অনাবিষ্কৃত তথ্য সন্ধানে প্রয়াসী করে—এমন অনুমান অসঙ্গত নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিবাহ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় বিবাহ হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন বাইশ। এই বছরেই দীনবন্ধুর নীলদর্পণের প্রকাশ। দীনবন্ধুর বিবাহ হয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে। দীনবন্ধুর বয়স তখন পঁচিশ। লক্ষ্য করতে হয় সে কালের আচার অনুযায়ী দীনবন্ধুর বিবাহ বেশি বয়সেই হয়েছিল। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়এর বঙ্কিম জীবনীতে বঙ্কিমচন্দ্রের পাত্রী অনুসন্ধান বর্ণনায় বাঁশবেড়িয়া বা বংশবাটীর উল্লেখ আছে। এই বংশবাটীতে সরকার বংশের কালিদাস সরকারের কন্যা অন্নপূর্ণার ১ সঙ্গে দীনবন্ধুর বিবাহ হয়। দীনবন্ধু তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে বংশবাটীর পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে—

১। দীনবন্ধু মিত্রের পৌত্র ললিতচন্দ্র মিত্রের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত তপাইচাঁদ মিত্র বর্তমান লেখককে এই পত্র দিয়েছেনঃ—'দীনবন্ধু মিত্রের বিয়ে হয় বংশবাটিতে, এই বংশবাটির কথা তিনি তাঁর সুরধুনী কাব্যের মধ্যে সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন। অন্নদাসুন্দরী সরকার তাঁর স্ত্রীর পূর্ণ নাম। অন্নদাসুন্দরী ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্না মহিলা। তাঁর আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল প্রখর। দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যুর পর তিনি যখন বেশ কষ্টের সঙ্গে সংসার চালাতেন তখনও কারো সাহায্যের প্রত্যাশী হতেন না। বিদ্যাসাগর মশাই ছিলেন আমাদের পরিবারের বিশিষ্ট বন্ধু। একবার তিনি পুজোর সময় নূতন জামা কাপড় কিনে দেবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু আমার ঠাকুমা নিজের হাতে ছেলে মেয়েদের জন্য আগে থেকেই জামা তৈরী করে রেখেছিলেন। প্রথমে বিদ্যাসাগর মশাই সেকথা শুনে বড় দুঃখ পেলেন। কিন্তু পরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং ঠাকুমাকে আশীর্বাদ করে বললেন, তুমি জীবনে কখনও কষ্ট পাবে না।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ট ছিল যে তাঁদের পরিবারের সবাই যেন আমাদের আত্মীয়ের মতই। বিদ্যাসাগরের মেয়ে সুরেশ সমাজপতির মা হেমনলিনীকে আমরা পিসী বলে ডাকতুম। বিদ্যাসাগর যখন মৃত্যুশয্যায় তখন নারায়ণ (তাঁর বড় ছেলে) তাঁকে দেখতে চান কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। কাজেই তাঁর সাহস হয় না। তখন হেম পিসী এসে আমার ঠাকুমাকে বলেন। ঠাকুমার কোন কথাই বিদ্যাসাগর উপেক্ষা করতে পারতেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরই অনুরোধে বিদ্যাসাগর নারায়ণকে আসতে অনুমতি দেন। এই সব ছোট ছোট ঘটনাই প্রমাণ করে বিদ্যাসাগর আমাদের পরিবারের কতটা ঘনিষ্ট ছিলেন, বিশেষতঃ অন্নদাসুন্দরী কত ব্যক্তিত্বসম্পন্না এবং স্নেহপ্রবণ ছিলেন।'

দীনধাম, ১৫।২।৬৫ সাল।

"পরিপাটী বংশ বাটী স্থান মনোহর,—
যে দিকে তাকাই দেখি সকলি সুন্দর" পৃঃ ১১৪

সুরধুনীকাব্যের নবম সর্গ ব্যয়িত হয়েছে বংশবাটীর চার কন্যা সাবিত্রী, সরলা, বিরজা, বিমলার কথায়। ওরা অপ্রয়োজনীয় হলেও কবি তাঁর কাব্যে অনেকখানি স্থান এই চার কন্যাদের দিয়েছেন। কৌতূহলী পাঠক এদের একটি কন্যার মধ্যে দীনবন্ধু পত্নীর রূপ অনুমান ও কল্পনা করতে পারে। সুরধুনীকাব্যে উপরি উক্ত সর্গে এই চারকন্যা বংশবাটীর বিখ্যাত দেবী হংসেশ্বরী মন্দিরে স্বামী প্রার্থনার নিবেদন জানিয়েছেন। এদের কারো বাসনা সদাগরের, কারুর জমিদারের, কেউ বা মদ্যপের ভয়ে গ্রস্ত অথচ এদেরই একজন আকাঙ্ক্ষা করে এমন এক মানুষের যা ঠিক সাধারণের কাম্য নয়। সুরধুনীকাব্যে সাবিত্রী হংসেশ্বরীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে এই বলে—

"হংসেশ্বরী, দেহ বর, পাই বর কবি বর,
সুধাগর্ভ কল্পনায় যার—
মহীরুহ মিষ্ট ভাষে, অরণ্য লতিকা হাসে,
প্রস্তরে সঞ্চয় ফুলহার,
শূন্যে হয় সুশোভন, মণিময় নিকেতন,
শোকাকুলে শান্তি সুধাদান।
মন্দের থাকে না লেশ, যাহা দেখি তাই বেশ,
পৃথিবী তলে স্বর্গ দীপ্তিমান।" পৃঃ ১২৫-২৬

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত দীনবন্ধু জীবনীতে বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর পারিবারিক জীবনের সুখ শান্তির পরিচয় দিয়েছেন এই বলে,—"একটি দুর্লভ সুখ দীনবন্ধুর কপালে ঘটিয়াছিল, তিনি সাধ্বী স্নেহশালিনী পতি পরায়ণা পত্নীর স্বামী ছিলেন। দীনবন্ধুর অল্পবয়সে বিবাহ হয় নাই। হুগলীর কিছু উত্তর বংশবাটী গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। দীনবন্ধু চিরদিন গৃহসুখে সুখী ছিলেন। দম্পতি কলহ কখন না কখন সকল ঘরেই হইয়া থাকে কিন্তু কস্মিনকালে মুহূর্ত নিমিত্ত ইঁহাদের কথান্তর হয় নাই, একবার কলহ করিবার নিমিত্ত দীনবন্ধু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা বৃথা হইয়াছিল। বিবাদ করিতে পারেন নাই। কলহ করিতে গিয়া তিনিই প্রথম হাসিয়া ফেলেন, কি তাঁহার সহধর্মিণী রাগ দেখিয়া উপহাস দ্বারা বেদখল করেন, তাহা এক্ষণে আমার স্মরণ নাই"১। পারিবারিক জীবনের এই দুর্লভ সুখ শান্তি

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা, (১২৮৩) ১৮৭৬।

দীনবন্ধুকে হাস্য রসিক করেছে এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। সাধারণতঃ পারিবারিক সুখশান্তি বঞ্চিত মানুষদের কথাবার্তায়, আচরণে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও জ্বালার প্রকাশ দেখা যায়। সাহিত্যে এই ব্যঙ্গ অথবা জ্বালা সাধারণ ভাবে মস্তিষ্ক জাত, কিন্তু হাস্যরসিক জীবনের সমস্ত অসঙ্গতিকে স্নিগ্ধ করে নিতে পারেন হৃদয়ের তাপে আর তখনই বিচ্ছুরিত হয় তার দিব্য স্মিতরূপ। দীনবন্ধুর হাস্যরসের সেই নিভৃত উৎস রয়ে গেছে লোক চক্ষুর অন্তরালে অন্তপুরে।

দীনবন্ধুর এই সদা প্রফুল্লময় পরিচয় বন্ধুত্বের পরিচ্ছদে দুই একটি ঘটনায় বিধৃত হয়ে আছে। মূর্তিমান হাস্যরসের উৎস, বঙ্কিম যাঁর সম্পর্কে বলেছেন "অনেকে 'আর হাসিতে পারি না' বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে", দীনদরিদ্রের বন্ধু দীনবন্ধুর হৃদয়বত্তার সামান্য পরিচয়গুলিও অনন্য সাধারণ। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বঙ্কিমজীবনীতে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু পরিচয় দিতে গিয়ে ভৃত্য মুখে শ্রুত একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। এই গল্পের সত্যতা সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় কেননা ভৃত্যেরা মিথ্যা রচনায় দক্ষ নয় বলেই তাঁর বিশ্বাস। সম্পূর্ণ কাহিনীটি উদ্ধৃত করলে দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের নিবিড় সৌহার্দ্য ও রসিক চিত্তের পরিচয়টি ধরা যাবে।

"একদা দীনবন্ধুবাবু আমাদের কাঁঠালপাড়ার বাড়ীতে বেড়াইতে অথবা নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই আসিতেন। তবে একদিনের ঘটনা আমি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি। সেদিন সন্ধ্যার পর একটু রাত্রি হইলে আসিয়াছিলেন। আসিয়া দেখিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় তাঁহার কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধু বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। সে সময় জগদীশবাবু, ঈশ্বরবাবু প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সকলেই দীনবন্ধুবাবুর বন্ধু। সধবার একাদশী লেখককে দেখিয়া সকলে আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিলেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু দীনবন্ধুর প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না। দীনবন্ধুবাবু সেটা লক্ষ্য করিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন তাঁহার একটু অপরাধ হইয়াছে। তিনি কেন বিলম্বে আসিলেন। বঙ্কিম যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র। এরূপ অভ্যর্থনায় অপরাধ লওয়া দূরে থাকুক, মহাপ্রাণ দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রে আরো অনুরক্ত হইলেন। কিন্তু সে ভাবটা বাহিরে প্রকাশ করিলেন না।"

"অনন্তর দীনবন্ধুবাবু তথা হইতে উঠিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলেন। তৎপরে আবার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। সেখানে বসিয়া দীনবন্ধুবাবু এমনই হাস্যরসের অবতারণা করিলেন যে, গৃহ প্রাচীর ফাটিয়া যাইবার উপক্রম

হইল। দীনবন্ধুবাবুর স্বরূপ সকলে অবগত নহেন, বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত মহাত্মার জীবনী লিখিবার সময় কিছু পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই প্রতিভাবান ব্যক্তি যখন সভাস্থলে বসিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিলেন, তখন কে না হাসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র হাসিলেন না অনেক কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া রহিলেন। দীনবন্ধুবাবু যখন দেখিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রেব উদব ও পঞ্জব হাস্যতরঙ্গে নাচিয়া উঠিতেছে, কিন্তু ওষ্ঠে হাস্যরেখা নাই তখন তিনি উঠিয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কতগুলো পাতালতা ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া, বৈঠকখানা সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই বঙ্কিমচন্দ্রেব লিখিবার ঘর। এই ঘরে বসিয়া তিনি 'কৃষ্ণকান্তের' উইল লিখিয়াছিলেন।"

"দীনবন্ধুবাবু কক্ষ মধ্যে প্রবেশ কবিয়া দ্বাব অর্গল বন্ধ করিলেন, এবং পাতা লতার রাশি কাটিয়া একটা বড় কাগজে আটা দিয়া বসাইতে লাগিলেন। ক্রমে একটি মনুষ্যাবযব সৃষ্ট হইল। মূর্তিব উদবটা কিছু বড় বকমের এবং ঠোট দুখানা কিছু কুঞ্চিত। দীনবন্ধু কাগজখানি ও আঠাব সিসি লইয়া বৈঠকখানা ঘবে পুনঃ প্রবেশ কবিলেন ও প্রাচীব গাত্রে সেই বিচিত্র চিত্রখানা আঁটিযা দিলেন। দীনবন্ধু বাবু ছবিব নীচে দুইছত্র কি লিখিযাছিলেন। সম্ভবতঃ কবিতা। ছবি দেখিযা সভাস্থ সকলে হাসিযা উঠিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র হাসিলেন না, তিনি বুঝিলেন, এখানি তাঁহারই প্রতিমূর্তি। তিনি অপাঙ্গ দৃষ্টিতে একবার কবিতাব দুই ছত্র পডিযা লইলেন। পবে চুপি চুপি উঠিযা পাঠাগাবে প্রবেশ কবিলেন. এবং ক্ষিপ্রহস্তে একখণ্ড কাগজে দুইছত্র কি লিখিলেন, তখন সকলে দীনবন্ধুবাবুব দুইছত্র কবিতাপাঠে নিবিষ্ট চিত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র সেই অবসবে তাঁহাব লিখিত কাগজখানি আঠা সাহায্যে দীনবন্ধু-বাবুব পৃষ্ঠদেশে আটিযা দিলেন। তখন সকলে ছবিব নিকট হইতে সবিযা আসিযা দীনবন্ধুবাবুব পৃষ্ঠদেশে সমবেত হইলেন. এবং হাস্যবোলেব মধ্যে কাগজখানি পাঠ কবিতে লাগিলেন। দীনবন্ধুবাবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইযা পিছন ফিবিযা সকলকে কাগজখানি পডাইতে লাগিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন. আমায বলে দাও না গো. আমাব পিঠে কি আছে। হাতীব কপাল মন্দ, তাই তাব পিঠেব কোথায় মশাটা মাছিটা বসছে সে দেখতে পায না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিযা উঠিলেন, 'দেখতে পাযনা বলিযাই ত আমবা তাকে হস্তি-মূর্খ বলি।'

দীনবন্ধু তখন আসরে বসিলেন, এবং বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়া বিপক্ষকে বিদগ্ধ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষও বড় সামান্য ব্যক্তি নহেন। উভয়ের মধ্যে সে রজনীতে যে শূল ভল্ল বর্ষিত হইযাছিল, তাহা কেহ লিখিয়া রাখিতে

পারিলে আজ এক অমূল্য রত্ন পাইতাম। কিন্তু ভৃত্য আর কিছু বলিতে পারিল না।”১

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন দীনবন্ধুর সঙ্গে সকলেরই পরিচয় ও সৌহার্দ্য ছিল, দীনবন্ধু সম্পর্কে যে গল্প কাহিনী প্রচলিত আছে তা একথা সপ্রমাণ করে। যে কোন পরিবেশে যে কোন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে মেশার ক্ষমতা সকলের হয় না। তা বিশেষ গুণ। দীনবন্ধুর এই মহৎ গুণ ছিল বলেই সমগ্র বাংলাদেশের দীনদরিদ্র মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যেমন ছিল তেমনি ছিল ধনবান সম্প্রদায়ের সঙ্গে। এই পরিচয়ে দীনবন্ধু-চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ছিল। দীনবন্ধু মিত্রের জীবনীতে এর পরিচয় দিয়েছেন হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়। দীনবন্ধুর পরিহাস রসিক ও প্রফুল্ল চিত্তের পরিচয় দিয়েছেন একটি ঘটনায়। তার বিবরণ উদ্ধৃত করা যায়—“একবার দীনবন্ধু পালকী করিয়া মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে এক গ্রামে গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন গ্রামে একজন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে মহাধুম,—ব্রাহ্মণ ভোজন ব্যাপারের অনুষ্ঠান, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট। দীনবন্ধু এই বাটীর নিকট আসিয়াই বেহারাকে পালকী নামাইতে বলিলেন। তিনি পালকী হইতে নামিয়াই বরাবর চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া উপস্থিত হইলেন, একপ্রান্তে আসন লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সরকারী কাগজপত্র বিস্তর থাকিত, লেখাপড়ার অনেক কাজ তাঁহার পথেও সম্পন্ন হইত। তিনি বেহারাদিগকে বলিলেন, আমার বাক্স ও কাগজপত্র এইস্থানে দিয়া যাও। তাহাই হইল। দীনবন্ধু চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া সেই কাগজপত্র দেখাশুনা লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। কাহারও সঙ্গে কোন কথাটি নাই, সমাগত অন্যান্য লোক একান্ত বিস্মিত, সকলেরই ধারণা, ইনি নিশ্চিতই কোন বড় লোক হইবেন। ভয়ে কেহ আর তাঁহাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। তিনিও কাহারও সহিত কথা কহিলেন না। তারপর ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় আসিল, ব্রাহ্মণগণ উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দীনবন্ধুও ব্রাহ্মণগণের সহিত পাতে বসিলেন। সকলেই অবাক। অবশেষে গৃহস্বামী বিনয়নম্র বচনে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, জানিতে পারিলেন, ইনি ‘দীনবন্ধু’ তখন গৃহস্বামীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া হাসিও কেহ রাখিতে পারিল না”।২ দীনবন্ধুর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নগেন্দ্রনাথ বসুও উল্লেখ করেছেন এই বলে যে, “বঙ্গদেশে এমন স্থান নাই, যেখানে দীনবন্ধুর বন্ধু মিলে না। তিনি যখন যেখানে

১। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, **বঙ্কিমজীবনী** (১৩১৮) ১৯১১ ৪০৫-৪০৭।
২। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, **বঙ্গ ভাষার লেখক**, ১৯০৪, (১৩১১) ৩১৪।

গিয়াছেন, সেখানেই ভদ্রলোকেরা তাঁহার বন্ধুশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইয়াছেন, সকলেই তাঁহাকে আপনার জ্ঞান করিতেন"।১

দীনবন্ধু মিত্রের খ্যাতি অবশ্যই তাঁর সাহিত্য কীর্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর নাটকগুলি সেই সময়ে বিপুল সাড়া তুলেছিল। সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অভিনয় নৈপুণ্যের ফলে নাটকের পাত্র-পাত্রীরা হয়ে উঠেছিল রক্ত-মাংসে জীবন্ত। বাংলাদেশেব নাট্য স্রোতকে যাঁরা গতি ও শক্তি দিয়েছিলেন, দীনবন্ধু তাঁদেব অন্যতম। তাঁব সমকালেব নাট্য আন্দোলনেও যেন তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ কবেছিলেন। তাঁব সমসাময়িক কৃতবিদ্য মানুষেব লেখায় এই পবিচয আছে। কয়েকটির উল্লেখ কবলে নাটক অভিনয়ে দীনবন্ধুব উৎসাহ, অভিনয়ের সঙ্গে নাটকীয় চরিত্রেব সংলাপ এবং আচরণের সঙ্গতি বক্ষা সম্পর্কে নাট্যকাবেব সতর্ক প্রয়াস লক্ষিত হবে।

বায বাহাদুব বামচন্দ মিত্রেব বাড়িতে বাগবাজাবের থিয়েটার সম্প্রদায় 'সধবাব একাদশী' অভিনয কবেছিলেন। 'কৃতবিদ্য বন্ধুগণ বেষ্টিত' হয়ে গ্রন্থকাব দীনবন্ধু এসেছিলেন সেই অভিনয দেখতে। "অর্ধেন্দুর জীবনচন্দ্রেব ভূমিকা (part)। জীবনচন্দ্রেব অভিনয দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। স্বযং গ্রন্থকার অর্ধেন্দুকে বলেন, আপনি যে অটলকে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author. আমি এবাব সধবাব একাদশীর নূতন সংস্কবণে অটলকে লাথি মাবিযা গমন লিখিযা দিব"।

"বায দীনবন্ধু বাহাদুব, অর্ধেন্দুব 'জীবনচন্দ্র' দেখিয়া তাঁহাব সম্পূর্ণ প্রতিভার পবিচয পান নাই। 'লীলাবতীতে অর্ধেন্দুকে' হববিলাস দেখিয়া একেবাবে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহাব মুখে আব প্রশংসা ধরে না। তাহার পব ন্যাশন্যাল থিযেটাব স্থাপিত হইয়া টিকিট বেচিয়া প্রথম 'নীলদর্পণ' অভিনয আবম্ভ হইল"।২

এই 'improvement on the author'-এব আর একটি পরিচয় দিয়েছেন গিবিশচন্দ্র ঘোষ। গিবিশচন্দ্রেব ভাষায়—"অর্ধেন্দুশেখব গ্রন্থকাবেব সহিত যোগদান কবিযা নাটকেব উৎকর্ষ সাধন করিতেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই, নাটকে জলধর কবিতা বচনা কবিযাছেন,

'মালতী মালতী মালতী ফুল
মজালে মজালে মজালে কুল।'

১। নগেন্দ্রনাথ বসু, **বিশ্বকোষ** (১৩০১) ১৮৯৪।

২। গিবিশচন্দ্র ঘোষ, **বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী নটের জীবনী ও নাট্যলীলা** ১৯০৮ (১৩১৫), ৫

জলধর-অর্ধেন্দু কবিতার একছত্র রচনা করিয়াছেন—'মালতী মালতী মালতী ফুল—মিলশব্দ দ্বিতীয় ছত্র আর হইয়া উঠিতেছে না—নানা প্রকার চেষ্টা হইতেছে, বহুকষ্টে দ্বিতীয়ছত্র রচিত হইল—'বিঁধেছে পাপড়িতে বোলতার হুল' কিন্তু ছত্রটি জলধরের মনোনীত হইতেছে না। কারণ পাপড়ি এ কথাটি 'বিঁধেছে'র দিকে দেওয়া যায়, কি বোলতার হুলের দিকে দেওয়া যায়। এই পাপড়ি এদিকে কি ওদিকে দেওয়া যাইবে। ইহার আলোচনা পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল। পাপড়িতে পাপড়িতে, উঁহু জলধরের মনোনীত হয় না। শেষে বিদ্যুত চমকের ন্যায় মনে উঠিল—মজালে মজালে মজালে কুল। যখন পাপড়ি লইয়া ব্যাকুল, তখন দর্শক হাসিয়া আকুল"।১

চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী'র অভিনয় প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছেন—"পিতার যশোহরে থাকা সময়ের মধ্যে আরো দুই চারিটি ঘটনা হয়। তাহার মধ্যে একটির সাহিত্যের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ বলিয়া উল্লেখযোগ্য, দীনবন্ধু-বাবু প্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয়। বঙ্কিমবাবুতে আমাতে লীলা-বতীর একরূপ পরিবর্তন করি। নাটকে ভোলানাথের কন্যা অহল্যাকে লইয়া যে একটি উপকথা লাগান আছে, সেই ভাগটি পরিত্যাগ করা হয়। বঙ্কিম-বাবু লীলাবতীর প্রণয়োন্মাদের অবস্থার Raving scene প্রলাপ দৃশ্য বসাইয়া দেন। আর টুকরা টাকরা পরিবর্তন বিস্তর করা হইয়াছিল। দীনবন্ধুবাবু প্রথমে কি কাটা হইয়াছে না হইয়াছে না জানিয়া বলিয়াছিলেন, যে এক একটি শব্দ কাটা হইয়াছে, আর আমার শরীর হইতে রক্তপাত হইয়াছে। তবে বঙ্কিম ভাই, আর অক্ষয় ছেলে, ইহাদের ভালোবাসি বলিয়া আমার শরীরে জ্বালা লাগে নাই। এই অভিনয় রঙ্গে ৭।৮টি গান ছিল, দুই-একটি আমার কৃত, আর অনেকগুলি সঞ্জীববাবুর রচিত। তাহার একটির উল্লেখ করা আবশ্যক। এক সময়ে এই গানটি আমি বৈদ্যনাথ, বহরমপুর, নাটোর, কলিকাতা এবং আমাদের অঞ্চলে সমানে গাহিতে শুনিয়াছি।"

"বোধকরি ১৮৭২ সালের গুডফ্রাইডের সময় চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ মল্লিক বাড়ীতে লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হইল। কলিকাতা হইতে দীনবন্ধুবাবু প্রভৃতি, যশোহর হইতে পিতা প্রভৃতি, ভাটপাড়া হইতে ভট্টাচার্যগণ, কাঁঠালপাড়া হইতে সঞ্জীববাবু প্রভৃতি, আমাদের স্বগ্রামের দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতি শুরবীর রথীগণ শ্রোতা। বঙ্কিমবাবু গুডফ্রাইডের ছুটি পাইয়াও আসিতে পারেন

১। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, **বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী নটের জীবনী ও নাট্যলীলা** ১৯০৮ (১৩১৫), ২৬

নাই। বাগবাজারের নীলদর্পণের দল অর্থাৎ অমৃতলাল বসু প্রভৃতি তাঁহারাও নিমন্ত্রিত শ্রোতা।"

"খুব চুটিয়ে অভিনয় হইল। তখন থিয়েটারে 'কীর্তন' প্রবেশ করে নাই, আমরা লীলাবতীর মুখে খাঁটি মনোহরসাহী সুর লাগাইয়াছিলাম—

'কে বলে গোকুলে আমার কানাই নাই,
আমি সতত তার অঙ্গের সৌরভ পাই।
আমার হিয়ার মাঝে, ও তার নূপুর বাজে,
ঐ রুনু ঝুনু বাজে, তোরা শোন গো সবাই।।'

এই সুরে সকলে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পাউণ্ড শিলিং পেন্স গণনায় যাপিত-জীবন মহারাজকে সকলে কঠোর প্রাণ বলিয়া জানিত, তিনিও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল। দীনবন্ধু আমাদের সাতখুন মাপ করিলেন, আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য মহাশয়েরা ত দুই হাতে দুই পায়ের ধূলা লইয়া মহানন্দে মহাআশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন 'Zমনটা শ্রোত ছিলাম তেমনটাই দ্যাখলাম।" সে রাত্রিতে আমাদের কিন্তু অসম্পূর্ণতা ছিল। ললিত লীলাবতীর মিলনের পরিচায়ক তেমন একটি ভাল গান বাঁধা হয় নাই। আমরা করিলাম কি প্রাচীন খেমটা গান ভাঙিয়াঃ—

আয় আয় মকর গঙ্গাজল!
লীলাবতীর বিয়ে হবে, সইতে যাব জল।
কোথা গো লবঙ্গলতা, কোথা গো উর্বশী কোথা,

ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচব ঝমঝমাইয়ে মল।১

এইরূপ একটা গান করিয়া, সেদিনের আসর রক্ষা, রস রক্ষা, মান রক্ষা করিলাম। পরদিন পিতাকে অনুরোধ করিলাম যে, সেক্সপিয়ারের টেম্পেষ্ট নাটকের শেষ মিলনের গানটি যেমন প্রসপিরর উক্তিতে আছে, সেইরূপ লীলাবতীর শ্রীনাথ মামার উক্তিতে একটি গান আমাদের করিয়া দিতে হইবে। তিনি স্বীকৃত হইলেন.........পিতা পরদিন যশোহর চলিয়া গেলেন। তার পরদিন পেঁছিন পত্রের সঙ্গে গান আসিল।

১। লীলাবতী নাটকে এই গান নেই।

'আজি কি সুখের উদয়
লীলার সংগে ললিতের আজ দিলাম পরিণয়'
দুখতম তিরহিল, সুখ ভানু প্রকাশিল,
রোদনের পুরী হলো আনন্দ আলয়।
বুঝিব সফল শ্রম, সকল আশয়।১

বঙ্কিমচন্দ্র ও 'সাধারণী সুপ্রসিদ্ধ' অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও অন্যান্য কীর্তিমান মানুষেরা 'লীলাবতী' অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে বাগবাজার থিয়েটার সম্প্রদায়ের বিশেষ করে গিরিশচন্দ্রের বন্ধু শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উৎসাহে লীলাবতী অভিনীত হল। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন—"লীলাবতী অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা হইল। অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধুবাবু আমায় বলিয়াছিলেন তোমাদের অভিনয়ের সহিত চুঁচুড়াদলের তুলনাই হয় না, আমি পত্র লিখিব দুয়ো বঙ্কিম"।২ বাংলা নাটকের ইতিহাসে দীনবন্ধুর নাটকগুলির গুরুত্ব গভীর। তাঁর সমকালে বহুবার অভিনীত হয়েছে নাটকগুলি। ধনবানদের উৎসাহে এবং তাঁদেরই গৃহে সেই সময় সাধারণত এই নাটকগুলির অভিনয় হত। এই সব অভিনয়ে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকারের অসুবিধা এবং তাদের নাট্যরস আকাঙ্ক্ষাই মূলত ন্যাশন্যাল থিয়েটার৩ প্রতিষ্ঠার কারণ। এই রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর দায়িত্ব অসামান্য। গিরিশচন্দ্র ঘোষ দীনবন্ধুর কাছে এই জাতীয় ঋণের উল্লেখ করে দীনবন্ধুর প্রতি একটি ঐতিহাসিক স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'শাস্তি কি শান্তি' উৎসর্গপত্রে লিখেছেন—
"নাট্যগুরু স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় শ্রীচরণেষু,

বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন যে সময়ে সধবার একাদশী অভিনয় হয় সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা এক প্রকার অসম্ভব হইত, কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র সধবার একাদশীতে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া সধবার একাদশী করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া ন্যাশন্যাল থিয়েটার

১। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, **পূর্বোক্ত** ৫৫৩-৫৫৫।

২। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, **পূর্বোক্ত**।

৩। ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২।

স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।”

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের জীবনীতে লিখেছেন—“মনুষ্য মাত্রেরই অহঙ্কার আছে, দীনবন্ধুর ছিল না। মনুষ্য মাত্রেরই রাগ আছে, দীনবন্ধুর ছিল না। দীনবন্ধুর কোন কথা আমার কাছে গোপন ছিল না, আমি কখন তাঁহার রাগ দেখি নাই। অনেক সময় তাঁহার ক্রোধাভাব দেখিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিয়াছি, তিনি রাগ করিতে পারিলেন না, বলিয়া অপ্রতিভ হইয়াছেন। অযথা ক্রুদ্ধ হইবার জন্য যত্ন করিয়া শেষে নিষ্ফল হইয়া বলিয়াছেন ‘কই, রাগ যে হয় না।”

তাঁহার যে কিছু ক্রোধের চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহা জামাই বারিকের ভোতারাম ভাটের উপরে। দীনবন্ধুর এই ক্রোধের উল্লেখ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, কলিকাতা রিবিউর উল্লেখ করেছেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকারও তাঁর পিতাপুত্র প্রবন্ধে Calcutta Review’ পত্রিকাতে রেভারেণ্ড লালবিহারী দের সমালোচনার উল্লেখ করেছেন। সধবার একাদশীর তীব্র সমালোচনা এখানে প্রকাশিত হয়েছিল।১ বঙ্কিমচন্দ্র ‘ভোতারাম ভাট’কে দীনবন্ধুর কলঙ্ক বলেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলেছেন—“ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে, দীনবন্ধু কখন একটিও অসৎকার্য করেন নাই। তাঁহার স্বভাব তাদৃশ তেজস্বী ছিল না বটে, বন্ধুর অনুরোধে বা সংসর্গ দোষে নিন্দনীয় কার্যের কিঞ্চিৎ সংস্পর্শ তিনি সকল সময়ে এড়াইতে পারিতেন না, কিন্তু যাহা অসৎ যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, যাহা পাপের কার্য, এমত কার্য দীনবন্ধু কখন করেন নাই। তিনি অনেক লোকের উপকার করিয়াছেন, তাঁহার অনুগ্রহে বিস্তর লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে।” বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব প্রবন্ধে দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির উল্লেখ করে যে সারগর্ভ কথা বলেছেন তা দীনবন্ধু-জীবনের ভিত্তি বললে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—“দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র। বিস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। গরীব দুঃখীর দুঃখের মর্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকে দেখি না। তাই দীনবন্ধু অমন একটা তোরাপ

১। If this trash ever be put on the stage, we cannot recommend a better place for its performance than Sonagachi and a fitter audience than its inmates and their patrons.

অক্ষয়চন্দ্র সরকার, পিতাপুত্র, **বঙ্গভাষার লেখক, পূর্বোক্ত**, ৫৩২।

কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সহানুভূতি কেবল গরীব দুঃখীর সঙ্গে নহে, ইহা সর্বব্যাপী। তিনি নিজে পবিত্র চরিত্র ছিলেন, কিন্তু দুশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভান ছিল না। এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক তিনি সর্বস্থানে যাইতেন, শুদ্ধাত্মা পাপাত্মা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু অগ্নিমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় পাপাগ্নি কুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতির শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুদ্ধ জীবন সুখ বিফলীকৃত-শিক্ষা, নৈরাশ্য পীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ বিষয়ে ভগ্ন মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞবর্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুকে আমি বিশেষ জানিতাম, তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্বাস, এরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ, তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে।”

আর একটি ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় উল্লেখ করে দীনবন্ধু প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে। দীনবন্ধু জীবনীতে বঙ্কিম এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

“একদিন রাত্রে নীলদর্পণ লিখিতে লিখিতে দীনবন্ধু মেঘনা পার হইতেছিলেন। কুল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গেলে নৌকা হঠাৎ জলমগ্ন হইতে লাগিল। দাঁড়ী মাজী সকলেই সন্তরণ আরম্ভ করিল, দীনবন্ধু তাহাতে অক্ষম। দীনবন্ধু নীলদর্পণ হস্তে করিয়া জলমজ্জনোম্মুখ নৌকায় নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন। এমন সময় হঠাৎ একজন সন্তরণকারীর পদ মৃত্তিকা স্পর্শ করিবায় সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, ‘ভয় নাই এখানে জল অল্প, নিকটে অবশ্য চর আছে।’ বাস্তব নিকটে চব ছিল, তথায় নৌকা আনীত হইয়া চরলগ্ন হইলে দীনবন্ধু উঠিয়া নৌকার ছাদের উপর বসিয়া রহিলেন। তখনও সেই আর্দ্র নীলদর্পণ তাঁহার হস্তে রহিয়াছে। এই সময় মেঘনায় ভাটা বহিতেছিল, সত্বরেই জোয়ার আসিয়া এই চর ডুবিয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে এই জলপূর্ণ ভগ্নতরি ভাসিয়া যাইবে, তখন জীবন রক্ষার উপায় কি হইবে। এই ভাবনা দাঁড়ী মাঝি সকলেই ভাবিতেছিল। দীনবন্ধুও ভাবিতেছিলেন। তখন রাত্রি গভীর। আবার ঘোর অন্ধকার, চারিদিকে বেগবতীর বিষম স্রোতধ্বনি, কচিৎ মধ্যে মধ্যে নিশাচর পক্ষীদিগের চীৎকার, জীবনরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া দীনবন্ধু একেবারে নিরাশ্বাস হইতেছিলেন, এমন সময় দূরে দাঁড়ের শব্দ শুনা গেল। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিবায় দূরবর্তী নৌকারোহীরা

উত্তর দিল, এবং সত্বরে আসিয়া দীনবন্ধু ও তৎসমভিব্যাহারীদিগকে উদ্ধার করিল।"১

দীনবন্ধু জীবনে এই নাটকীয় ঘটনা বিস্ময়কর। বেগবতী মেঘনার বিষম স্রোতধ্বনি, গভীর নিস্তব্ধ অন্ধকারে জলমগ্ন তরিতে উপবিষ্ট দীনবন্ধু জীবনে এরচেয়ে সঙ্কটকর মুহূর্ত আর আসেনি। মনে হয় এই দুর্যোগের আড়ালে প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় শক্তি যেন দীনবন্ধুকে এক বিরাট পরীক্ষার সামনে এনেছিল। সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে দীনবন্ধু সম্মুখীন হয়েছিলেন মৃত্যুর, অথচ আঁকড়ে ধরেছিলেন আর্দ্র নীলদর্পণ। মনে হয় দীনবন্ধু-জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতার এ এক একক নিদর্শন। মৃত্যু প্রপীড়িত জীবনের কথা নীলদর্পণ ছাড়া আর অন্য কোন রচনাতে নেই। বিস্ফোটক রোগে মৃত্যুর প্রাক্কালেও দীনবন্ধু বলেছিলেন—'ফোড়া আমার পায়ে ধরেছে।'। মৃত্যুকে অস্বীকার করে তাকেও স্নিগ্ধ হাসিতে সিক্ত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাই জলমগ্ন নৌকায় গভীর রাত্রির অন্ধকারে স্রোতস্বতী মেঘনার বক্ষে দীনবন্ধু নিস্তব্ধ অবস্থায় প্রতীক্ষা করেছিলেন মৃত্যুর। কিন্তু মনে হয় মেঘনার বিষম স্রোতধ্বনি, নিশাচর পক্ষীদের চিৎকার ও রাত্রির নৈঃশব্দে মৃত্যু পরাস্ত হয়েছিল জীবনের কাছে। বেগবতীর অন্ধকারে নীলদর্পণকে বিসর্জন দিতে পারেননি কবি, সযত্নে তাকে বেঁধে রেখেছিলেন বুকের কাছে। দীনবন্ধুর সাহিত্য কীর্তির ও জীবনের ভিত্তি এই মমত্ববোধে।

১। ঘটনাটি নিয়ে আধুনিক লেখক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, **একটি অবিস্মরণীয় রাত্রি** নামে গল্প রচনা করেছেন।

॥ দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম জীবনের কবিতা ॥

(১৮৫১—১৮৫৫)

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের পুত্রগণ 'পদ্য সংগ্রহ' নামে দীনবন্ধু মিত্রের বারোটি কবিতার একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেছিলেন।১ এগুলি তাঁর ছাত্রাবস্থার রচনা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর২ দ্বিতীয় খণ্ডের অন্যতম সংযোজন দীনবন্ধু মিত্রের ছাত্র জীবনের এই রচনাগুলি। এগুলিকে 'বিবিধ ঃ গদ্য পদ্য' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশ করেছেন। হিন্দু কলেজে ছাত্র থাকাকালীন৩ দীনবন্ধু মিত্র ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে কবিতা লিখতেন। সংবাদ প্রভাকব ছাড়া তিনি সংবাদ সাধুরঞ্জন (আগস্ট ১৮৪৭) ও বঙ্গদর্শনে কবিতা লিখেছেন।

অধিকাংশ কবির বাল্যরচনা তাঁদের পরবর্তী কাব্যকীর্তির কাছে ম্লান মনে হয় বলে সাধারণতঃ অবহেলিত থাকে। কিন্তু কবির কাব্যজীবনের ইতিহাস এগুলির মধ্যে প্রকাশ পায়। স্বভাবতঃই সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে একটি তরুণ অপরিণত কবিমন এখানে ধরা দেয়। ব্যক্তিগত সংস্কার বোধ, ধারণার পাশে যুগের মনটিও বাঁধা পড়ে। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আবর্তিত হয় কবির লক্ষ্য। বেছে নিতে নিজস্ব সাধনার পথ। আর সেই নিজস্ব রীতির পথ ধরে কবি ক্রমশই প্রকাশ ভঙ্গীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। দীপ্তিহীন ম্লান নক্ষত্র যেমন মেঘের আড়াল থেকে নিজেকে প্রকাশ করে—অপরিণত কবির দীর্ঘ সাধনার প্রকাশও যেন তাই। উৎকর্ষ বিচারে এদের মূল্য সামান্য এবং সাধারণ হলেও এদেরই মধ্যে আছে কবির কাব্য ইতিহাসের তথ্য। তাঁর সামগ্রিক কাব্যের মুখবন্ধ হিসেবে প্রথম লেখা কবিতাগুলির মূল্যও যথেষ্ট। সেই সঙ্গে এই রচনাগুলির মধ্যে পরবর্তী কাব্য জীবনের ইঙ্গিত ও কবিধর্মের সূচনাকেও লক্ষ্য করা চলতে পারে। দীনবন্ধু মিত্রও একথার ব্যতিক্রম নন।

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ' এর দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে 'বিবিধঃ

১। দীনবন্ধু মিত্র, পদ্য সংগ্রহ, (১৩৬৬) ১৯০৯।

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত **'দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী'** (১ম ও ২য় খণ্ড), কলিকাতা ১৯৪৪ (১৩৫১)।

৩। দীনবন্ধু ১৮৫০ খৃঃ ১৮৫৪ খৃঃ পর্যন্ত হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করেন। দ্রষ্টব্য—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **সাহিত্য সাধক চরিতমালা**, ২য় খণ্ড, কলিকাতা (১৩৬২) ১৯৫৫ ঃ ১৩৭-১৪০।

গদ্য পদ্য' অংশে তিনটি গদ্য ও সতেরটি পদ্য১ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলির এগারটির প্রকাশের তারিখ দেওয়া আছে। কিন্তু এগুলি কালানুক্রমিক সাজানো নয়—তা সাজিয়ে নিলে এই রকম দাড়ায়,—

১৮৫১, ৫ই জুন, জামাই ষষ্ঠি, সংবাদ প্রভাকর।

১৮৫২, ২৬শে জানুয়ারী, মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান (রূপক), সংবাদ প্রভাকর।

১৮৫২, ২৩শে মার্চ, বসন্তের আগমনে সুমতি কুমতি সহচরীদ্বয় সহিত বিরহিনীর কথোপকথন, সংবাদ প্রভাকর।

১৮৫২, ৪ঠা মে, চন্দ্র (রূপক), সংবাদ প্রভাকর।

১৮৫২, ২৫শে মে, জামাই ষষ্ঠি, সংবাদ প্রভাকর।

১৮৫৩, ১৪—১৫ই মার্চ, দম্পতি প্রণয় বিজয় কামিনী, সংবাদ প্রভাকর।

১৯৫৩, ২৫শে মে, সত্যের মহিমায় পাপের পরাজয় এবং কবিতা পরিণামের দোষ, সংবাদ প্রভাকর।

১৮৫৩, ৯ই আগস্ট, কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ। চোকে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়ে দিই, সংবাদ প্রভাকর।

১৮৫৩, ১৭ই ও ১৮ই নভেম্বর কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ, হাতে হাতে পাপের ফল, সংবাদ প্রভাকর।

১৮৫৫ (সন ১২৬২) ১০ই ফাল্গুন, বিধবার বিবাহ

১৮৭২ (১২৭৯) আষাঢ়, প্রভাত২, বঙ্গদর্শন

উল্লেখিত এগারটি কবিতার ন'টি কবিতার প্রকাশ সংবাদ প্রভাকরে, একটির বঙ্গদর্শনে ও অন্যটিরও প্রকাশকাল অপ্রকাশিত। প্রভাত কবিতাটি দীনবন্ধুর মৃত্যুর এক বছর আগের। এই কবিতার সঙ্গে যুক্ত ছটি কবিতার প্রকাশের তারিখ জানা যায় নি। সেই ছটি কবিতা—

মানব চরিত্র—

সন্ধ্যার পূর্বে সরোবরের শোভা—

নায়কের অনাগমে নায়িকার খেদ—

বসন্তের আগমনে বিরহিনীর খেদ

জনক জননীর স্নেহ ও লয়ালিট লোটস—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর 'বিবিধঃ গদ্য পদ্য' এর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে এই কবিতা সংগ্রহের প্রথম বারোটি কবিতা সংবাদ

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত গ্রন্থে সংখ্যা চিহ্ন দিয়ে ১৬টি কবিতা উল্লেখিত। কিন্তু জামাই ষষ্ঠি দুবার প্রকাশিত হলেও তা প্রকৃত পক্ষে দুটি স্বতন্ত্র কবিতা।

২। এই কবিতাটি দীনবন্ধুর পরিণত বয়সে লিখিত।

সাধুরঞ্জন, সংবাদ প্রভাকর ও বঙ্গদর্শন থেকে সংগৃহীত। সুতরাং প্রকাশ তারিখ না থাকলেও এই কবিতাগুলি যে অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলির সমসাময়িক এমন মনে করাই যুক্তি যুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রও যে 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' প্রকাশিত কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। 'মানব চরিত্র' কবিতাটির উল্লেখও তিনি এপ্রসঙ্গে করেছেন।১

দীনবন্ধুর ছাত্রাবস্থার এই কবিতাগুলিকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম, বর্ণনাত্মক ও দ্বিতীয়, উত্তর প্রত্যুত্তোরমূলক কবিতা। 'বিজয়কামিনী' কবিতাটিকে অবশ্য এই বিভাগের অন্তর্গত করা চলে না। কবিতাটি অন্য কবিতাগুলির তুলনায় শুধু দীর্ঘই নয় তা আসলে একটি কাহিনী কাব্য। কবিতার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য বা রূপবন্ধের বৈচিত্র্য এই কবিতাগুলিতে বিশেষ নেই। ঈশ্বর গুপ্তের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দীনবন্ধুকে শুধুমাত্র কবিতা লিখতেই সাহায্য করেনি তাঁকে কাব্যের ক্ষেত্রে শিষ্যত্বের আসনেও বসিয়েছিল। গুরুর রুচি ও আদর্শকে গ্রহণ করার সার্থক প্রয়াস পেয়েছিলেন কবি। মনে রাখতে হবে ঈশ্বরগুপ্ত এমন এক সময়ের কবি যখন পুরনো আদর্শ ও ঐতিহ্যকে ভাঙ্গার চেষ্টা দেখা দিয়েছে—সেই সঙ্গে নতুন শিক্ষা সংস্কারও সমভাবে প্রকাশিত। যুগপরিবর্তনের এই সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরগুপ্ত যুগের যন্ত্রণাকে অনুভব করেছেন। কখনো ব্যঙ্গ বিদ্রূপে মুখর, কখনো তীক্ষ্ন কণ্ঠ কখনো বা গ্রাম বাংলার জীবনরূপ দেখা দিয়েছে তাঁর কাব্যে। উনিশ শতকের এই জীবন জিজ্ঞাসা আরো তীব্র হয়েছে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রে। জীবনের অন্তহীন রহস্য সন্ধানের যে চেষ্টা তীব্র হাহাকারে বঙ্কিম সাহিত্যে প্রকাশিত বা মধুসূদনেব কবি-আত্মার যে পক্ষবিধুনন সেই যন্ত্রনার অঙ্কুর ভিন্ন ভাবে হলেও ঈশ্বরগুপ্তকে আন্দোলিত করেছিল। যুগের প্রতিফলনে ও প্রতিক্রিয়ায় তাঁর কাব্য সমৃদ্ধ। এই আন্দোলনের বিচিত্র রূপ তাই তাঁর কাব্যে বৈচিত্র্য ও অসঙ্গতির মধ্যে ধরা দিয়েছে। স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে বা বিধবা বিবাহের বিবৃদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া আবার বিদেশের ঠাকুর ফেলে দেশের কুকুরের প্রতি স্নেহ। দীনবন্ধু এই কবির শিষ্য।

ছাত্র জীবনের অনুভব যখন নিতান্ত অপরিণত অথচ প্রকাশ চিন্তায় আকুল তখন প্রকাশের পথ স্বভাবতঃই পথানুসৃতি অথবা অনুকরণ। এই অনুকরণ

১। 'অন্যে ঐ কবিতাপাঠ করিয়া কিরূপ বোধ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না কিন্তু উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল, আমি ঐ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম এবং যতদিন সেই সংখ্যার সাধুরঞ্জনখানি জীর্ণ গলিত না হইয়াছিল, ততদিন উহাকে ত্যাগ করি নাই।' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, **রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা**, ১৮৭৭।

বিভিন্নভাবে দীনবন্ধুর কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ধর্মকেও তিনি গ্রহণ করেছেন সেই সঙ্গে গ্রহণ করেছেন প্রচলিত রূপবন্ধ ও ভাবনাকে। মানব চরিত্র১ কবিতার মানব চরিত্রের বিকৃত দিকের উল্লেখে ঊনিশ শতকের 'বাবু' সম্প্রদায়ের ইঙ্গিত পরিস্ফুট। তাদের অসঙ্গতির উদাহরণও হাস্যরসাত্মক। তাদের মস্তকস্থিত বিলাতি ধারায় যে মতিঝিল প্রবাহিত সেই কেশবিন্যাসের প্রতি কবির ব্যঙ্গ অবশ্য জ্বালা ধরায় না বরং স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে তোলে। অবশ্য কবি মানবচরিত্রের প্রতিই যে শেষ পর্যন্ত অনুরক্ত এমন নয়, মানবচরিত্র ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে ভিন্ন জগতে এসে উপস্থিত হন। সেখানে ভক্তি বিনম্র কবির প্রকাশ—

ভবসিন্ধু বারি বিন্দু কৃপাসিন্ধু আশে।
দীনবন্ধু পদাবিন্দে দীনবন্ধু ভাষে॥

এই কবিতাটিতেই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে আত্মা ও নশ্বর শরীর সংক্রান্ত কথাবার্তা প্রকাশিত—,

মাটিতে গঠিত কায় মাটি হয়ে যাবে।
কর্ম ফলে সুখ দুঃখ ভোগে আত্মারবে॥
নশ্বর শরীর এই স্থায়িত্ব রহিত।
চৈতন্য বিহীনে হবে চৈতন্য রহিত॥

অথবা

চিন্তা মনি চিত্ত চিন্তা নাহি করে।
অসার সংসারছায়া কায়া বলে ধরে॥

এই কথাগুলির রূপ এবং ভাবনায় ঈশ্বরগুপ্তের অনুকরণ ও প্রাচীন

১। এই কবিতাটির সঙ্গে Alexander Pope (1688-1744)-এর 'An Essay on Man' (1733-34) কবিতাটির মিল আছে। Pope তাঁর গ্রন্থের 'Design' এ লিখেছেন—"Having proposed to write some pieces on human life and manners, such as (to use my Lord Bacon's expression) 'come home to men's business and bosoms', I thought it more satisfactory to begin with considering man in the abstract, his nature and his state ; since, to prove any moral duty, to enforce any moral precept, or to examine the perfection or imperfection of any creature whatsoever, it is necessary first to know what condition and relation it is placed in and what is the proper end and purpose of its being."

ভনিতার রীতিতে পুরাতন ভাবনাই বড় হয়ে ওঠে। দীনবন্ধু মিত্রের ছাত্রাবস্থায় কবিতাগুলির নামেও এই পথানুসৃতির পরিচয় স্পষ্ট। নামকরণের মাধ্যমেও কবি তাঁর কাব্যভাবনাকে ব্যঞ্জিত করতে পারেন। দীনবন্ধুর এই কবিতাগুলির বিষয়বস্তু ও নামকরণ উভয়ই প্রাচীনতাধর্মী। 'নায়িকার অনাগমে নায়িকার খেদ' বা বসন্তের আগমনে বিরহিনীর খেদ অথবা বসন্তের আগমনে সুমতি কুমতি সহচরীদ্বয়ের সহিত কথোপকথন ইত্যাদি কবিতার বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব নেই। বসন্ত ঋতুর মানসিক যন্ত্রণা বিরহের শূন্যতায় বিলীন হবার জন্যে পঞ্চশরের ফুলবানের প্রয়োগ, অথবা নায়কের অনাগমনের ফলে যে ভালোবাসার ব্যর্থতা তা প্রকাশ ভঙ্গীর নতুনত্ব না থাকায় শিল্প হয়ে ওঠে না। মাঘমাসে প্রাতঃস্নান, চন্দ্র, প্রভাত, এই কবিতাগুলির, ভাবনা কোন সংকেতধর্মী ভাষায় ব্যক্ত নয়। প্রথম দুটি কবিতাকে কবি রূপক অভিহিত করেছেন এবং কবিতা দুটির মূল ভাবনা থেকে বিচ্যুত হয়ে তিনি ভিন্ন পথে ধাবিত। অন্যান্য কবিতাগুলির নামকরণের মধ্যে তত্ত্ব বা নীতি সংক্রান্ত মনোভাব স্পষ্ট। সত্যের মহিমায় পাপের পরাজয় এবং কবিতা পরিণামের দোষ, অথবা মানব চরিত্র, কবিতা দুটির নামের দিকে দৃষ্টিপাত করলে একথার যাথার্থ প্রমাণিত হবে।

বর্ণাত্মক কবিতাগুলির অধিকাংশই সহজ স্বচ্ছভাষায় মৌল ভাবকে প্রকাশ করেছে। ঈশ্বর গুপ্তের মত তির্যক ভাষায় কবি নিজের প্রকাশ পথ খোঁজেন নি বরং প্রচলিত পয়ারবন্ধেই কবি নিজেকে তুলে ধরতে প্রয়াসী। এই প্রাচীন কাব্যকলার অনুসরণ বিভিন্নভাবে প্রকাশিত। শুধুমাত্র পয়ারবন্ধই নয়, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, বৈষ্ণব পদাবলী ও ভারতচন্দ্রের প্রভাব। 'বিজয় কামিনী' কাহিনী কাব্যে বিজয় ও কামিনীর কথাবার্তায় নায়ক নায়িকা সুলভ বাচন ভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে। কাহিনী ও চরিত্রের দিক থেকে ভিন্ন হলেও ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীর সুন্দর-এর বিদ্যার সঙ্গে কথোপকথনের সংকেতময় ভাষার ছাপ বিজয় কামিনীর কথাকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ চোকে আঙুল দিয়া বুঝাইয়ে দিই', এই কবিতাতেও চঞ্চলা নাম্নী রাজকুমারীর অবৈধ প্রণয়ের ওপর বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর ছাপ আছে যদিও চরিত্র বা ঘটনাগত কোন মিল নেই। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবও কতগুলি কবিতায় পরোক্ষে কাজ করেছে। 'বসন্তের আগমনে বিরহিণীর খেদ' কবিতায় রাধিকার ছায়াপাত ঘটেছে, তবে এখানে অবৈধ ভালোবাসার ক্ষেদোক্তি নেই। বৈষ্ণব পদাবলীর যশোদার প্রতিফলন 'জনক-জননীর স্নেহ' কবিতাতে সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছে। এই ছবি যে কোন কালের বাঙালী জননীর রূপমূর্তি—

সময়ে সময়ে সুখে সকালে বিকালে।
ঝিনুকে বাজায়ে বাটি, দুদ দেন গালে॥
মুছায়ে করেন শিশু অঙ্গ মণিময়।
স্বর্ণ অঙ্গে ধূলা মার প্রাণে নাহি সয়॥

মনে রাখতে হবে সেই সময়ের যুগচিত্তের প্রতিফলনই আসলে কবির কাব্যে প্রকাশিত। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে যে আধুনিকতার উদ্ভব তা জন্মসূত্রে মধ্য যুগের কাব্যের সঙ্গে যুক্ত। ঈশ্বর গুপ্ত তাই সমাজের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে এত প্রতিক্রিয়াশীল। বাংলাদেশের প্রাচীন সংস্কৃতিকে তুলে ধরাতেই যেন তাঁর আনন্দ। তাঁর 'সারদামঙ্গল' কাব্যে সম্ভবতঃ সেই কবিচিত্তের প্রকাশ। দীনবন্ধু মিত্রও তাঁর বর্ণনাধর্মী কবিতাগুলির মধ্যে বাঙালীর লৌকিক রূপকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। এই লৌকিক রূপ নারীদের কথাবার্তা ও আচার-আচরণে প্রকাশিত। 'সন্ধ্যার পূর্বে সরোবরের শোভা' কবিতায়—

রঙ্গদিদি মিতিন প্রভৃতি গঙ্গাজল
কুম্ভকাঁখে হাস্য মুখে নিতে যায় জল।

এরাই পূর্ণ কলসীকক্ষে ফিরে চলেছে গৃহে। তাদের বর্ণনায় দীনবন্ধুর বাস্তববোধের সঙ্গে নারীসমাজের লৌকিক লজ্জাশীলা মূর্তি ধরা দিয়েছে।

কেহ লাজে ঢাকে মুখ কেহ ধীরে চলে,
মোরে হেরে ঐ মিনসে হাসে কেহ বলে॥
কেহ বলে ওরে হেরে প্রাণ বার হয়।
দীনবন্ধু বলে শুধু জলআনা নয়॥

এই প্রচলিত পথানুবর্তনে বার বার ফিরে এসেছে পুরনো রূপক উপমা। সন্ধ্যার পূর্বে সরোবরের শোভা কবিতায় সন্ধ্যার বর্ণনার সঙ্গে কাকচক্ষু সরোবরের নির্মলতা মিশে গিয়ে এক বিচিত্র সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। এমনকি এই সরোবরকে 'বারুণী পুষ্করিণী'র পূর্ববর্তী বলে মনে হয়। কয়েকটি সুন্দর ছবিও এই কবিতায় আছে, যেমন—

রূপসী কলসী দিয়া ঢেয়াইয়া দিল—
মুখপদ্ম হেরিপদ্ম সলিলে ডুবিল।

কবিতাগুলির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য যুগচেতনার প্রকাশে। 'মানবচরিত্র ক্ষেত্রে নেত্র পাত' করে কবি যে মানব-চরিত্রের ছবি এঁকেছেন তা সেই সময়ের 'বাবু সম্প্রদায় ও অন্যান্য ইতর মনুষ্যকুলের। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী রচনা 'বাবুর' সূক্ষ্ম ইঙ্গিতও যেন এখানে পাওয়া যায়। দীনবন্ধুর সমকালীন 'সুনীতি' 'কুনীতি' সম্পর্কিত বোধ যেন 'সুমতি' 'কুমতি' রূপে প্রকাশিত।

ধর্ম এবং তত্ত্বগন্ধী কথাবার্তাও মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। বিধবার বিবাহ কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছে যুগচিত্তের স্পষ্ট প্রক্ষেপ।

অবশ্য এই বর্ণনাত্মক কবিতাগুলির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বাস্তবতায় ও হাস্যরস সৃষ্টিতে।

'মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান' ও 'সন্ধ্যার পূর্বে সরোবরের শোভা', 'প্রভাত' এই কবিতাগুলিতে কবির বাস্তববোধের পরিচয় তীব্র। মাঘ মাসে শীতের প্রকোপ, পথে নারীদের লৌকিক কথাবার্তা, বা পথের নির্লজ্জ মানুষ কিংবা স্নানান্তে নারীদের প্রত্যাবর্তন—এই অংশগুলি বাস্তবতার দিক থেকে আশ্চর্য সজীব। প্রচলিত উপমা গ্রহণ করেও কবি এখানে সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সক্ষম—

চলিল ললনাশ্রেণী, আনন্দ অপার।
বিনাসূত্রে গাঁথা যেন, কুসুমের হার॥

স্নানযাত্রার পথে নিতান্ত ঘরোয়া কথাও সুন্দর হয়ে ওঠে—

কেহ বলে হেগো দিদি, শোন দেখি চেয়ে।
শ্বশুরের বাড়ি নাকি গেছে তোর মেয়ে॥

কবে বা আনিলি হেথা, না জানিতে পারি।
তাড়াতাড়ি পাঠাইলি, রেখে দিন চারি॥

আহা বন কি বলিব, দুরন্ত জামাই।
কি জানি করিবে রাগ, না যদি পাঠাই।

আগমনী ও বিজয়-সংগীতের মধ্যেও এই সুর আছে কিন্তু নিতান্ত লৌকিক ভঙ্গীতে ও নাটকীয় ঢং-এর এই কথাগুলি শুধু সজীবই নয় তা মাতৃহৃদয়ের বেদনা প্রকাশেও সমর্থ হয়েছে। 'প্রভাত' কবিতাতে সকালবেলার গ্রামীণ জীবনের সর্বাঙ্গীণ ছবি দেখা দিয়েছে। অবশ্য দীনবন্ধুর অধিকাংশ কবিতাব হাস্যউচ্ছল মুহূর্তগুলি পাঠকগণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। 'জামাই-ষষ্ঠী'(১) কবিতা দুটিতে হাস্যরসের চরম উৎকর্ষ দেখা দিয়েছে। এই বিশেষ দিনটির জন্য নববিবাহিত যুবকদের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা এবং শ্বশুর-মন্দিরে যাত্রার জন্যে বেশবাস সংগ্রহ ও পরিশেষে শ্বশুর-গৃহে রসিকতার পাত্রীদের কাছে মধুর অপমান ও লজ্জার পর নববিবাহিত পত্নীর সঙ্গে মিলন। এই কবিতা দুটিতে বাঙালী গৃহের লৌকিক আচার-আচরণ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও

১। এই দুইটি কবিতা বিশেষ প্রশংসিত হয় এবং আগ্রহাতিশয্যের সহিত পঠিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় বৎসরের 'জামাই ষষ্ঠি' যে সংখ্যক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, তাহা পুনর্মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত।

জামাই ঠকানোর বাস্তব ছবিগুলি কবি তুলে ধরেছেন। জামাইষষ্ঠী কবিতা দুটির কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে একথা সপ্রমাণ করা যেতে পারে।

যুবকদের বেশবাসের বর্ণনা ঃ—

পরিল ঢাকাই ধুতি উড়ানি উড়িল।
কামিজ পীরন পেংগি কত গায় দিল॥
কারপেট সুজ পায়, আঙ্গুলে অঙ্গুরী।
কাটিয়া বিলাতী সিঁতি বাড়ায় মাধুরী,

কোথাও—

সুবেশে শ্বশুর বাড়ি বাড়াইতে মান।
বসন চাহিয়া ফেরে খোয়াইয়া মান—
কোন জন বলে আসি ইয়ারের সনে
ধুতি হলে যেতে পারি শ্বশুরভবনে॥

অন্দরে জামাই যায় কৌতুকী হইয়া।
মুদ্রা দিয়া বন্দিলেন শাশুড়ী চরণ।
উপরে তুলিতে মুখ লজ্জিত নয়ন॥
মেয়ের ভেড়ুয়া করা শাশুড়ীর ক্রিয়া।
আশীর্বাদে গরু করে ধানদুর্বা দিয়া॥

ছলনা ললনাগণ গোপনে করিল—
ভাঁটা পরে কাষ্ঠাসন বসিবারে দিল॥
আহ্লাদে প্রহ্লাদ ক্ষেপা বসিল তাহায়—
টলিয়া চলিল পিঁড়ি বড় লাজ পায়।

এই পরিহাসের মাত্রা কখনও কখনও দৈহিক নির্যাতনের পর্যায়ে ওঠে—

বিচুলির জলেকরে মিছরির পানা
তৃষ্ণায় জামাই খাবে না করিবে মানা॥
— — — — — — --- --- --- ---
কাঁটালের বিচি কেটে করেছে কেসুর—

অপরূপ শশা করে ত্যালাকুচা কেটে—
আহ্লাদে হইয়া কানা দিতে হয় পেটে॥

অবশেষে শয়ন-মন্দিরে অধরচুম্বনের পর পতির 'বল দেখি আমি তব হই কোন

জন' এই প্রশ্নের উত্তরে রসিকা বালিকা স্ত্রীর কাছেও আত্মসমর্পণ করতে হয়—

জানিয়াছি জিজ্ঞাসিয়ে ঠাকুরঝির ঠাই
তুমি প্রাণ হও মোর ঠাকুরজামাই।

বাইরে মহিলাবৃন্দের উচ্ছ্বসিত কলহাস্যের মধ্যে অবশ্য এই কথা হারিয়ে যায়।

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় ধরনের কবিতাগুলি কথোপকথনধর্মী এবং এগুলি তাঁর কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ নামে পরিচিত। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারীর (সুধীরঞ্জন [১৮৫৫] প্রণেতা) সঙ্গে কবিতায় বাক্-যুদ্ধ হোত সংবাদ প্রভাকরে। বঙ্কিমচন্দ্রও এই যুদ্ধের একজন অন্যতম সৈনিক ছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারীর সঙ্গে দীনবন্ধুর এই কবিতাযুদ্ধ সমকালীন ছাত্রসমাজকে আন্দোলিত করেছিল। দ্বারকানাথকে কখনো 'দ্বারীবাবু' কখনো 'অধিকারী মহাশয়' ইত্যাদি সম্ভাষণে সম্বোধন করেছেন কবি। এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্র প্রকাশ দেখা দিয়েছে 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ। চোকে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়ে দিই' এই কবিতায়। এখানেও ব্যঙ্গের মাধ্যমে হাস্যরস প্রকাশিত—

No No ভাই আমি নই এমন অসার
ও অর্থে, বলদ আমি করিব ব্যাভার।
যার বলে হয় লোক গরু অধিকারী
আমি কি সে অর্থ কভু শব্দে দিতে পারি।
বলদ অর্থেতে হয় যেই দেয় বল।
জলদে যেমন অর্থ যেই দেয় জল॥

দ্বারকানাথ অধিকারীর কাব্য-লক্ষ্মীকে কবি রাজকন্যা চণ্ডলার সঙ্গে তুলনা করেছেন 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ। হাতে হাতে পাপের ফল' এই কবিতায়। এই কবিতায় চণ্ডলা রাজকন্যার কাহিনীটি উপভোগ্য, কোথাও কোথাও সুন্দর উপমাও দেখা দিয়েছে। এই কথোপকথনধর্মী কবিতাগুলিতেই দীনবন্ধুর প্রকৃত কাব্যস্বভাব বিধৃত। 'বিজয় কামিনী' একটি কাহিনীকাব্য। বিজয় ও কামিনীর নির্মল ও সংযত ভালোবাসার কথা ও পরে তাঁদের বিবাহে এ কাহিনীর পরিণতি। বিজয় ও কামিনীর কথাবার্তায় বাচনভঙ্গীর ঔজ্জ্বল্য যেমন প্রকাশিত তেমনি প্রকাশিত তাদের সহজ সান্নিধ্যের সারল্য। রোমিও জুলিয়েট-এর ভালোবাসার ক্ষীণ প্রভাব যেন এদের জীবনে প্রতিফলিত। অবশ্য গীতিকা কাব্যের সুরও এখানে স্পষ্ট।

সৌন্দর্য সৃষ্টি ও রসপরিণতির বিচারে এই কবিতাগুলির মূল্য অত্যন্ত কম। কল্পনার যে বিস্তৃতি কবিচিত্তে সৌন্দর্য বিভূতি ছড়িয়ে দেয় তা দীন-বন্ধুর ছিল না। তাই তাঁর কাব্যের উপকরণগুলির মধ্যে নবত্ব কম। প্রচলিত

পথানুসৃতিতে তিনি গ্রহণ করেছিলেন প্রাচীন রীতি। অবশ্য দীনবন্ধুর বাস্তবদৃষ্টি, নাটকীয় বাচনভঙ্গী যেখানে প্রকাশিত সেই অংশগুলি নিশ্চিত সুন্দর। কতগুলি উপমার নতুন ব্যবহার বা গ্রাম-বাংলার ছোট ছোট অথচ সম্পূর্ণ ছবিও তাঁর কাব্যে ধরা পড়েছে এবং এই বাস্তব চিত্রগুলির রূপায়ণে তিনি সার্থক। তিনি কিন্তু অনুভব বা উপলব্ধির গভীরতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অভাব ছিল কল্পনাশক্তির তার শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি তাঁর কল্পনার এই অভাবকে পূর্ণ করেছেন বাস্তববোধে। ফলতঃ কবিতার সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে উত্তীর্ণ করতে পারেননি। কিন্ত বাস্তব-বোধ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র যেন তাঁর ছাত্রাবস্তার কবিতাগুলি থেকে গড়ে উঠেছে। পরবর্তী কালের বাস্তবতা ও সহানুভূতিপ্রসূত নাটকগুলির জন্যে যে বাস্তববোধ ও তথ্য নির্ভরতার প্রয়োজন হয়েছিল এখানে যেন তারই পূর্বাভাষ। যে জীবন প্রতি মুহূর্তে বিকাশমান সেই বিবর্তিত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ছবিকে রূপ দেয় নাটক। গভীর জীবনবোধ ও অসাধারণ সহানুভূতি না থাকলে জীবনের এই রূপ নাটকে ধরা পড়ে না। নীলদর্পণ, জামাই বারিক, সধবার একাদশী, নবীন তপস্বিনীর লেখক যে ভিত্তির ওপরে নির্ভর করে নাটক রচনা করেছেন তা তাঁর কবিতার ভিত্তির সঙ্গেও অভিন্ন বলে মনে হয়। দীনবন্ধুর কবিতাগুলির যেখানেই দেখা দিয়েছে নরনারী, তাদের বিভিন্ন আচার-আচরণ, লৌকিক অনুষ্ঠান বা হাস্যকর পরিস্থিতি সেখানেই দীনবন্ধু সার্থক। বস্তুতঃ কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে দীন-বন্ধু তেমন সার্থক হতে পারেননি যেমন সার্থক হয়েছেন খন্ড খন্ড জীবন, কথা, হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টিতে। কবিতার এই খন্ড খন্ড মুহূর্তগুলিই যে পরবর্তীকালের নাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এমন মনে করা অযৌক্তিক নয এবং মনে হয়, যে দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ শক্তি প্রহসন ও হাস্যরসাত্মক নাটকে আত্ম-প্রকাশ করেছে তারই সূচনা যেন এই কবিতাগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত। কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের কথোপকথনের মাধ্যমেও যেন নাটকের দ্বন্দ্ব ও সংলাপের ক্ষীণ আভাষ পাওয়া যায় তা যতই দুর্বল হোক না কেন। 'বিজয় কামিনী' পরে 'নবীন তপস্বিনী'তে রূপান্তরিত হয়েছে। নায়কের অনাগমে নায়িকার খেদ কবিতার নায়িকার ক্ষেদোক্তির সঙ্গে জামাই বারিকের 'কামিনীর' উক্তির সাদৃশ্যও লক্ষণীয়১। এমন কি কোন কোন কবিতার

১। নায়কের অনাগমে নায়িকা ক্ষেদ প্রকাশ করে বলছেনঃ কেন কাটিলাম টিপ কাচপোকা মেরে। ললাটে বিন্ধিল সেই মদনেরে হেরে॥ ইত্যাদি। এর সঙ্গে জামাই বারিক নাটকের (৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক) কামিনীর আক্ষেপ তুলনীয়। যেমন, কেন বা বাঁধিনু চুল, কেন 'মালিকা'র ফুল, ঘিরে দিনু করবীর গায় ইত্যাদি।

চরণ পরবর্তীকালে নাটকের অঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছে।২ চোকে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়ে দিই কবিতার বুনো কবি, হিংসা পরিহাস, সরলতা ইত্যাদির মুখে কবি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা নাটকীয়। উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে নাটকীয় সংলাপ যেমন প্রকাশিত তেমনি প্রকাশিত নাটকীয় দ্বন্দ্বও।

দীনবন্ধু মিত্রের ছাত্রাবস্থার কবিতাগুলির কাব্যমূল্য নেই। সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই কবিতাগুলির বিশিষ্ট কোন স্থান নেই। কিন্তু এই কবিতা গুলিতেই দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের ইঙ্গিত আছে এবং এখানেই এই কবিতা গুলিব পূর্ণতা। দীনবন্ধু নাটকের মুখবন্ধ হিসেবেই এগুলিব মর্যাদা নয় সাহিত্যের ইতিহাসেও এই কবিতাগুলি মূল্যবান।

---

২ কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ। চোকে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়ে দিই কবিতায় পড়িলে কুঁদের মুখে বাঁক নাহি রবে ছত্রটির সঙ্গে নীলদর্পণের (২য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক) বাইতের মুখের কথা তুলনীয, যথা কুঁদির মুখি বাঁক থাকবে না।

: দ্বাদশ কবিতা :

(১৮৭২)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর অন্যতম সংযোজন দ্বাদশ কবিতা। এই কাব্য গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ কাল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে। দ্বাদশ কবিতার 'সূর্য' কবিতাটি অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে মুদ্রিত হয়েছিল।১ দীনবন্ধু মিত্র এই কবিতা সঙ্কলনটি উৎসর্গ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। দীনবন্ধুর ছাত্রাবস্থার কবিতাগুলি ১৮৫১ থেকে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁর নীলদর্পণের প্রকাশ এবং সম্ভবতঃ তাঁর সমস্ত নাট্য জীবনের ব্যতিক্রমেরও। নবীন তপস্বিনী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, বিয়েপাগলা বুড়ো ও সধবার একাদশী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে, লীলাবতী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, সুরধুনী কাব্যের প্রথম ভাগ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে, জামাই বারিক ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ও কমলে কামিনী নাটক প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সুরধুনী কাব্যের দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশ।

দ্বাদশ কবিতার বারোটি কবিতার নাম যথাক্রমে শকুন্তলার তনয় দর্শনে দুষ্মন্তের মনের ভাব, চন্দ্র, সূর্য, কোকিল, প্রবাসীর বিলাপ, খণ্ডগিরি, বন্ধুবিদায়, পরিণয়, সতীত্ব, যুদ্ধ, আশা, এবং রেলের গাড়ি। দ্বাদশ কবিতা দীনবন্ধু মিত্রের পরিণত বয়সের রচনা। স্বভাবতঃই পরিণতকালের কাব্যে তাঁর কবিব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটেছে অনেক বেশি। তাঁর প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলি সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সার্থক নয় যদিও বঙ্কিমচন্দ্র ও বিশেষ করে দ্বারকানাথ অধিকারীর সঙ্গে কবিতাযুদ্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, হাস্যরস ও বাস্তববোধের পরিচয় বর্তমান। ছাত্রাবস্থায় লেখা এই কবিতাগুলিতে দীনবন্ধু মিত্রের মৌল প্রতিভাও অপ্রকাশিত নয়। দ্বাদশ কবিতার পূর্বে তাঁর সমস্ত শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিই প্রকাশিত। সেক্ষেত্রে 'দ্বাদশ কবিতা'র উপর তাঁর নাটকের প্রভাবই স্বাভাবিক। সেই প্রভাব নিশ্চিত দ্বাদশ কবিতার কোথাও কোথাও স্পষ্ট কিন্তু এই পরিচয় ছাড়াও এ গ্রন্থের অন্য বৈশিষ্ট্য আছে।

শকুন্তলার তনয়দর্শনে দুষ্মন্তের মনের ভাব, প্রবাসীর বিলাপ, বন্ধুবিদায়, পরিণয় ও আশা এই পাঁচটি কবিতা বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন হয়েও সুরের

১। ভূমিকা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত **দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী**।

ক্ষেত্রে এক। স্নেহ, প্রেম বিরহ ও দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য এই কবিতাগুলির বিষয়। কবির ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে কবিতাগুলির সুনিবিড় যোগ ছিল এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্র-র জীবনীতে লিখেছিলেন —"১৮৭১ সালে দীনবন্ধু লুসাই যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কাছাড় গমন করেন।" দীনবন্ধুর কাছাড় প্রবাসের প্রতিফলন তাঁর সর্বশেষ নাটক কমলেকামিনী নাটকে আছে। দ্বাদশ কবিতাও ভিন্নভাবে এই প্রতিফলনের ব্যতিক্রম নয়। দ্বাদশ কবিতার উপরোক্ত পাঁচটি কবিতায় প্রবাসী কবি চিত্তের বেদনা সঞ্চারিত। স্বদেশের গৃহটি তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল, আর কবি যেন অপরূপ দুর্লভ সামগ্রীর মত সেই স্মৃতিগুলিকে ভালোবেসেই ক্ষান্ত হননি, তাকে সাজিয়ে দিয়েছেন সযত্নে। এই সযত্ন চয়িত পুষ্পমালাটি তিনি অর্পণ করেছেন 'স্বদেশানুরাগী দীনপালক বিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় পরমারাধ্যা বরেষু'কে। বিদ্যাসাগরকে গ্রন্থ উৎসর্গ করার অন্তরালে সমকালীন যুগচেতনা কাজ করেছে বলে মনে হয়। কৌতূহলী হয়ে লক্ষ্য করতে হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে যে সমসাময়িক কবি সাহিত্যিকেরা শ্রদ্ধাভক্তি জানিয়েছিলেন সম্ভবতঃ মাইকেল মধুসূদন তাদের অন্যতম। বীরাঙ্গনার উৎসর্গ পত্রে কবি লিখেছেন—'বঙ্গকল চূড় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের চিরস্মরণীয় নাম এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণি রূপে স্থাপিত করিয়া কাব্যকার ইহা উক্ত মহানুভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল'। মধুসূদন তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' 'শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি' ও 'বঙ্গদেশে এক মান্যবন্ধুর উপলক্ষে কবিতায় বিদ্যাসাগরের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করেছেন। সমসাময়িক কাল ও সেই কালের মানুষকে স্পষ্টভাবে অনুভব করা প্রায়শঃই সম্পূর্ণ হয় না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যাসাগর যে বিপ্লবের কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিলেন তা ছিল মূলতঃ সামাজিক। আর ঊন বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের রেনেশাঁস যেন সমাজ ও সাহিত্যের এই উপপ্লবে বিচ্ছুরিত। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগরের সাধনায় এই বৈশিষ্ট্য সম্মানিত। নবজাগরণ-সম্ভব শ্রীমধুসূদন এই সাধকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়েছিলেন নারী আত্মার চরণোদ্দেশে। দীনবন্ধু মিত্রের ভূমিকা ভিন্ন হলেও নবজাগরণের কতগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে তিনিও মধুসূদনের মত একই সত্যে অবস্থিত।

বিদ্যাসাগরের সাধনা মূলতঃ সমাজ কেন্দ্রিক। যদিও সাহিত্য সৃষ্টির দুর্লভ মুহূর্তে তাঁর অনুবাদ সাহিত্য, প্রভাবতী সম্ভাষণ, স্বরচিত জীবন চরিত ও সমাজ সংক্রান্ত পুস্তিকাগুলিতে ধরা দিয়েছে। কাব্যে এই নব-

জাগরণ মধুসূদনকে কেন্দ্র করে মুখর আর বঙ্কিমচন্দ্রের কথা সাহিত্যে এই নবজাগরণের তীব্র মুহূর্তগুলি জীবনের রহস্য সন্ধানে মুক্তি খুঁজেছে। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলিত সামাজিক বিপ্লবের সাময়িক বাস্তব চিত্রগুলি ধরা দিয়েছে দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে। আসলে নবজাগরণদীপ্ত চেতনা তখন বিভিন্ন দিকে বিচ্ছুরিত হয়েছিল। পুরাণ ইতিহাস প্রীতির সঙ্গে স্বদেশ, সমাজ ও গৃহজীবনের প্রতিও সেই চেতনার প্রকাশ। তারই প্রতিফলন ঘটেছে কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে। দীনবন্ধু মিত্রের ছাত্রাবস্থায় গদ্য পদ্যে লিখিত 'বিধবার বিবাহ' রচনায় ঊনবিংশ শতকের এক তীব্র সামাজিক বেদনা দেখা গেছে। কবি চতুর্দশ বর্ষীয়া বিধবা বালিকার মানসিক দুঃখ ও সামাজিক বিধানের যে ছবি এঁকেছেন তা ছাত্র দীনবন্ধুর পক্ষে গৌরবের। কবির সহানুভূতিতে স্পষ্ট হয়েছে বালিকা বিধবাদের বেদনাময় জীবন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তিকার ভাষা ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে দীনবন্ধুর 'বিধবার বিবাহ' রচনাটির মিল আছে। দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র নায়ক সমসাময়িক কুলীনদের শিষ্ট প্রতিনিধি মাত্র। বিদ্যাসাগর তাঁর সমাজ সংক্রান্ত লেখায় বিভিন্ন কুলীনদের বাসস্থান নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হননি তাদের বহু বিবাহের সংখ্যাকে তুলে ধরেছেন। নারীর স্বাতন্ত্র্য, ধর্ম ও স্বাধীনতার জন্যে বিদ্যাসাগরের জীবন সংগ্রামের গভীরে ছিল তীব্র সহানুভূতি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা। তার প্রকাশ বিদ্যাসাগরের জীবনে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

নবজাগরণের আবহাওয়ায় যে প্রতিভাধরদের নিঃশ্বাস নিতে হয়েছিল তাঁরা এড়াতে পারেননি যুগধর্মকে বরং প্রকৃতি অনুযায়ী বেছে নিয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রকে। স্বদেশ, সমাজ, স্বাধীনতা, হিন্দু ধর্মের আদর্শ, ইতিহাস, পুরাণ স্নেহ প্রীতি নতুন হয়ে উঠেছে—কোথাও অবিকৃতরূপেই পেয়েছে প্রতিষ্ঠা। আসলে এদের সকলের ভিত্তি এক, শুধু চিন্তা ধ্যান ধারণা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়ার বিদ্যুত-দীপ্তি এদের সকলকে চালিত করেছে ভিন্ন পথে। দীনবন্ধু মিত্রের লেখায় গ্রাম-বাংলাদেশের শোষণক্লিষ্ট চাষী, মজুর বোহারা নাগরিক জীবনের দুষ্ট ব্রণর মত পদীময়রানী, রক্তমাংসে জীবন্ত ক্ষেত্রমণি ধরা দিয়েছে, বিধৃত হয়েছে মদ্যপ আর লম্পট, ইংরেজী শিক্ষায় উদ্‌ভ্রান্ত অথচ প্রচুর সম্ভাবনাময় নিমেদত্ত। ইতিহাস পুরাণ দেখা দিয়েছে সুরধুনী কাব্যকে ঘিরে, ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় যে স্বদেশ, দেশের কুকুর, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের প্রকাশ তাঁরই ভাবশিষ্য দীনবন্ধু স্বদেশ ও সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন সমসাময়িক ঘটনার বাস্তব অভিজ্ঞতায়। তার দেশকে ভালো না বাসলে দীনবন্ধুর পক্ষে সম্ভব হত না দেশের মানুষগুলিকে এমন সজীব করে সাজিয়ে দেওয়া।

এই স্বদেশ ও সমাজ প্রীতি থেকেই দীনবন্ধু বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেছেন তাঁর দ্বাদশ কবিতা।

'দ্বাদশ কবিতার' মূল সুরে একটি বিশেষ বেদনাবোধেব প্রকাশ ঘটেছে। 'প্রবাসীর বিলাপ' ও 'বন্ধুবিদায়' কবিতায় পরিচিত সমাজ, গৃহ, প্রিয়-পরিজন বিচ্যুত একটি বাঙালী মানুষের অনুভব কতগুলি সুন্দর ছবির মধ্যে বিধৃত হয়েছে। কবি বেদনাতুর চিত্তে স্মরণ করেছেন শুভ বঙ্গদেশকে প্রবাসীর বিলাপ কবিতায়—

কোথায় জনমভূমি শুভ বংগদেশ—
তব ক্ষেত্রে শস্যরূপে বিরাজে ধনেশ
বাহিনী তোমার অংগে পবিত্র জাহ্নবী

.. ..

শৈশবে পিতার পাতে বসিয়ে পুলকে—
খাইতাম সুখে অন্ন এলোমেলো বকে
বাসনা পিতার পাতে আজো বসে খাই
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই.

. .. ...

পরম আরাধ্য দেবী জননী কোথায়—
বিপদ, ব্যসন, ব্যথা যে নামে পলায়
ভিক্ষা করি খাব দেশে যদি মাতা পাই
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

... .

না হেরে সোদব মুখ বিদরে অন্তর
কতদিন রব পার হয়ে দেশান্তর

... ...

সমাদরে সহোদরে ভাই ফোঁটা দান
বসন চন্দন ধান গুয়া গোটা পান
জন্মে জন্মে হই যেন ভগিনীর ভাই
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

... ...

নীরস হৃদয় মম প্রণয় বিহীন,
কেমনে কামিনী ভুলে আছি এত দিন।

ভুলি নাই বামাঙ্গিনী পবিত্র লোচনে
দিবা নিশি হেরি মুখ মনের নয়নে
... ...
কোথায় হৃদয় নিধি প্রণয় নিচয়,
কবে তোমা সবে হেরে জুড়াব হৃদয়।
কেহ করতালি দেবে কেহবা নাচিবে,
আধ বোলে বাবা বোলে কেহ বা হাসিবে।
মায়ার মৃণাল সম মেয়েটি কোথায়,
মরি যে জননী! কোলে না লয়ে তোমায়
চিত্রিত পুতুল পেলে সুখী শিশুকুল,
আমি শিশু তুমি মম খেলার পুতুল,
কবে নব তামরস দাম রসনায়
লেহন করিবে নাসা শৈশব লীলায়।
বাসনা যমুনা জলে এদেহ ভাসাই
বিদেশে বিপদে মরি দেশে চলে যাই।

বন্ধুবিদায়' কবিতাতেও এই প্রকাশ। বিদায়দৃশ্যকে কবি চিত্তবিনোদিনী শোভা দর্শন বলে গ্রহণ করেছেন,—বিমল তটিনীতটে লেখা যেন স্বচ্ছ পটে,

বন্ধুর নিকট বন্ধু চাহিছে বিদায়।
দাঁড়াইয়ে দুইজনে করে দিয়ে কর,
অধীর অন্তর দুখে, স্থির কলেবর,
নাহি রব সুবদনে, দিবানিশি হাসি সনে
চলিত যাহাতে কথা শোভিয়ে অধর।
শৈশবে সজাতি তরু থাকি গায় গায়,
কলেবরে কলেবরে কালেতে মিশায়,
সেইরূপ বন্ধু যুগ হয় দরশন,
হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ অভেদ মিলন,
স্নেহেতে বান্ধবে পরে করি আলিঙ্গন,
তরনীতে উঠে বন্ধু মুছিয়া নয়ন।
কিনারায় থাকি বন্ধু তরি পানে চায়,
দাঁড়ায়ে অপরবন্ধু চলিত নৌকায়:
কমিতে কমিতে তরি পানকৌড়ি প্রায়
ভাসে নদী অঙ্গে দেখা যায় কিনা যায়।

ত্যজিয়ে তটিনী করে ভবনে গমন,
ভাসায়ে শ্মশানে যেন সহোদর ধন:
যায় যায় ফিরে চায়, এই বুঝি দেখা যায়
যে তাঁর প্রাণের বন্ধু করিছে বহন।

'শকুন্তলার তনয় দর্শনে দুষ্মন্তের মনের ভাব',১ কবিতায় একই বেদনার প্রকাশ। এই কবিতায় রাজা তাঁর অচেনা পুত্রের সঙ্গে মিলিত হলেও এই মিলনের মধ্যে বিষাদ দেখা দিয়েছে। কেননা সেই সুন্দর 'নবনীত অঙ্গ শিশু'র পিতৃ-পরিচয় নৃপতির কাছে অজ্ঞাত। কবি 'প্রবাসীর বিলাপে' গৃহ-জীবনের যে উজ্জ্বল মুহূর্তগুলিকে স্মরণ করেছেন তা পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র কন্যা ও বন্ধুত্বের স্নেহ ভালোবাসায় রসসিক্ত। নিতান্ত শিশুকালে পিতার অঙ্কে উপবিষ্ট থেকে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে অন্ন গ্রহণ করার স্মৃতি স্মরণ করেছেন কবি, স্মরণ করেছেন পরম আরাধ্যা জননীকে। পূর্বের

১। এই কবিতাটির ভাবনা ও ভাষার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনূদিত শকুন্তলার একই বর্ণনীয় বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষণীয়, যেমন,

'শকুন্তলাব তনয় দর্শনে দুষ্মন্তের মনের ভাব' কবিতার—

'এ শিশু হেরিয়ে বুক কেন ফেটে যায় রে,
কেন বা উদয় বারি নয়ন কোনায় রে,
পরের সন্তানে মন, কেন হেন নিমগন
অবিরাম দরশন করিবারে চায় রে,
বাসনা হৃদয়ে রাখি সোনার বাছায় রে।
ভাগ্যবান বলে মানি শিশুর পিতায় রে
এমন সোনাব চাঁদ জীবন জুড়ায় রে,
হাসি হাসি বসি কোলে, যবে আধো আধো বলে,
বাবা বাবা বলে বাছা অমৃত ছড়ায় রে,
কি আনন্দে নাচে প্রাণ পিতাই তা জানে রে,
স্বর্গের বিমল সুখ মনে মনে মানে রে।

সঙ্গে তুলনীয়, "প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া রাজার অন্তকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত, আমার মন এমন উৎসুক হইতেছে। পরের পুত্র দেখিলে, মনে এত স্নেহোদয় হয়, আমি পূর্বে জানিতাম না। আহা! যাহার এই পুত্র, সে ইহাদের ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মুখচুম্বন করে, হাস্য করিলে, যখন ইহার মুখ মধ্যে, অর্ধনির্গত দন্তগুলি অবলোকন করে, যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান ব্যক্তি কি অনির্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শকুন্তলা, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ।

উদ্ধৃতি থেকে একটি বাঙ্গালী মনের পরিচয় পাঠক চিত্তকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করে। এ প্রসঙ্গে মধুসূদনের 'চতুর্দশ পদী কবিতাবলী'র কথা স্মরণযোগ্য। বিদেশে লেখা এই কবিতাগুলিতে মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের কতগুলি দুর্লভ মুহূর্ত যেমন বিধৃত হয়েছে তেমনি ধরা দিয়েছে তাঁর আত্মনিষ্ঠ মন। তারই প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশের দেবমন্দির, জয়দেব, কৃত্তিবাস, বিদ্যাসাগর, দোয়েল এবং অন্যান্য আরো অনেক ছবিতে যা একান্তভাবে বাংলা দেশের। প্রবাসের মাটিতে তিনি তৃপ্তি পাননি বলেই যেন ঐ কবিতাগুলির কোথাও কোথাও গভীর বেদনায় প্রকাশ। বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী মানুষের প্রতি তাঁর গভীর অনুভবদীপ্ত শ্রদ্ধা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে প্রকাশিত। মধুসূদনের সঙ্গে কাব্যধর্মে ভিন্ন হয়েও দীনবন্ধুর 'দ্বাদশ কবিতা'র কতগুলি কবিতায় একই প্রবাসী সত্তার যন্ত্রনা কাজ করেছে। 'বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই'—এ আকাঙ্ক্ষা যখন সেই মুহূর্তেই তৃপ্ত হতে পারে না বাস্তবের দিক থেকে তখন তা অন্যভাবে সান্ত্বনা দেয়। চতুর্দশপদী কবিতাবলী এবং দ্বাদশ কবিতা তারই প্রতিফলন। তাই বাংলাদেশের গৃহজীবনের রূপ এখানে এত স্পষ্ট। গভীর বাস্তব বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনুভব। যে বাংলা দেশ ও তার মানুষ কবিপ্রাণের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত তাকেই যেন কাব্যের প্রতিমূর্তিতে নতুন করে সাজিয়ে দিলেন কবি দ্বাদশ কবিতায়। মধুসূদনের 'শ্যামা জন্মদে' দীনবন্ধুর কাব্যে পবিত্র জাহ্নবীকে অঙ্গে ধারণ করে 'শুভলক্ষ্মী মূর্তি'তে প্রতিভাত হয়েছে। স্মরণ করেছেন কবি সেই শুভ বঙ্গদেশকে, বাঙ্গালী জীবনের সামাজিক অনুষ্ঠানের মাঙ্গল্যের চিহ্নকে। 'বসন চন্দন ধান গুয়া গোটা পান', এ কথায় যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি আর কি অসীম অনুরাগ সামাজিক ব্রতর প্রতি, 'জন্মে জন্মে হই যেন ভগিনীর ভাই'—এ কথায় ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার গভীর সামাজিক অনুভব যেন মুহূর্তে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আঘাত করে। আবার যেখানে কবি, 'মায়ার মৃণাল মম মেয়েটি কোথায়', যখন একথা বলেন, তখন যেন বিচ্ছেদক্লান্ত পিতৃহৃদয়ের অবসাদ গভীর হয়ে বাজে। আর 'লেহন করিবে নাসা শৈশব লীলায়' কন্যার এই আচরণের কথা স্মরণ করে পিতার শূন্যতার বোধ যেন আরো দীপ্ত হয়ে ওঠে। বন্ধুবিদায় ও পরিণয় এই দুটি কবিতাতেও কবি নিবিড় সখ্যতার ও পরিণীত জীবনের মাধুর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন যথাক্রমে। বন্ধুকে বিদায় দেওয়ার মধ্যে বিচ্ছেদের যে হাহাকার তা কবির কাব্যে তীব্র রূপ নিয়েছে কেননা, 'ভাসায়ে শ্মশানে যেন সহোদর ধন' ফিরে চলেছে এক রিক্ত হৃদয়। 'পরিণয়' কবিতায় অবশ্য গৃহসুখের ছবি উজ্জ্বল; দাম্পত্য জীবন পূর্ণতা পেয়েছে অপত্য স্নেহের মধ্যে।

চন্দ্র, সূর্য ও রেলের গাড়ি, এই তিনটি কবিতার স্বাদ একটু ভিন্নতর। সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক না হলেও এদের মধ্যে বিজ্ঞানের ছাপ আছে, সেই সঙ্গে কবির রসিক চিত্ত ও বাস্তবতাও প্রকাশিত হয়েছে। কুমুদিনীর সঙ্গে চাঁদের আত্মীয়তার বর্ণনাটি১ যেমন উপভোগ্য তেমনি সজীব যমরাজের বর্ণনা। লক্ষ্য করতে হয় সূর্য কবিতায় কবি স্মরণ করেছেন পুরাণকে। এই পুরাণ প্রীতির সঙ্গে ইতিহাস প্রীতি যুক্ত হয়েছে 'যুদ্ধ' কবিতায়২। সুরধুনী কাব্যেও কবির এই পুরাণ এবং ইতিহাস প্রীতির প্রকাশ ঘটেছে। 'যুদ্ধ' কবিতার অন্তরালে লুসাই যুদ্ধের আবহাওয়া কাজ করেছে এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। যদিও কবি প্রকৃত যুদ্ধ বর্ণনার চেয়ে পুরাণকথা ও ইতিহাস

১। তুমি নাকি বিয়ে তারে করিয়াছ শশি।
তবে তো শ্বশুর বাড়ী তোমার সরসী॥

২। প্রশস্ত গভীর তব উদর ভীষণ—
নীরশূন্য নীরনিধি দেখিতে যেমন
ভীমগদা ভিন্দিপাল শূল শেল করবাল,
খাঁড়া ঢাল টাঙ্গি যেন কালের দশন,
কিরিচ ভোজালে, তনু, শরাশন বান
যমের নিশ্বাস নিন্দি বন্দুক কামান।
কেটে করি খান খান, রুধিরে করিব স্নান
রাখিব মানীর মান নিজ প্রাণ দিয়ে
বাঁচিয়ে কি ফল যদি স্বাধীনতা যায়
পড়িবে কি সিংহরাজ শৃগালের পায়,
আর্তনাদ করি এক বীর মহাজন
নিপতিত রণস্থলে হয়ে অচেতন
কোথা পুত্র কোথা দারা, তারা যে নয়ন তারা
জনমের মত হারা আত্মীয় স্বজন,
কি বলিল শেষে বীর ভাসি আঁখি জলে
কোথায় রহিলে প্রিয়ে প্রণয় কমলে।

ভিখারী দ্বিতয়ে তুমি উপলক্ষ করি
ছারখারে দিলে লঙ্কা সুবর্ণনগরী
অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকে অচেতন
শতপুত্র হত রণে থাকে কি জীবন।

মান সিংহ ভগিনীরে সজোরে ধরিয়ে
নীচকুল যবনের সনে দিলে বিয়ে।
রাজার পবিত্র শির করিয়ে ছেদন
কোরমওয়েলে দিলে রাজ সিংহাসন।
ইত্যাদি

এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যকানন', অংশের 'যুদ্ধসজ্জা' ও 'যুদ্ধ' কবিতা দুটি স্মরণীয়। দ্রষ্টব্য : **ঈশ্বরচন্দ্র গ্রন্থাবলী** (বসুমতী সংস্করণ ১৩২০ বঙ্গাব্দ) দ্বিতীয় ভাগ ১৯১৩।

প্রসিদ্ধ মানুষের যুদ্ধ কথা স্মরণ করেছেন বেশি। পুরাণ ও ইতিহাসের বিভিন্ন যুদ্ধ প্রসঙ্গগুলি স্মরণ করার পেছনে কবির একটি বিশেষ মনোভাব কাজ করেছে বলে মনে করি। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে যে স্বদেশানুরাগ যা মধুসূদনে আরো দীপ্ত, তা-ই যেন দ্বাদশ কবিতার 'যুদ্ধ' কবিতায় ক্ষীণসুরে প্রকাশিত। নবজাগরণদীপ্ত বাঙালী মানুষ গভীরভাবে ভালোবেসেছিল নিজের দেশকে, দীনবন্ধুর কবিতাতেও তার প্রভাব পড়েছে। 'কোকিল' এবং 'সতীত্ব' কবিতা দুটি ভিন্ন জাতের। 'সতীত্ব' কবিতায় ঊনিশ শতকের প্রচলিত নীতিবোধের প্রকাশ ঘটেছে। সতীর অন্তর্শক্তি তুলে ধরেছেন কবি। 'কোকিল' কবিতায় বসন্ত পাখীর কুহুরবের মধ্যে বিরহিণীর মূর্তিকে অনুভব করেছেন কবি।

দ্বাদশ কবিতার বিষয়গত পার্থক্য লক্ষণীয়। আশা কবিতাটি অন্য কবিতাগুলির থেকে দীর্ঘ, তার কারণ আশাকে কেন্দ্র করে কাহিনীজাল বিস্তারের চেষ্টা। মর্ত্যজগতের দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে আশার এই নিরন্তর সান্ত্বনাদানের চেষ্টা ও তাকে পীতপক্ষী ও পরে ভাবিকা ভরসা দেবীর সঙ্গে একাত্ম করে কবি কতগুলি বাস্তব চিত্র এঁকেছেন। দ্বাদশ কবিতার এই কবিতাগুলির উপর দীনবন্ধুর কোন কোন নাটকেরও প্রভাব পড়েছে১। সমসাময়িক লেখকদের প্রভাবও কোন কোন রচনায় অপ্রত্যক্ষভাবে দেখা দিয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'যুদ্ধ' কবিতার পাশে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর যুদ্ধ-বিষয়ক দুটি কবিতা বা মধুসূদনের আত্মবিলাপ কবিতা ও নবীনচন্দ্রের

১। 'আশা' কবিতার--

"মা মরি আকাট ওরে একি অবিচার!
অনাহারে মরে যাব সহ পরিবার,
রাতি পোহাইলে লাগে চাল চার পালি
কেমনে কোথায় পাব খাব ফিরে বালি?
কি দিয়ে সুধিব আর মহাজন ধার
ভিটে মাটি হবে নাশ নাহিক নিস্তার"।

এই অংশের সঙ্গে নীলদর্পণ নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের রাই-চরণের কথা তুলনীয়। যথা, রাই, 'দাদা আমিন শালা সাঁপোলতলার জমিতি দাগ মেরেছে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে। আহা জমি তো না, হ্যান সোনার চাঁপা। এক কোণ কেটে মহাজন কাত কত্তাম। খাব কি, ছ্যালে পিলে খাবে কি, এতডা পরিবার না খাতি পেয়ে মারা যাবে, ওমা! রাত পোয়ালি যে দুকাটা চালের খরচ, না খাতি পেযে মরবো, আরে পোড়া কপাল, আরে পোড়া কপাল, গোড়ার নীলি কল্লে কি?'

পলাশীর যুদ্ধ কাব্যের অংশবিশেষ দীনবন্ধুর 'আশা' কবিতার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব হল মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মতই দ্বাদশ কবিতার অনেকগুলি কবিতায় আত্ম-নিষ্ঠ মনের পরিচয় প্রতিফলিত। দীনবন্ধুর দৃষ্টি বস্তুমুখী হওয়া সত্ত্বেও দ্বাদশ কবিতার 'শকুন্তলার তনয়দর্শনে দুষ্মন্তের মনেব ভাব,' 'প্রবাসীর বিলাপ', 'বন্ধু বিদায়', 'পরিণয়' প্রভৃতি কবিতায় তার সংবেদনশীল, স্পর্শ-কাতর ব্যক্তি-মনের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। দীনবন্ধুর সমকালে বিহারীলালের (১৮৩৫-১৮৯৪) কাব্যে যে সহজ সরল ভাষার আবেগপ্রাধান্য ও নিজস্বতা তা দ্বাদশ কবিতাতেও আভাসিত। দীনবন্ধুর 'বন্ধু বিদায়' কবিতা নিশ্চিত বিহারীলালের বন্ধু বিয়োগ কাব্যের সমার্থক নয় অথবা In Memoriam কাব্যের সঙ্গেও তার যোগ নেই, কিন্তু বন্ধু বিদায়কে লক্ষ্য করে কবিপ্রাণের সকাতর বেদনার যে প্রকাশ তার অভিনবত্ব আছে। বস্তুনিষ্ঠার মধ্যে কল্পনার বিকাশ সাধারণতঃ সংকীর্ণ হয় এবং তা হওয়া সত্ত্বেও প্রবাসীর বিলাপ, আশা, খণ্ডগিরি কবিতার কোথাও কোথাও আত্মনিষ্ঠ গীতিকবির যন্ত্রণা মূর্ত হয়েছে।

'দ্বাদশ কবিতা'র শব্দচয়নে অভিনবত্ব নেই। লক্ষ্য কর'তে হয় দীনবন্ধুর ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত। মধুসূদন বাংলা কাব্যে যে বিপ্লব এনে-ছিলেন তা নতুন চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গীর নতুনত্ব, অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে কেন্দ্র করেই সম্ভব হয়েছিল। কৌতূহলী হয়ে লক্ষ্য করতে হয় মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদ বধ' এবং 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে তৎসম শব্দের পাশে লৌকিক ভাষাও স্থান পেয়েছে। সুকবির পক্ষে এদের মিলন ঘটানো সম্ভব। দীনবন্ধুর দ্বাদশ কবিতাতে অপ্রচলিত তৎসম শব্দ ব্যবহাব করার দুটি উদ্দেশ্য, সংস্কৃত শব্দের ঝংকার লালিত্য ও গাম্ভীর্য কাব্যেব পরিচ্ছদকে সুন্দর করবে এই মনোভাব তাঁর যেমন ছিল তেমনি ছিল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে কাব্যদেহের নবত্ব আনা। বালেন্দু, তামরস, ত্বিষাম্পতি, মার্তণ্ড, পুন্নাগ, শোভাঞ্জন, যাদঃপতি ইত্যাদি শব্দগুলি কবি ব্যবহার করেছেন সযত্নে। নাট্যপ্রতিভার অন্তরালে তাঁর কাব্যপ্রতিভা ঢাকা পড়লেও সংবেদনশীল পাঠক তাঁব কাব্যের এই বৈশিষ্ট্য অনুভব করে।

আবার বাস্তব অভিজ্ঞতা কবির জীবনে এমন গভীর হয়েছিল যে তাঁর নাটকেব পাত্র-পাত্রীদের সংলাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে নিতান্ত মুখের ভাষা। দ্বাদশ কবিতার কতগুলি কবিতায় কথ্য ও লৌকিক শব্দের প্রকাশ ঘটেছে যার ভিত্তি আসলে দীনবন্ধুর নাট্য-সাহিত্যের ভিত্তির সঙ্গে অভিন্ন। গন্নাকাটা, উড়ে, কেঁয়ে, ক্যারা, নতানো, বারমেসে, তেঁতুল, পানকৌড়ি ইত্যাদি ভাষা ব্যবহারের

সার্থকতা আছে। ঈশ্বর গুপ্তও তাঁর কাব্যে সংস্কৃত এবং লৌকিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। লক্ষ্য করতে হয় সমকালীন ঘটনাকে তিনি উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন কাব্যে। লৌকিক ও কথ্য ভাষার ব্যবহার তাঁর কাব্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রয়োজন নিঃসন্দেহে সিদ্ধ করেছে। কিন্তু যেখানেই তিনি কাব্য-সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন সেখানেই দেখা গেছে সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য। মধুসূদনের ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য, অনেক সময় অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ কবিত্বের সহায়তা করেছে কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তে তা হয়নি বরং সেখানে তিনি ব্যর্থ। দীনবন্ধু মিত্রের প্রকৃত পরিচয় নিশ্চিত তাঁর কাব্যে নেই, তা নাটকে। আর দীনবন্ধুর এই কবিতাগুলি কোথাও তাঁর নাট্য-সাহিত্যের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছে, কোথাও তা সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন মনকে তুলে ধরেছে। দীনবন্ধুর কাব্যে তাই প্রকৃত কাব্যের রূপকে সন্ধান করা যায় না। অথচ তাঁর কবিতাগুলিতে একটি সংবেদনশীল মনও অপ্রকাশিত হয়। শব্দ ব্যবহারে তিনি মধুসূদনের মত উৎকর্ষ দেখান নি কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের মত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে তিনি ব্যর্থ নন—বরং হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের মতই নিজের ক্ষেত্রে কুশলী।

স্বাদেশ কবিতার অনুপ্রাসগুলির বৈশিষ্ট্য আছে। কয়েকটির উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে—

১ আনন্দ আকর আশা অবারিত গতি
২ আলো দিতে অবনীতে অনাদি আজ্ঞায়
৩ নবনীত বিনিন্দিত কমনীয় কায়রে
৪ নিরানন্দে নৈশনীরে নলিনী সুন্দরী
৫ বিষাদে বিষণ্ণমুখ বিহঙ্গমকুল
৬ বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই
৭ খেদের বারতা ক্ষমা ক্ষীরোদ তলায় রে
৮ গগনে অগন্য তারা কে তারা কে জানে
৯ বিজনে কূজনে পূজা করিতেছে তাঁর
১০ তাই তাই তমালিনী তাই তাই তাই
১১ কোথা সে বিলের কূলে বিটপী বিশাল
১২ সমীরণ সহকারে সন্তরি সাগর
১৩ শোণিতে সাঁতার দিতে সংহার সহায়
১৪ নিবারি নয়ন বারি তরি আরোহন
১৫ পরম পুলকে যাবে পারাবার পারে
১৬ প্রলাপে প্রাণের পতি প্রমদার পানি

১৭ ভাবিকা ভরসাদেবী ভব ভয়হরা
১৮ গড় গড় তাড়া তাড়ি চলিছে রেলের গাড়ি

ঈশ্বর গুপ্ত অনুপ্রাস ব্যবহারে অর্থের চেয়ে শব্দগত ধ্বনিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অনুপ্রাস যখন অর্থকে প্রকাশ করেও তার ধ্বনিগত সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠা পায় তা তখন নিশ্চিত তার বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে কাব্যত্বকেই তুলে ধরে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যে এই অনুপ্রাস অলঙ্কার কদাচিৎ প্রকাশিত। তাঁর কবিতায় অনুপ্রাস অধিকাংশ সময়েই শব্দের ধ্বনিকেই প্রাধান্য দিয়েছে এবং একই ধ্বনির চরণ থেকে চরণান্তরে প্রবাহিত হয়ে ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করেছে। কোথাও কোথাও অবশ্য এই ধ্বনি পাঠকের বিরক্তি উৎপাদনও করে। মধুসূদনের অনুপ্রাস অলঙ্কারগুলির অধিকাংশই সুমিত ও সুন্দর। শব্দ-সচেতন কবির পক্ষেই এই পরিচ্ছন্নতা আসা স্বাভাবিক। 'সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে' বা 'আত্মবিস্মৃতিতে হায় অকস্মাৎ সতী মুছিলা সিন্দুর বিন্দু সুন্দর ললাটে' এ ধরনের অনুপ্রাস রচনা নিঃসন্দেহে শক্তির পরিচায়ক। দীনবন্ধু মিত্রও তাঁর দ্বাদশ কবিতায়, কতগুলি সুন্দর অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন। 'বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই' বা 'বিজনে কূজনে পূজা করিতেছে কার' কিংবা 'বিষাদে বিষণ্ণ মুখ বিহঙ্গমকুল', অথবা 'তাই তাই তমালিনী তাই তাই তাই'—ইত্যাদি অনুপ্রাস অলঙ্কারগুলি নিশ্চিত সুন্দর। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিক্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তাঁর কাব্যদেহে বর্তমান নেই অথবা মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভাও তাঁর নয়—তবু নাটক রচনায় যে মন তাঁর কাজ করেছে তারই এক বিচিত্র দিক কাব্যে প্রকাশিত। প্রায়-অপঠিত দ্বাদশ কবিতা ও সুরধুনী কাব্যে কখনো কখনো কবিতার বিদ্যুৎস্ফূর্তি দেখা গেছে। সেই সৌন্দর্য ধরা দিয়েছে রূপক উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও অনুপ্রাস সৃষ্টিতে। বন্ধু বিদায় কবিতার—

"কমিতে কমিতে তরি পানকৌড়ি প্রায়
ভাসে নদী অঙ্গে দেখা যায় কিনা যায়"

এই ছবিটি শুধু দীনবন্ধুকাব্যেরই নয় সমগ্র বাংলা কাব্যের সম্পদ। লক্ষ্য করতে হয় কবি দ্বাদশ কবিতার কতগুলি কবিতায় স্তবকবন্ধের পরীক্ষাও করেছেন।

পরিণত কালের কাব্যে স্বভাবতঃই পাঠকের আকাঙ্ক্ষা বেশি এবং সেই বোধ থেকেই দ্বাদশ কবিতার পাঠক এই কাব্যের সৌন্দর্য সন্ধান করতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে দীনবন্ধুর মৌল প্রতিভা কাজ করেছে নাটকীয় শিল্প কর্মে। সেখানেই তার শ্রেষ্ঠ শক্তির প্রকাশ। নাটকে দীনবন্ধুর যে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির প্রকাশ তারই সূক্ষ্ম রূপ কাব্যে। এখানে সহানুভূতির

ক্ষেত্র অধিকাংশস্থলেই মানবিক বৃত্তি, স্নেহ, প্রেম বন্ধুত্ব। কখনো কখনো তা আত্মনিষ্ঠ গীতি কবির মত ব্যক্তি হৃদয়কে তুলে ধরেছে। নাটকের ঘাত প্রতিঘাত, ঘটনা সংস্থান ও সর্বোপরি চরিত্রের দ্বন্দ্ব অন্তর্দ্বন্দ্ব নিশ্চিত খণ্ড কবিতায় প্রতিফলিত হতে পারে না অথচ কবির নাট্য ধর্মের সমান্তরাল পথে যে কাব্য জীবন প্রতিভাসিত তাকে শুধু মাত্র বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা বলেও পরিত্যাগ করা যায় না। বিশেষ করে দ্বাদশ কবিতার বন্ধু বিদায় ও প্রবাসীর বিলাপ কবিতায় এমন এক কবিকে পাওয়া যায় যিনি মনোধর্মে বিহারীলালের সগোত্র। কবি এই দুটি কবিতায় যে বিষাদ ও বিষণ্ণতার ছবি এঁকেছেন, যে অনুভবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন গৃহজীবনের সুনিবিড় মাধুর্য ও বন্ধু-প্রীতিকে এবং রক্তমাংসরে আর্তবেদনাকে তুলে ধরতে গিয়ে যে ভাষার পরিচ্ছেদ কাব্য দেহে পরিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে স্বকীয়, নতুন।

'দ্বাদশ কবিতা' দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ শিল্প নয়। তবে তাঁর কাব্য সৃষ্টির স্বল্প পরিসরে দ্বাদশ কবিতার স্থান নিঃসন্দেহে বৃহৎ। ঊনিশ শতকের নবজাগ্রত বোধ সেই সময়ের কবি, সাহিত্যিকদের প্রবুদ্ধ করেছিল বিভিন্ন ভাবে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় রূপ শান্ত হল মধুসূদনের মহাকাব্যে। নারী সত্তার নতুন দীপ্তি সীতা, সরমা, শ্রীরাধিকা' এবং বীরাঙ্গনায় প্রকাশ পেল। বিদ্যাসাগরের সমাজ যেন কাব্যের নন্দনকাননে প্রতিষ্ঠিত হল। কথা সাহিত্যে সামাজিক আন্দোলনের রূপ আরো তীব্র, আর দীনবন্ধুর স্মিত হাসিতে সমাজের ক্ষত স্থানগুলি ধৃত হল নাটকে। ব্যঙ্গ আছে সেখানে কিন্তু জ্বালা নেই। দ্বাদশ কবিতায় অবশ্য দীনবন্ধুর এই হাস্যরসের পরিচয় নেই। যে মন অনুভব করেছে গভীর ভাবে স্নেহ প্রীতির মর্যাদাকে, বরন করেছে বাঙালী গৃহজীবনের সামাজিক ব্রতর মঙ্গল চিহ্নকে, সেই গৃহ স্বজন পরিত্যক্ত প্রবাসী মানুষের যন্ত্রণা মধুসূদনের মতই নিজেকে তুলে ধরতে প্রয়াসী। দ্বাদশ কবিতার তাই অন্য মূল্য না থাকলেও স্বদেশ, সমাজ ও গৃহজীবনকে কাব্যে প্রতিষ্ঠা দেবার মূল্য আছে। অবহেলিত কাব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি ও শ্রুতি সচেতন নয় বলেই তার যথার্থ মূল্য দিতে আমাদের সঙ্কোচ। কিন্তু যদি একবার কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর কাব্য পাঠে প্রবৃত্ত হই তবে সম্ভবতঃ সেই ধারণা বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। দীনবন্ধুর দ্বাদশ কবিতায় মূল সুরে এমন একটি মহৎ বেদনার প্রকাশ আছে যে তাঁর কাব্য, রসিক চিত্তকে আনন্দিত করে। আর সেই অনুভবের জন্যেই কবির কাব্য হয়ে ওঠে এক অভিনব বস্তু। দীনবন্ধু দ্বাদশ কবিতা যে এই নবত্বের থেকে দূরে নয় তা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের অনুভবগম্য।

॥ সুরধুনী কাব্য ॥
১৮৭১—১৮৭৬

সুরধুনীকাব্যের দুটি ভাগ। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ যথাক্রমে ১৮৭১ ও ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাব্য দীনবন্ধু মিত্রের দীর্ঘতম রচনা। বঙ্কিমচন্দ্র সুরধুনীকাব্য সম্পর্কে লিখেছিলেন, "সুরধুনী কাব্য অনেক দিন পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহার কিয়দংশ বিয়ে পাগলা বুড়োরও পূর্বে লিখিত হইয়াছিল"।১ বিয়ে পাগলা বুড়োর প্রকাশ কাল ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিকে গ্রহণ করলে দীনবন্ধু জীবনে এই কাব্য রচনার ব্যাপ্তি প্রায় আট বছর হয়, কেননা দীনবন্ধুর মৃত্যু হয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর। বাংলা কাব্যের ও সাহিত্যের ইতিহাসে সুরধুনী কাব্যটি নানাদিক থেকে অভিনব। দুটি ভাগে বিভক্ত কাব্যটিতে দশটি সর্গ আছে। গঙ্গাকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী, উপকাহিনী, পুরাণ ও ইতিহাস, বর্ণনা এ কাব্যে স্থান পেয়েছে তা বিচিত্র ও জটিল। একটি নদীকে মৌল শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে কাহিনী সৃষ্টির এই প্রচেষ্টা দীনবন্ধু মিত্রের শক্তির পরিচায়ক এবং সেই দিক থেকে সুরধুনী কাব্য বাংলা সাহিত্যে একক।

ঊনিশ শতকে বাংলা দেশের নবজাগরণ কাব্যে, সাহিত্যে বিচিত্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। সমাজ ও ধর্ম সংক্রান্ত নতুন মনোভাবের প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল মূলতঃ ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ফলে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরের সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের পাশে ডিরোজিওর শিষ্য সম্প্রদায়ের চিন্তায় নতুন বাংলা দেশের সৃষ্টি হল। সাহিত্যে এই যুগবিপ্লব সম্পূর্ণ ভাবে উন্মুক্ত হয়েছিল। স্বদেশ ও স্বসমাজকে ভালোবাসা ও নতুন করে স্বীকৃতি দেওয়া রেনাশাঁসের লক্ষ্মণ। ইউরোপের রেনাশাঁসে এই স্বদেশ প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্য ও প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস চিন্তা ও কল্পনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করেছিল। ইউরোপের রেনেশাঁস তাই সমকালীন মানুষ ও বিশেষ করে নারীকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত হয়নি তার ব্যাপ্তির অনেকখানি স্থান গ্রহণ করেছে Hellenic Culture এবং Mythology. বাংলা দেশের নবজাগরণ ইউরোপের রেনেশাঁসের মত ব্যাপক না হলেও লক্ষণের দিক থেকে এক এবং প্রায় অভিন্ন। বাংলা দেশের ও বাঙ্গালী মানুষের এই পরিচয় সমকালীন সাহিত্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম ও সামাজিক চিন্তার পাশে স্বাধীনতা, স্বদেশ ও

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, **রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা ১৮৭৭।**

হিন্দুত্বের বিচিত্র দিক বিধৃত হয়েছে, ঊনিশ শতকের নাটক, উপন্যাস ও কাব্যে। বস্তুতঃ এই নবজাগরণের বহু দিক। তার বিচিত্র প্রকাশ যেন সহস্র শাখাপ্রসারী বটবৃক্ষের মত। স্বদেশ ও স্বসমাজের মৃত্তিকায় তার প্রাণের যোগ আর সমস্ত বিরোধ ও ঘাত-প্রতিঘাতের ওপরে মুক্তিপিপাসুর মত নিজেকে তুলে ধরা। এত প্রাণময়, গতিময় চেতনার প্রকাশ এর আগে দেখা যায়নি। রামমোহনের মধ্যে যে প্রথম ভারত পথিকের বলিষ্ঠ পরিচয় দেখা গেছে তারই পরম পরিণতি রবীন্দ্রনাথে। আর এই দীর্ঘসূত্রের মালায় অজস্র পুষ্পের সমারোহ। ঊনিশ শতকের অধিকাংশ লেখকই এই বিরাট নবজাগরণের বৈচিত্র্য সম্পাদনে নিজের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

সুরধুনী কাব্য প্রকাশের সমকালে রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্রের রচনা প্রকাশিত হয়েছে। রঙ্গলালের মধ্যে দেখা গেল ঐতিহাসিক বোধ এবং ইতিহাসের প্রতি নতুন দৃষ্টি। মধুসূদনে একাধারে রূপ ও ভাবের বৈপ্লবিক রূপান্তর বিধৃত হল। রামায়ণ কাব্যের অন্যতম নায়ক রাবণ চরিত্রের বিরাটত্ব ও তার ব্যক্তি-হৃদয়ের রূপ—সীতা, সরমা, প্রমীলার পাশে পাশে ব্রজাঙ্গনার শ্রীরাধিকা, বীরাঙ্গনার অঙ্গনারা নতুন শক্তিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। চতুর্দশপদী কবিতা-বলীতে গীতিকবির আত্মপ্রকাশের বলিষ্ঠ প্রয়াস। হেমচন্দ্র এবং কিছু কাল পরে নবীনচন্দ্রের কাব্যে পুরাণ প্রীতির প্রকাশ ঘটেছে। বৃত্রসংহার কিংবা ত্রয়ীকাব্যে (প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, রৈবতক) দানবাধিপতি বৃত্রের মহিমা ও কৃষ্ণকে মানবতার রূপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। কাব্যে পুরাণ ইতিহাস আবর্তিত হলেও ব্যক্তি কবির আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ, তাতে স্পষ্ট রূপ নিয়েছিল। নাটক উপন্যাসেও একই স্পৃহা। তবে এদের রূপ-জগৎ বস্তুমুখী বলে সমকালের সমাজ সেখানে রক্তমাংসে জীবন্ত। সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটক অনুবাদের কালে বাংলা নাট্যরূপ সন্ধানের আরম্ভ এবং প্রেরণা বস্তুত সমাজেরই। সমাজ ধর্ম ও সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনাতেও সামাজিক চিন্তা কাজ করেছে। বহু-বিবাহ, কৌলীন্য প্রথা বিধবা বিবাহ প্রতিফলিত হল কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে। নতুন ভারতের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা চিত্রিত হল উপন্যাসে প্রবন্ধে। স্বাধীনতা উদ্ধারকামী মানুষের বলিষ্ঠ প্রকাশ ধরা দিল উপন্যাস, নাটকে। কাব্যে নাটকে, উপন্যাসে তাই বাঙ্গালীর বিচিত্র প্রকাশ দেখা দিয়েছে নদীমাতৃক বাংলাদেশের মত। সুরধুনী কাব্য এই নবজাগরণের একক, বিচিত্র ফসল।

দীনবন্ধু মিত্রের 'দ্বাদশ কবিতা' আলোচনায় কবির দ্বাদশটি কবিতার ভিত্তিতে যে নবজাগরণ-দীপ্ত মন কাজ করেছে তা লক্ষিত হয়েছে। সুর-ধুনী কাব্যে সেই পরিচয় ব্যাপক। গঙ্গাকে কেন্দ্র করে তার হিমালয় থেকে সুরু করে সাগর সঙ্গম পর্যন্ত কাহিনী কবি উপজীব্য করলেও পাশে পাশে

স্থান পেয়েছে বিভিন্ন স্থানের কথা, পুরাণ, ইতিহাস, লৌকিক গল্প ও সমকাল। একটি নদী ও তার শাখা-নদীগুলির কাহিনীতে ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ না হলেও বিশদ রূপ দেখা গেছে এই কাব্যে। সুরধুনী কাব্য পাঠক যেন গঙ্গা ও তার শাখা-নদীর বিচিত্র পথ ধরে একই সঙ্গে পুরাণ, ইতিহাস ও সমকালে এসে পেঁছায়। এ কাব্যে তাই যে কবিমন কাজ করেছে, তার ব্যক্তিত্বও জটিল ও বহুধা বিভক্ত। নবজাগরণ উদ্দীপ্ত মনের সঙ্গে পুরাণ ইতিহাসের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী এক কবির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে স্পষ্টতর হয় কবির বিচিত্র জীবনদর্শনের অভিজ্ঞতা। সুরধুনী কাব্য যেন এক অলিখিত মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

মহৎ শিল্পীর কাছে যে কোন উপকরণই সৃষ্টির মর্যাদা পায়। এই উপকরণ যে শিল্প সৃষ্টির আগে থেকেই মহিমান্বিত এমন নয়। অনেক সময় তা নিতান্ত তুচ্ছ, উপেক্ষিত, কিন্তু শিল্প সৃষ্টির কৌশলে তুচ্ছ ঘটনা, কাহিনী বা উপকরণ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে এবং এ পরিণাম নিশ্চিত শিল্পরূপের। লক্ষ্য করতে হয় মহৎ শিল্পে এমন সব উপাদান আছে যা বিস্ময়কর। আকাশ, পর্বত, নদী সমুদ্রের যে গভীর ব্যাপ্তি ও মহিমা তাকে লক্ষ্য করেছেন সমস্ত রসিকচিত্ত। প্রয়োজন মত এদেরই সাহায্যে মানবমনের গভীরতা ও মর্যাদার প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু কোথাও এই ব্যাপ্ত প্রকৃতি তার নিঃশেচতন, দুর্জ্ঞেয় রহস্য নিয়ে সম্পূর্ণভাবে শিল্পে ধরা দেয়নি। এমন কি মহাকাব্যের বিস্তৃতির মধ্যেও এদের স্থান স্বল্প। বস্তুত সাহিত্য শিল্প কোন পারমার্থিক অভিব্যক্তিকে তুলে ধরে না। যে বিরাট জড়জগৎ বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের কাছে প্রকাশ পায় সেখানে প্রশ্ন ওঠে ব্যবহারিক এবং দার্শনিক অভিব্যক্তির কিন্তু কবি বা শিল্পীর কাছে প্রকৃতির বিরাট বিস্তৃতি এবং দুর্জ্ঞেয় রহস্য যতখানি আত্মিক তার চেয়ে অনেক বেশি ঐহিক। স্বভাবতঃই রূপসৃষ্টি এবং রস-পরিণতিতে যাওয়ার চেষ্টা কবির আর তিনি যদি কাব্যে প্রতিফলিত করতে পারেন জড়জগতের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তাকে তবে তাঁর দর্শন কবিরই। বস্তুতঃ সমস্ত মহৎ শিল্পই পাঠক ও দর্শক চিত্তকে এক বিশেষ মানসিক স্তরে নিয়ে যায়, নিজেকে এবং নিজের শক্তিকে তখন মনে হয় বালুকনার চেয়ে ছোট; মনে হয় সমস্ত সংস্কার, বোধ, ঐতিহ্য, নিঃশেষিত, চারপাশের বিরাট জড়জগতের চেতনায় আত্মলুপ্তি ঘটেছে। এই বোধকে নির্বেদ বা বিশ্বানুভূতি বলতে পারি। মহৎ শিল্প মাত্রই এই পরিণতিতে পেঁছোতে চায়। উপকরণের শিল্প মর্যাদা থাকলে এবং কবি শক্তিমান হলে এ পরিণতি সুদূরে থাকে না। আবার কবিকল্পনায় সুন্দর হয়ে ওঠে একটি অবহেলিত মুহূর্ত, তুচ্ছ একটি ঘটনা। এই সৌন্দর্য সৃষ্টির আড়ালে আছে ভাবনা, বহিরঙ্গে আছে, রূপময়

শব্দজগৎ। এ দুয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়ে শিল্প হয়ে ওঠে সুষমামণ্ডিত। লক্ষ্য করতে হয় অন্তর্জগতের বিভিন্ন ভাববৃত্তির প্রকাশই সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু চারপাশের পরিদৃশ্যমান রূপজগৎও তার অনেকখানি স্থান গ্রহণ করে আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে আকাশ, বনপ্রান্তর, নদী সমুদ্র এই বিশেষ সৌন্দর্যে আসীন। দেবত্মারা হিমালয় অথবা মেঘমেদুর অম্বর কিংবা 'তমালতালী বনরাজি নীলা'র বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব। নদীও একই মর্যাদা পেয়েছে সাহিত্যে।

পৌরাণিককাল থেকে গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রচারিত।১ বস্তুত নদী ও নদী-পথ মাত্রেই চিরকাল মানব সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত। ব্যবহারিক প্রয়োজনেই মানুষ নদীকে ভালোবেসেছে। কখনো রাজ্য বিস্তারের জন্যে, কখনো ধর্ম প্রচারের জন্যে কখনো বা সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের জন্যে মানুষ বেছে নিয়েছে নদী

১। The principal river-goddess of India is the Ganga, who has lent her sancity, as it were, to many smaller rivers which are fabled to be miraculously connected or identical with her. The Ganga flows in heaven as Viyadganga or Mandakini (the milky way), on earth as the most sacred river, and in the lower world as the Patalganga; she is therefore called Tripathaga, 'going in the three worlds.'

King Bhagiratha, the great grandson of Sagara, induced the celestial Ganga to come down from heaven to earth and from the earth to the lower regions, in order to purify the ashes of the 60,000 sons of Sagara burnt by Kapila; hence she is called Bhagirati. Siva caught the river up in his matted hair in order to check the impetus of her fall. The river then entered Jahnu's sacrificial enclosure and was drunk up by him; but at last he discharged her from his ear, wherefore she is regarded as his daughter and called Jahnavi. These legends are told at length in the Ramayana, 1.38-34; another account of her descent is given in the Markendeya Purana, Ch. 55. Ganga is also said to come forth from the toe of Vishnu. In Mahabharata (1. 98. ff) she is the first wife of Santanu and the mother of Bhisma. It has been said above that Kumara is considered to be her son. Mythologically she is the eldest daughter of Himalaya and Mena.

Encyclopaedia of Religion and Ethics, Ganga, II, 808-809.

পথ। নদীর সঙ্গে মানুষের যোগ তাই তার সব দায়িত্ব পালন করেও আত্মিক বন্ধনে বাঁধা। লক্ষ্য করতে হয় অজস্র নদীর মধ্যে কোন কোন নদীর স্থান অনেক উঁচুতে! শুধুমাত্র প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্যেই নয়, যেন অন্নক্ষুধার রাজ্য পেরিয়ে দেখা দেয় অন্য ক্ষুধার রাজ্য। আর প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই সেই অন্য ক্ষুধা ধর্মরাজ্যের মধ্যে মুক্তি পেতে চেয়েছে। বিভিন্ন দেশের নদীর সঙ্গে মাতৃকা মূর্তিকে মিলিয়ে নেবার যে মনোভাব,১ সেখানে মাতা প্রধান সমাজ ব্যবস্থার চেয়েও বড় হয়ে ওঠে সেই শক্তি যা আমাদের বরাভয় দেয়, দেয় ক্ষুধা তৃষ্ণার খাদ্য পানীয় আর দেয় ধর্মের বোধ। পৌরাণিক গঙ্গার মহিমাকে কেন্দ্র করে তাই রচিত হয়েছে অনেক স্তোত্র ও কাহিনী।২ কিন্তু গঙ্গা আমাদের শাস্ত্রে ও পুরাণে৩ যে মর্যাদা পেয়েছে তার অন্য মূল্যও যথেষ্ট। ভারতবর্ষের অজস্র নদ-নদীর প্যাশে ভৌগোলিক কারণের ফলেই গঙ্গা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা পেয়েছে যেমন পেয়েছে সামাজিক ক্ষেত্রে। সে পরিচয়ের ব্যাপক চিত্র না হলেও স্বল্প পরিচয় সুরধুনী কাব্যে আছে।

সুবধুনী কাব্যের অন্যতম চরিত্র জাহ্নবী, পদ্মা, মেনকা ও হিমালয় কাব্যের প্রথম সর্গ থেকেই মানব-মানবীর রূপ পরিগ্রহ করেছে। মেনকা হিমালয়ের মানবিকরূপ তাঁদের কন্যা জামাতার মতই পৌরাণিক কাব্যে উজ্জ্বল। বাংলা গঙ্গামঙ্গল কাব্যগুলিতে গঙ্গার পৌরাণিক ও লৌকিক মূর্তিকে মিলিয়ে

১। Rivers are addressed as 'mothers' and 'protectors' and prayers are offered to the mountains, to the sun, to winds, and to the earth. Traces of such 'animatism' occur in Greek religion—the worship of rivers or of the sun as such.

Encyclopaedia of Religion and Ethics, IX. 205a, personification IX. 793.

২। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যও 'দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে' বলে স্তোত্র রচনা করেছিলেন।

৩। কৃষ্ণ বলেছেন তিনি গঙ্গায় অধিষ্ঠিত, গীতা (১০।৩১)। কূর্মপুরাণে, গঙ্গায়াঞ্চ জলে মোক্ষো বারানস্যাম জলে স্থলে, জলে স্থলে চান্তরীক্ষে গঙ্গা সাগর-সঙ্গমে, বলা হয়েছে। স্কন্ধপুরাণেও গঙ্গায় মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছে। রঘুনন্দন তাঁর শুদ্ধিতত্ত্ব গ্রন্থে এই পুরাণ দুটি থেকে গঙ্গায় মৃত্যু বরণ সম্পর্কে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য: Shastri, Dakshinaranjan, *Origin and Development of the Rituals of Ancestor-Worship in India,* 1963, 48-49.

নেওয়া হয়েছে।১ বিশেষ করে মনসামঙ্গল কাব্যে গঙ্গার এই পরিচয় স্পষ্ট। ভীষ্ম-জননী দেবলোকে এসেছিলেন রন্ধনশালা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে, কিন্তু শর্ত ছিল গঙ্গা যেন রাত্রিবাস না করেন সেখানে। শর্তভঙ্গ হল এবং শান্তনু গ্রহণ করলেন না পত্নীকে। তখন শিব গঙ্গাকে স্থান দিলেন নিজ গৃহে। পৌরাণিক শিবের যে চরিত্র মঙ্গলকাব্যগুলিতে আছে তাতে অন্যের রমণীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গৃহে স্থান দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। গঙ্গা তাই প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে শিবঘরনীরূপে লক্ষিত। সংস্কৃত পুরাণের চেয়ে অপৌরাণিক বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবদেবীর মানবিকতা অনেক স্পষ্ট। দেবতার মহিমা কবে থেকে সাহিত্যক্ষেত্রে ম্লান হতে শুরু করেছে তার সঠিক কাল নিরূপণ সম্ভব নয়। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, সাহিত্য যখন থেকে দেবভাবনা-মুক্ত হয়েছে তখন থেকেই মানুষই তার প্রধান উপজীব্য হয়েছে। অথচ দেবতাকে তাঁর কৌলীন্য দেবার যে চেষ্টা হয়নি এমন নয়। সাহিত্যে যে দেবতাগুলির প্রকাশ ঘটেছে, ধর্মগত মর্যাদা বা মহিমার চেয়ে তাদের মানবিকরূপকে শিল্পী গ্রহণ করেছে অনেক বেশি। বিশেষ করে যে ধর্মভাবনা লৌকিক সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তার সঙ্গে বৈদিক নিষ্ঠা, আচার-আচরণের যোগ ছিল নিতান্ত অস্পষ্ট। স্বভাবতঃই লৌকিক আচার, আচরণ, সংস্কার, ধর্মনিষ্ঠা নিজেদের সামাজিক প্রয়োজন সিদ্ধ করতে ধর্মভাবনা-গুলিকেও নিজেদের মত করে নিয়েছিল। তাই ভাগবত কিংবা সংস্কৃত পুরাণের কৃষ্ণরূপ বাংলা লৌকিক কাব্যে অন্যভাবে প্রকাশিত, যেমন প্রকাশিত শিব দুর্গা বা চণ্ডীর কাহিনী। সাহিত্যের দিক থেকে এই ধর্মভাবনার যতখানি মূল্য তার চেয়েও বেশি মূল্য বস্তুত বিভিন্ন দেবদেবীর চরিত্র-চিত্রণে এবং তাদের কাহিনীতে। লৌকিক সমাজই শুধু নয়, সব সমাজের মানুষ তাদের কল্পনার জগৎকে সাহিত্যে ধরে রাখতে চেয়েছে। গোষ্ঠীশিল্পী বা ব্যক্তিশিল্পীর শৈল্পিক উৎকর্ষে বা অপকর্ষে তা কোথাও সুন্দর, কোথাও অপরিনত। কিন্তু সেখানেই তার মূল পরিচয় নয়—সম্ভবতঃ তার মৌল পরিচয় বিশেষ কাল ও সমাজ-পরিচয় তুলে ধরায়। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় সেখানে ধর্ম ও সমাজের জয়গান—কোথাও ধর্মের আড়ালে মানবিক লালসার কাহিনী, কোথাও দেবতা-মানুষের সংগ্রাম, কোথাও দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা এই ভাবের প্রকাশ। চর্যাপদ থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত যে দীর্ঘকাল ধরে বিচিত্র কাব্য-কাহিনী রচিত হয়েছে সেই সাহিত্য-কীর্তির

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য, **বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস** (গঙ্গামঙ্গল) ৪র্থ সংস্করণ ১৩৭১ (১৯৬৪) ৭৭৮-৮৫।

মধ্যে দেখা দিয়েছে সদাচঞ্চল সমাজের প্রতিক্রিয়া। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল বা ধর্মমঙ্গল যে সমাজ ও ধর্ম-সংক্রান্ত বিরোধকে তুলে ধরেছে তার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট এবং সেই দিক থেকে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই উপাদান নেই। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও প্রধান তিনটি মঙ্গলকাব্য-ধারার সঙ্গে এদের তুলনা হতে পারে না। ধর্মগত বিতর্ক এবং বিশেষ ধর্মভাবনা প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা প্রধান তিনটি মঙ্গলকাব্য-ধারায় আছে তা বিষয়গুণেই ধর্মকথা তুলে ধরেও সাহিত্য-শিল্পের মর্যাদা পেয়েছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিতে কোন বিশেষ ধর্মভাবনা প্রতিষ্ঠার জন্যে সামাজিক বিরোধিতায় দাঁড়াতে হয়নি। বিশেষ বিশেষ ভক্ত-সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিচয় এখানে প্রকাশিত এবং তাদের কাহিনীগত বৈশিষ্ট্যও নেই। ফলে এই মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবতাদের গতানুগতিক পরিচয়ই স্পষ্ট। একথাও বলা চলতে পারে যে, মঙ্গলকাব্য-গুলির প্রধান প্রধান ধারা অনুসরণ করে দেবমহিমা প্রচারের চেষ্টা এগুলিতে বিধৃত। ষোড়শ, সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতকে রচিত এই কাব্যগুলির নবত্ব নেই। কাহিনী কিংবা চরিত্র-চিত্রণে প্রাচীন কাব্য অনুসৃতির পরিচয়, গঠন-রীতিও গতানুগতিক। বস্তুত ভারতচন্দ্র পর্যন্ত সমস্ত মঙ্গলকাব্যের বিষয়-বস্তু, ঘটনা পরিকল্পনা কি কাহিনী বর্ণনায় গতানুগতিক। এর ব্যতিক্রম নেই এমন নয়। শক্তিমান কবির ক্ষেত্রে মঙ্গলকাব্য বা দেবভাবনা প্রধান কাব্য-বিশিষ্টতা পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলতে পারে, প্রাচীন সাহিত্যে যে সমাজ প্রতিফলিত তা গোষ্ঠীকেই প্রাধান্য দিয়েছে। ঊনিশ শতকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দীপ্ত প্রকাশ তার মধ্যে খোঁজা অসঙ্গত। তবু যে মানুষগুলি তাঁদের কাব্যে নিজেদের প্রকাশ করতে পেরেছেন তাঁরা গোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েই তা করেছেন এবং সেদিক থেকে এঁরা শক্তিমান ব্যক্তিত্ব। কিন্তু যে সামাজিক বোধ ও সংস্কার আধুনিক ব্যক্তিত্বকে গঠন করেছে তার সঙ্গে এঁদের পার্থক্য আছে। তাই আধুনিক কালের কোন কবি যদি প্রাচীন ভাবনাকে গ্রহণ করে রচনা করেন কোন কাব্য তবে তার বিচারও এই দুই ব্যক্তিত্বের পার্থক্যের বিচার।

ঐতিহ্যে বিশ্বাস যে কোন সুস্থ সমাজের বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে সে সমাজ যদি প্রাচীন হয়। আর এই সমাজ যদি বৃহৎ দেশকালের সঙ্গে যুক্ত হয়— তখন তার প্রকাশও ঘটে বিচিত্রভাবে। ভারতবর্ষের বিচিত্র সমাজ সম্ভবতঃ একথার স্পষ্ট প্রমাণ হতে পারে। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখি, আর্য-সভ্যতার আগেও যে ভারতবর্ষের সভ্যতা ছিল এবং তার পরিচয় বৈদিক সংস্কৃত রূপের চেয়ে কম নয়, যদিও আপেক্ষিক প্রমাণ বেশি নেই। কিন্তু এও ঠিক যে, রাজনৈতিক কারণে যে ভারতবর্ষ বার বার ভিন্ন ভিন্ন সাম্রাজ্যের প্রাধান্য

দিয়েছে তার রাজনৈতিক দিককে স্বীকার করেও ধর্মগত ভিত্তিতে ভারতবর্ষের সমাজকে ভাগ করা চলতে পারে। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা ইসলাম যে পরিমাণে ব্যাপকতা পেয়েছিল, বৌদ্ধ কি জৈনধর্ম সংখ্যার দিক থেকে হীন হয়েও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আর্য অনার্য বিভেদের মধ্যেও অজস্র ধারা থেকে গেছে। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে একশ ছ'টি ধর্ম-সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আনুকূল্য পেয়ে কতগুলি সম্প্রদায় বিশেষ বিশেষ সময়ে মর্যাদা পেয়েছে, প্রভাব বিস্তারও করেছে। আবার কতগুলি গিয়েছে সম্পূর্ণ অর্ধলুপ্ত এবং বিলুপ্তির পথে। আবার কোথাও কোন বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায় অর্ধমৃতের মত বেঁচে আছে। ধর্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার বিশিষ্ট চিন্তাগুলিকে বিভিন্ন দিকে প্রতিফলিত করেছে। সমাজ ও ধর্মচিন্তার মধ্যে মানুষ খুঁজে পেল দর্শনকে। একই সঙ্গে সাহিত্যের রূপও ধরা দিল। বস্তুতঃ প্রাচীন সমাজের ভাবনাগুলি প্রতিনিয়ত পুষ্ট হয়ে চলেছে। যে সমাজ যত প্রাচীন তার বহমান ধারার ঐতিহ্যও তত বেশি। একে সংস্কারের নামান্তরও বলা যায়। আর এই ঐতিহ্য যেন রক্তের বন্ধনের মত জড়িয়ে থাকে। তাকে স্বীকার-অস্বীকারের প্রশ্ন প্রায়-অবাস্তব। অথচ তাকে বিশ্বাস করার যুক্তির পেছনে যে মন কাজ করে সে বিচার-বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট করে তার ঐতিহ্যের স্বরূপকে! বিশেষ করে ধর্ম এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই ঐতিহ্যপ্রীতির প্রয়াসী মানুষ। এ যেন অনির্বাচ্য আত্মার মত। বৃহৎ দেশের অজস্র মানুষের ভাবনায় এর রূপ ব্যক্ত। কালের পরিবর্তন তাই নতুন করে তোলে ঐতিহ্যের স্বরূপ। আর এই নবত্ব আসার ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয় দৃষ্টিভঙ্গীর। বস্তুত এক কাল থেকে অন্য কাল পর্যন্ত সমাজের সদা চঞ্চল ধ্যান-ধারণাকে বহন করে চলে ঐতিহ্য। পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শনে তারই প্রকাশ, আর এই প্রকাশই নতুন দীপ্তি পায় যখন বিচারের চেষ্টা দেখা যায় সেই ঐতিহ্যের। সম্ভবতঃ এও একরকমের আত্মপ্রীতি। দেশ কাল ও সমাজের প্রাচীনত্বই শুধু নয়, তুলে ধরে সমস্ত মানবিক সৃষ্টির মূল্যমানকে নিজের মধ্যে। সব দেশের সাহিত্য, দর্শন, ধর্মে এরই প্রকাশ ঘটেছে। এই অর্থে সমস্ত কবির কাব্যই প্রাচীনকে স্বীকার করে অর্থবহ হয়ে ওঠে। প্রাচীন কবি-সাহিত্যিককে অন্বিত করেই কোন কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদন সম্ভব। সমালোচকের ভাষায়—

"No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets anl artists."(১)

১। Eliot, T. S., 'Tradition and the Individual Talent', (1919) *Selected Prose,* Penguin Books, 1953, 23.

ঊনিশ শতকের বাংলা দেশে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে কাব্যে উপন্যাসে সংস্কৃত ভারতবর্ষের মর্যাদাকে নতুন ভাবে আঁকা হয়েছে ঐ সময়ে। পুরাণ, ইতিহাস ও সমকালকে ভিত্তি করেই এই ঐতিহ্য সন্ধান। দীনবন্ধু মিত্রের সুরধুনী কাব্যেও এ পরিচয় স্বল্প নয়। সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ কিংবা কৃষ্ণ-চরিত্রের নতুন ব্যাখ্যা যে সমাজ মন থেকে বিচ্ছুরিত দীনবন্ধুকাব্যেও সেই একই মনোভাবের প্রকাশ। তবে তার প্রকাশভংগী ভিন্ন। সুরধুনী কাব্যের আরম্ভেই পদ্মা ও জাহ্নবীর কথোপকথনে পতিসন্দর্শনকামী জাহ্নবীর রূপে প্রথম থেকেই মানবিকতার আরোপ কবি ঘটিয়েছেন। গঙ্গাকে সাগর সঙ্গমে পাঠাবার ভাবনায় হিমালয় ও মেনকার মূর্তিতে পর্বতবৎ কোন রূপ নেই বরং একমাত্র কন্যাকে সুদূরে পাঠাতে গিয়ে পিতামাতার সকাতর বেদনার প্রকাশ স্বাভাবিক। গোমতী দ্বার দিয়ে নির্গত হয়ে সাগর সঙ্গম পর্যন্ত গঙ্গার প্রবাহ পথের বিভিন্ন স্থানে পুরাণ প্রসঙ্গ এসেছে। প্রধানতঃ তীর্থ ক্ষেত্র, মন্দির ও ভগবৎ প্রসাদপুষ্ট মানুষের প্রসঙ্গে ধরা দিয়েছে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন পুরাণ কথা। গোমুখী, কুঞ্জর প্রসঙ্গ, বিষ্ণুপ্রয়াগ হরিদ্বার (নীলধারা, বিশ্বপর্বত) গড়মুক্তেশ্বর হস্তিনাপুরী, প্রয়াগ, মথুরা, কংস, বৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণ, বারানসী, বিশ্বেশ্বর কথা, কাশীর বিভিন্ন ঘাট, রামলীলা, বিশ্বামিত্র আশ্রম ও রামকথা, অহল্যা, অগস্ত্য, জরাসন্ধ, ভীম, কৃষ্ণার্জুন এই প্রসঙ্গগুলি গঙ্গার প্রবাহ পথে এসেছে। একই সূত্রে গ্রথিত হয়েছে ইতিহাস। তা কোথাও মহাভারত প্রসিদ্ধ রাজকীর্তি স্মরণ করে কোথাও ইতিহাস প্রসিদ্ধ হিন্দুরাজা ও তার রাজধানীকে কেন্দ্র করে। মুসলমান ও মুঘল রাজাদের রাজধানী ও কীর্তিসৌধ এবং সমাধিও একদৃষ্টিতে অংকিত। এই পুরাণ, ইতিহাসের পাশে স্বল্পকাল আগের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের কথাও স্মরণ করেছেন কবি। পুরাণ ইতিহাস এবং সমকালের প্রতি কবির যে চিন্তা কাজ করেছে তা বিচ্ছিন্ন কোন সত্যে যুক্ত নয়! হিন্দু ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন কবি সুরধুনী কাব্যে।

ভারতবর্ষের সংস্কৃত কাব্যগুলিতে সরস্বতী বন্দনার প্রবণতা আছে। এমন কি মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরাও তাঁদের মাহাত্ম্য প্রচারকদের আনুকূল্য দেখিয়েছেন। কোন কোন গবেষক বৈদিক সরস্বতী বা বাকদেবীর সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মিল খুঁজে পেয়েছেন।১ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে

১। সুকুমার সেন, **বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্দ্ধ**, ৪র্থ সং, ১৯৬-১৮২।

মধুসূদনের মধ্যে ভিন্ন ভাবে হলেও সরস্বতীর বরলাভের প্রয়াস আছে। মেঘনাদ বধ কাব্যে কবি কাহিনী বর্ণনার আগে বাকদেবীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। বিদ্যাদায়িনী দেবীর কাছে এই প্রার্থনা ইউরোপীয় সাহিত্যেও প্রাচীন।১ সুরধুনীকাব্যও একথার ব্যতিক্রম নয়। কাব্যের আরম্ভে 'কবিতা কুসুমমালা শোভিতা ভারতির' কাছে কবির প্রার্থনা। এই নিবেদনে নতুন হয়ে ওঠে পুরাণ অভিষিক্ত দেবী সুরেশ্বরীর মহিমা। কবি যেন উপলক্ষ্য মাত্র যেন দ্রষ্টা, নতুন করে শুনতে চান জাহ্নবীর প্রবাহ পথ বর্ণনা ঃ

কেমনে গমন করিয়াছে ভবায়না,
শুনিতে শুনিতে ভগীরথ শঙ্খধ্বনি,
সেকালে সাগরে যায় ভীষ্মের জননী
এখন বাজায়ে বীণা তুমি একবার,
শৈল হতে গঙ্গা লয়ে যাও পারাবার।

ভগীরথ শঙ্খধ্বনির সঙ্গে গঙ্গার সাগরসঙ্গম পুরাণ বর্ণিত এবং কবি তা উল্লেখ করলেও তাঁর লক্ষ্য ভিন্ন কেননা, তাঁর কাব্যের প্রবাহ পথ পুরাণ ইতিহাসের বিচিত্র পথ ধরে এসে পেঁৗচেছে বর্তমানে। জাহ্নবীর সমস্ত দৈবীমহিমাকে স্বীকার করেও তাঁকে মাটিতে নাবিয়েছেন কবি। সুরধুনী কাব্যের প্রথম সর্গে গঙ্গা তাই পারিবারিক বন্ধন ও গৃহের সম্পর্কে স্থাপিত। 'ভীমকলেবব' 'মহাহিমালয়ের হৃদয়কন্দরই' জাহ্নবীর জন্মভূমি। যৌবনে উপনীত হবার পর তাঁর চিত্তে দেখা দিয়েছে বিরহ বেদনা। সখী পদ্মা এসে দাঁড়িয়েছেন সমবেদনায়। পতি সন্দর্শনের জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ গঙ্গা বলে—

পারাবারে যাব আমি করিয়াছি পণ
কার সাধ্য মম গতি করে নিবারণ

পদ্মা আশ্বাস দেয় গঙ্গাকে—তাকে শান্ত করে। জাহ্নবী ও পদ্মা এখানে আমাদের গৃহজীবনের পরিচিত কন্যা ও সখীরূপে প্রতিভাত হয়েছে। মেনকার কাছে—

'নিবেদন' বলে পদ্মা শুনগো আমার
তোমার গঙ্গায় আর ঘরে রাখা ভার
যৌবনে ভরেছে অঙ্গ পতি নাই কাছে,
বড যাই ভালো মেয়ে আজো ঘরে আছে.

২। Curtius, E. R., *European Literature and the Latin Middle Ages,* tr Trask, W.R. 1953 দ্রষ্টব্যঃ 'The Muses' অধ্যায়।
(হোমার ২২৯, ভারজিল ২৩০-৩১, হোরেস ২৩২, দান্তে ২৩০)।

হিমালয়ে জিজ্ঞাসিয়ে দেহ অনুমতি—
পতি কাছে লয়ে যাই জাহ্নবী যুবতী.

চিন্তিত মেনকার কাছে হিমালয় এলে মেনকা তাঁর আশঙ্কার কথা প্রকাশ করলেন—

ঘরেতে যুবতী মেয়ে কত জ্বালা মার
কোথায় জামাতা তার নাহি সমাচার
অবলা সরলা আমি ভাবিয়ে আকুল
কলঙ্কে পঙ্কিল হতে পারে জাতিকুল......

হিমালয় মেনকার আশঙ্কায় বিচলিত নন, কেননা তাঁব কন্যা শিক্ষিতা সুশীলা এবং

পিতামাতা পাদপদ্ম ভক্তিসহকারে
করে পূজা দিবানিশি বসি অনাহারে

অবশ্য একথাও তিনি জানেন যে,

পাঠান বিহিত বটে কন্যা পারাবারে
আয়োজন কর তার বিবিধ প্রকারে
যে দিন হয়েছে মেয়ে জানি সেই দিন
পর ঘরে যাবে মাতা হব সুখহীন—

তখন চারদিক ঘোষিত হল জাহ্নবী যাত্রার—

সজল নয়নে রানী মেনকা তখন
সাজাইল জাহ্নবীরে মনের মতন

বেশবাসে সজ্জিত কন্যা 'ভূধর চরণে' প্রণাম জানাতে হিমালয় করুণ চোখে জাহ্নবীকে উপদেশ দিলেন অনেক। পতির প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা, শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি ভক্তি, ভাশুরের প্রতি ভক্তি এবং—

কনিষ্ঠ সোদর সম দেখিবে দেবরে
যা-গনে বাসিবে ভালো ভগিনীর ভাবে
সুশীলতা মিষ্টভাষা সতীত্ব সরম
অঙ্গনার অলঙ্কার অতিমনোরম
ভূষিত করিবে বপুঃ এই অলঙ্কারে
আনন্দে রহিবে পাবে সুখ্যাতি সংসারে।

হিমালয়ের উপদেশে হিন্দু নারীর নৈতিক দিকটি যেমন প্রকাশিত তেমনি প্রকাশিত বাঙ্গালী গৃহের সামাজিক কর্তব্যের রূপ। পতিগৃহযাত্রিণী গঙ্গার প্রতি হিমালয়ের উপদেশের ভাষার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

শকুন্তলার মিল আছে।১ শকুন্তলার প্রতি কণ্বের উপদেশ অংশটির প্রতিফলন যেন এখানে ঘটেছে।

পিতামাতার কাছ থেকে গঙ্গার বিদায় নেওয়ার দৃশ্যটি বাস্তব ও সুন্দর—

বিদরে হৃদয় পিতা মরি ভাবনায়,
কোথায় গমন করি ছাড়ি বাপ মায়!
সকাতরে চলিলাম চরণ ছাড়িয়ে
ভাসায়ে দাসীরে নীরে থেক না ভুলিয়ে
পথ চেয়ে হব রত দিন গনণায়—
যতশীঘ্র পার পিতা এন গো আমায়
জননীর গলা ধরি জাহ্নবী কাতরে—
কাঁদিলেন কতক্ষণ ব্যাকুল অন্তরে
মা আমারে মনে কর, বলিল নন্দিনী,
না হেরে তোমারে আমি হব পাগলিনী
কোথা যাই কি করিয়ে থাকিব তথায়,
বাবারে বল মা মোরে আনিতে ত্বরায়।

ক্রন্দনরতা মেনকা সান্ত্বনা দিতে চায় কিন্তু নতুন হয়ে ওঠে শোক—

বলে মা কেঁদ না আর কেঁদ না কেঁদ না,
সহিতে পারি নে আর হৃদয়-বেদনা,
সেই ঘর সেই দোর কর চিরদিন
কেঁদ না কেঁদ না মুখ হয়েছে মলিন।
কোল শূন্য হলো, শূন্য হইল ভবন
মৈনাকের শোক আজ বাজিল নূতন

মায়ের চরণে প্রণতি জানিয়ে বিদায় নিলেন জাহ্নবী। ভীমদর্শন শশাঙ্কশেখর থেকে শত শত শুভ্র আভাময় তুষার শলাকা নেবে এসেছে, 'শোভে যেন শুভ্রজটা ধূর্জটির শিরে'। তারই মাঝখানে গোমুখী বিরাজমান, গঙ্গা যেন শিবজটায় আবদ্ধ। সেই ভয়ঙ্কর অথচ মনোহর, গোমুখী তোরণ দিয়ে অযুত জীমূত শব্দে প্রবাহিত হলেন সুরধুনী।

প্রথম সর্গে দেবী বীণাপানির বন্দনা থেকে সুরু করে গঙ্গার বিরহিনী রূপ, সখী পদ্মার সঙ্গে কথোপকথন, মেনকা ও হিমালয়ের সংবাদ ও গঙ্গার বিদায় গ্রহণ এগুলির মধ্যে বিদায় দৃশ্যটিই প্রাধান্য পেয়েছে। গঙ্গার বিরহ

। শকুন্তলা, ১৮৫৪, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

কাতরতার বর্ণনায় বৈষ্ণবকাব্যের শ্রীরাধিকার বিরহ-দীর্ণ চিত্ত ও রূপ যেন প্রতিফলিত হয়েছে—

একদা বিরলে বসি জাহ্নবী কাতরা,
বামকরে গণ্ড, বামেতরে ধরা ধরা,
বিমুক্ত কুন্তলদল, সজলনয়ন,
হতাদরে নিপতিত সিন্দুর চন্দন
বিকম্পিত দন্তবাস, লুণ্ঠিত অঞ্চল,

অংশটি যেন সংস্কৃত কাব্যের বিরহ বিধুরা নায়িকাকে স্মরণ করায়। রামায়ণ মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ কথার প্রকাশ এ কাব্যে ইতস্ততঃ আছে এবং সেগুলির সঙ্গে দেবী সুরেশ্বরীর প্রবাহপথ যুক্ত। কিন্তু যখনই প্রচলিত কোন কিছু বর্ণনার প্রয়োজন অনুভব করেছেন কবি তখনই যেন তাঁকে যেতে হয়েছে পূর্বতন কবিকুলদের কাছে। এ কাব্যের হিমালয় বর্ণনা কালিদাস কাব্যের হিমালয়ের মহিমা ও গাম্ভীর্য নিয়ে উপস্থিত হলেও তার নতুন রূপ আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

হেনকালে হিমালয় গিরিকুলেশ্বর
হাসি হাসি তথা আসি চুম্বিয়ে অধর
জিজ্ঞাসিল পরিচয় মধুর বচনে
কেন প্রিয়ে হাসি নাই তব চন্দ্রাননে
কি বিষাদ হৃদিপদ্ম হৃদি অধিকারী,
আমি ত অর্ধাঙ্গ কান্তে অংশ পেতে পারি।

এ কাব্যের প্রথম সর্গের দ্বিতীয় স্তবকে হিমালয় বর্ণনা কালিদাস কাব্যের হিমালয়. কিন্তু জাহ্নবীর পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্‌কালে হিমালয়ের যে পরিচয় কবি দিলেন তা সম্ভবতঃ মঙ্গলকাব্যের শিবের প্রভাব। বস্তুতঃ দশম সর্গে বিভক্ত করে কবি সুরধুনী কাব্যকে সুরধুনীর মতই বিস্তারিত করতে চেয়েছেন। আর ঐতিহ্যপুষ্ট সন্ধানী মন সংগ্রহ করেছে, জাহ্নবীর যাত্রাপথের বিশিষ্ট চিহ্নগুলিকে। প্রয়োজন মত সংস্কৃত নীতি শ্লোকের সাহায্যে যেমন গ্রহণ করেছেন তিনি তেমনি বেছে নিয়েছেন পুরাণ, ইতিহাস, পূর্ব ও সমকালের সাহিত্য সংস্কৃতি থেকে উপকরণ। লক্ষ্য করতে হয় কোথাও কোথাও এই উপকরণগুলি বাস্তব জীবনের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত বলেই যেন কাব্যে বিশিষ্টতা পায়। অষ্টাদশ শতকের আগমনী বিজয়া সঙ্গীতের উৎস যে দীনবন্ধুর কালে সমান তীব্র ছিল তারই প্রকাশ ঘটেছে সুরধুনী কাব্যে জাহ্নবীর বিদায়কালে। মেনকা ও হিমালয় যে পৌরাণিক সত্যে আবদ্ধ তাকে নতুন করে দেখার চেষ্টা আগমনী বিজয়া সঙ্গীতকারদের ছিল। কিন্তু সেই

দৃষ্টি তাদের দেবতার আসন থেকে বিচলিত করেনি এবং দেবতার হৃদয়ে মানুষের বেদনা যেন সংহত হয়েছে। সুরধুনী কাব্যের মেনকার করুণ উক্তিতে, পরম যত্নে একমাত্র কন্যাকে খাওয়ানোর স্মৃতিতে, স্নেহাশীর্বাদে, নতুন করে মৈনাকের শোক স্মরণে যে চিত্রের প্রকাশ তা জননীর। হিমালয়েরও একই রূপ। সন্তানের প্রতি স্নেহে, প্রেমে মেনকা হিমালয় নেমে আসেন আমাদের গৃহে। আর কবিও যেন সামান্যতম সুযোগে এদের পৌরাণিক আবরণটুকু এক মুহূর্তের জন্যে সরিয়ে নিভৃত দাম্পত্যের একটি ছবিকে তুলে ধরেন আমাদের সামনে। মনে হয় এ যেন কাব্যের চরিত্র নয়—কবির চরিত্র। সমস্ত বেদনা, অসঙ্গতির মধ্যে যে কবি তুলে ধরেন হাস্যজড়িত মুহূর্তগুলি, তারই একটি ভগ্নাংশ যেন পর্বতরাজের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তোলে।

সুরধুনী কাব্যে পুরাণ প্রীতির পরিচয় সর্বত্র। গঙ্গার প্রবাহপথে বিশেষ তীর্থস্থান, মন্দির, পুরাণসিদ্ধ চরিত্রগুলি অবশ্য কালগত দিক থেকে দেখা দেয়নি। উত্তর ভারত থেকে গঙ্গার বিভিন্ন শাখা নদীগুলির সঙ্গে পুরাণ যেমন যুক্ত হয়েছে তেমনি যুক্ত হয়েছে ইতিহাস। লক্ষ্য করতে হয় সুরধুনী কাব্যের প্রথম সর্গে ইতিহাসের কোন ঘটনা, কাহিনী বা চরিত্র নেই। তার কারণ হিমালয় কন্দর থেকে গোমুখী পর্যন্ত স্থান ব্যবহারিক অর্থে ইতিহাস বহির্ভূত। অথচ কানপুর বা দিল্লী আগ্রার প্রসঙ্গে ইতিহাসের ঘটনা, চরিত্র ও অজস্র স্মৃতিসৌধের উল্লেখ করেছেন কবি। দিল্লী কিংবা আগ্রার বর্ণনায় কবি উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন দ্রষ্টব্য স্থানগুলিকে। নিরেট প্রস্তরময় দ্বাদশ তোরণ, অপরূপলোহিত শিলায় তৈরী জুম্মা মসজিদ, হুমায়ুন ভূপতির কবর কিংবা কুতুবমিনার নামে স্তম্ভ ভয়ঙ্কর এদের বর্ণনা করেছেন কবি এবং পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয়ও তাঁর স্বল্প নয়। আগ্রার বর্ণনা করে কবি আগ্রার বিভিন্ন সৌধগুলির পরিচয় দিয়েছেন। তার 'শিলাময় দুর্গ দীর্ঘকায়' এবং স্থির বিজলীর পুঞ্জ অনুভব হয়'। শিস মসজিদ, মতিমসজিদ এবং সেকেন্দরাবাগ-এর বর্ণনা প্রায় ভ্রমণকারীর মত। কানপুর কিংবা লক্ষ্মৌ-এর প্রসঙ্গে নিকট অতীতের ইতিহাস ধরা দিয়েছে। ইংরেজী শিক্ষিত ঊনিশ শতকের বাঙ্গালী মানুষ যে ইংরেজ শাসনকে ও তাদের সাহিত্য সংস্কৃতিকে স্বীকার করেছিল আন্তরিকতার সঙ্গে তার পরিচয় সেকালের প্রায় সকলের মধ্যেই আছে। লক্ষ্য করতে হয় সিপাই বিদ্রোহের ক্ষীণতম প্রতিক্রিয়া সে সময়ের শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিন্তাকে আলোড়িত করেনি। ঈশ্বর গুপ্তের 'যুদ্ধ' বিষয়ক কবিতাতে বা দীনবন্ধুর 'যুদ্ধ' কবিতাতে যুদ্ধের যে পরোক্ষ পরিচয় তার ভিত্তি হয়তো সিপাই বা লুসাই যুদ্ধ। কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে অন্ততঃ সে সময়ের বাঙ্গালী মানুষ সিপাইদের মত প্রতিক্রিয়াশীল হয়নি।

এই অসমর্থন বা নিতান্তই অবিচলিত মনোভাব তাদের লেখায় স্পষ্ট। সুরধুনী কাব্যেও একই চিন্তা কাজ করেছে। কবি গঙ্গার প্রবাহ বর্ণনা করতে গিয়ে ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেও সেই সময়ের একটি চিন্তাকে তুলে ধরেছেন। বঙ্কিম ভূদেবের হিন্দু ভারতবর্ষের স্বপ্ন কবির কাছে বিশেষ স্পষ্ট না হলেও হিন্দু পুরাণের বিভিন্ন দেবদেবী ও সিদ্ধ ঘটনা, কাহিনীর সঙ্গে পাশাপাশি অতীত ইতিহাস ও নিকট অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন কবি। লক্ষ্য করতে হয় সেই হিন্দু ভারতবর্ষের স্বপ্ন যেমন এক-দিকে পুরাণ কথার মধ্যে অনুভূত হওয়ার সচেষ্ট প্রয়াসী তেমনি অন্য দিকে মুসলমান প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিসৌধকে কিংবদন্তীর ভিত্তিতে হিন্দু রাজার কীর্তি ঘোষণায় উন্মুখ। এ কাব্যে তাই কুতুবমিনারের প্রত্যেকটি স্তরের প্রত্যক্ষ বর্ণনার পরেও কবি লিখেছেন,

ধন্য পৃথুরাজ তব কীর্তি চমৎকার
তুষিবারে তনয়ার তীর্থ অনুরাগ,
গঠে স্তম্ভ পূর্বকালে পৃথু মহাভাগ
প্রত্যহ প্রভাতে স্তম্ভে করিয়া রোহণ।
করিতেন সুলোচনা গঙ্গা দরশন।১

কবি এ কথা বলেই পৃথুরাজ প্রসঙ্গ শেষ করেননি, তাঁর রাজধানীর ধ্বংস-স্তূপ দেখে কবির মনে হয়েছে, তা 'শোকাকুলা মরি যেন রাবণের রানী', এই সঙ্গে কবি যে ইংরেজ বিদ্রোহী সিপাই বিদ্রোহের নায়কদের স্বীকার করেননি তা অনুমান করতে দ্বিধা হয় না। কানপুরের গঙ্গা প্রবাহ বর্ণনায় 'নানা সাহেবের' উপস্থিতি ঘটিয়ে তার নিষ্ঠুরতার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন কবি—

বধিল বিলাতি রামা সহ কচি ছেলে
সাহেব ধরিয়ে কত কূপে দিল ফেলে।২

১। তুলনীয়ঃ Theories professing the Hindoo origin of the Kootub are maintained by one party. Theories professing its Mahomedan origin are propounded by the other. The Hindoo party believes the Minar to have been built by a Hindoo prince for his daughter, who wished to worship the rising sun, and view the waters of the Jumna from the top of it every morning.

Chunder, Bholanauth, *The Travels of a Hindoo to various parts of Bengal and Upper India,* 1869, II, 188.

২। তুলনীয়ঃ There is no forgetting, however, by anybody the *House of Massacre.* By a strange fatality, this happend to be

নানা সাহেবের এই নিষ্ঠুরতার পরিচয়ে ইংরাজ প্রীতি অনুমিত হতে পারে। তা আরো স্পষ্ট হয়েছে লক্ষ্ণৌ প্রসঙ্গে। কবি লক্ষ্ণৌ নবাবের অত্যাচার ও প্রজা পীড়নের বর্ণনা করেছেন এবং সেই অত্যাচারিত ও পীড়িত প্রজাকুলই যে আবার সুশাসিত হল নবাবের রাজ্যচ্যুতির পর তার বর্ণনাও দিয়েছেন এবং প্রায় সমস্ত বর্ণনাটুকুর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ইংরেজকে স্বীকৃতির পরিচয় স্পষ্ট। অবশ্য ভারতবর্ষ সম্পর্কে দেশানুরাগ সেই সময়ে যত তীব্র ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল বাংলাদেশ সম্পর্কে। তাই এ সময়ের অধিকাংশ রচনাতেই স্বদেশ, সমাজ ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত মনোভাবগুলি বাংলাদেশকে ভিত্তি করেই বৃহত্তর দেশের স্বপ্নপ্রয়াসী। তাই গঙ্গা যে মুহূর্তে বাংলাদেশের সীমানায় এসেছে সেই সময় থেকেই বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পরিচয় যথাসাধ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন কবি। অবশ্য যে ঐতিহাসিক দৃষ্টি সমস্ত ঘটনাকে কাল ও স্থানে রেখে সাজিয়ে তোলে একটি অবিচ্ছেদ্য ঘটনাস্রোত সেই দৃষ্টি সুরধুনী কাব্যের নয়। তবু বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনীর এই খণ্ড খণ্ড পরিচয়ে দীনবন্ধু মিত্রের মনোধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিম ভূদেবের হিন্দু ভারতবর্ষের স্বপ্ন শুধুমাত্র হিন্দুদেরই, যদিও বঙ্কিমের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব থেকে গেছে। হিন্দুত্বকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বঙ্কিম তাঁর স্বভাব অনুযায়ী একটি রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। দীনবন্ধু সেদিক থেকে অনেক বেশি উদারপন্থী। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত বাঙ্গালী মুসলমান ও বাংলাদেশের বাইরের মুসলমান সম্পর্কে একটু বিভেদ রেখেছিলেন, দীনবন্ধুর ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয়নি। লক্ষ্য করতে হয় সুরধুনী কাব্যের অনেক স্থান একই সঙ্গে পুরাণ কথার ও মুসলমান অধিকারে

between the Theatre and the Assembly Rooms of former days—the house of wail and woe by the side of the houses of laughter and revelry. The building is a small one, said to have formed the humble residence of an European clerk. To have penned two hundred and six human beings in the compass of this small building was by itself another Black-Hole affair. In the centre of the open compound stands the trunk of a withered tree,—the same against which the heads of children had been dashed to pieces, as the story went its round, and on which afterwards was hung many a scoundrel to pay life for life—the retribution of a madened Names is. Close by is the well into which the bodies of the murdered women and children were thrown.

Ibid, I, 341.

চিহ্নিত অথচ কবি কোথাও তাকে অস্বীকার করেননি। মুঙ্গেরের পুরানো কেল্লাটিকে জরাসন্ধের তৈরী বর্ণনা করে কবি স্বচ্ছন্দে মিরকাশিমকে দিয়ে সেই কেল্লার সংস্কার সাধন করান এবং রাজা রাজবল্লভের বন্দীদশা ও মৃত্যুর পরিচয় দেন। হিন্দু-মুসলমানের এই পাশাপাশি অবস্থানকে কবি সহজ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন মনে হয়। এই কথাটিই আরো স্পষ্ট করা চলে এ-কাব্যের পলাশীপ্রান্তর বর্ণনাকে কেন্দ্র করে। এই কাব্যের সপ্তম সর্গে গঙ্গা এসেছেন পলাশীর প্রান্তরে। সেখানে গাছের তলায় বসে 'কাঁদিতেছে কন্যা এক কল্লোলিনী কূলে'। পরমাসুন্দরী সেই নারীকে গঙ্গা জিজ্ঞাসা করলেন তার ক্রন্দনের কারণ। তখন তার লজ্জা যেন নতুন হয়ে উঠলো। সে পরিচয় দেয়—

'মোগলের রাজলক্ষ্মী পরিচয় যার
এই মাঠে হারায়েছি মুকুট আমার।'

মোগল রাজলক্ষ্মীর বিলাপ অনেকখানি স্থান গ্রহণ করলেও সেই বিলাপে মুসলমানশক্তির উত্থান-পতনের মধ্যে কবির হৃদয়ও যুক্ত হয়েছে। পরাধীনতার তীব্র বেদনা প্রকাশিত না হলেও বেদনা আছে এবং তা যতখানি ঐতিহাসিক-বোধ থেকে উত্থিত তার চেয়ে অনেক বেশি হিন্দু মুসলমানের বাংলাদেশের প্রতি অনুরাগ থেকে সৃষ্ট।

ঊনিশ শতকের নবজাগরণে যাঁরা সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ইংরেজী শিক্ষাকে গ্রহণ করে সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্য সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করা সত্ত্বেও এঁদের অনেকেই প্রাচীন বাংলাদেশের সমাজ, ধর্ম ও বিশেষ করে শিল্পকে স্মরণ করেছেন। বঙ্কিম-চন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্তর দপ্তরে' কিংবা 'সীতারাম উপন্যাসে যে বাঙ্গালী ও হিন্দু সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ ও উপন্যাসেও স্বল্প নয়। বস্তুত এই হিন্দু বাঙ্গালীর প্রাচীন ঐতিহ্যের অনেকখানিই নবদ্বীপ ও চৈতন্য সমসাময়িক কালের। দীনবন্ধু মিত্র তার সুরধুনী কাব্যে বাংলা-দেশের যে ইতিহাস স্মরণ করেছেন তার অনেকখানিই চৈতন্য সমকাল পুষ্ট। এ কাব্যে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ অজস্র স্থানে আছে। বিশেষ করে মথুরা বৃন্দাবন প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণের কথা স্মরণ করেছেন কবি। সেই পথেই অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ মন্দির বা কেন্দুবিল্ব এবং জয়দেব পদ্মাবতীর কথা উল্লেখিত। কিন্তু কৃষ্ণ-কথা ও কৃষ্ণভক্ত ছাড়াও সপ্তম সর্গে কবি যেন বিশেষ করে বর্ণনা করেছেন নবদ্বীপের উজ্জ্বল কতগুলি মানুষকে। অসাধারণ মেধাবী বাসুদেব সার্বভৌম ন্যায়শিক্ষার জন্যে গিয়েছিলেন মিথিলায়। বিদায়ের সময় সেখানকার

পন্ডিতেরা ফিরিয়ে নিল সমস্ত ন্যায়ের গ্রন্থ। বাসুদেব হেসে বলেছিলেন--

স্মরণ তুলটে মম গ্রন্থ সমুদয়
বঙ্গে গিয়ে মন খুলে করিব প্রচার
পাঠার্থে পাঠক হেথা আসিবে না আর।

এরপর গৌরাঙ্গ প্রভুর বর্ণনা। তাঁর শৈশবকালের পাঠশালায় পাঠ. প্রিয়-পরিজন ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত জীবনকাহিনী উল্লেখ করেছেন কবি। অতঃপর রঘুনাথ বা কানাভট্টের কথা,

শিশুকালে বুদ্ধিবলে হয়েছিল তাঁর
বালিতে অঞ্জলি ভরি অনল-আধার।

তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'চিন্তামণি দীধিতি'। বুৎপত্তিবাদ ও লীলাবতীকে তিনি যথাক্রমে পুত্র কন্যা বলে প্রচার করতেন। শব্দ শক্তিপ্রকাশিকার লেখক সুপন্ডিত জগদীশ টীকাকার খ্যাত গদাধর ভট্টাচার্য, বুনো রামনাথও ছিলেন নবদ্বীপে। নবদ্বীপ খ্যাত এই মানুষগুলির পরিচয় স্বল্প হলেও কবির শ্রদ্ধার দিক থেকে তা কম নয়। আর জাহ্নবীর বিভিন্ন শাখা-নদীর পথের বিবরণে এই মানুষগুলিকে স্মরণ করার প্রয়াসে কবি যেন নতুন করে এদের তুলে আনতে চান। এ পরিচয় কবির সমকালের ইতিহাসে আরো স্পষ্ট।

সুরধুনী কাব্যের দশম সর্গে কবি একই সঙ্গে ঐতিহাসিক ও সাংবাদিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর সমকালের দেশবরেণ্য প্রতিভাধরদের পরিচয় কবির প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলেই তাঁর বর্ণনার মূল্য অসীম। এই সর্গে গঙ্গা হুগলীতে এসে পেঁাচেছেন। পর্তুগীজদের তৈরী এই নগর। তাদের নির্মিত গীর্জা এবং এখানকার প্রসিদ্ধ 'এমামবাড়ির' উল্লেখ করেছেন কবি। চুঁচুড়া যেন সুরূপা নারীর ভঙ্গিমায় জলকেলির আশায় উপকূলে দাঁড়িয়ে। তার কক্ষে কাঞ্চন কলসের মত কলেজ ভবন। এই কলেজের ছাত্র দ্বারিক, বঙ্কিম। প্রথমজন উকিল শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয়জন দুর্গেশনন্দিনীর জনয়িতা। এ ছাড়া "বিশাল বারিক শোভে নিতম্বে রসনা
রণ কনসার্ট তায় কাঞ্চীর বাজনা।'

ফ্রেঞ্চদের অধিকারে আছে চন্দননগর। গভর্নর বিচারালয়, সৈন্যশালা প্রভৃতি নিয়ে চন্দননগর যেন,

ইংরাজের অধিকার পয়োধি ভিতরে
দ্বীপরূপ ফরাসীর নগর বিহরে।

শ্রীরামপুরের শোভা সুন্দর। দিনেমার নৃপতির সনদে এখানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল মিশনারীদের আদিনিকেতন এবং

সর্ব অগ্রে ছাপাখানা এই খানে হয়
মুদ্রিত হইল যাতে বঙ্গগ্রন্থচয়।

কোননগর, হালিসহর, ভাটপাড়া, ইচ্ছাপুর প্রভৃতির কথা বর্ণনার পর জাহ্নবীকে বরণ করতে এল বান। গঙ্গা যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন কলকাতার বিবরণ। পথনির্দেশক বান বর্ণনা করে কলকাতারঃ

ওই ঘুষুড়ির ট্যাক পরে কলিকাতা
অপূর্ব নগরী মরি! কে বর্ণিতে পারে
অলকা অমরাপুরী শোভা একাধারে।
বিরাজিত ঘাটে সিন্ধুপোত অগনন

বান গঙ্গাকে দেখালেন বাগবাজারের ঘাট, আহিরীটোলার ঘাট, নিমতলার সমাধি শ্মশান, সুউচ্চ পাতুরেঘাটার জগন্নাথস্থান, ট্যাকশাল, বানহৌস, মেটকাফ হল বাঙ্গালবেঙ্ক, চাঁদপাল ঘাট, ইডেন উদ্যান, গড়ের মাঠ, মনুমেণ্ট। গঙ্গা দেখলেন ভ্রমিতেছে কতলোক নানা বেশ ধরি। ঘোড়ার গাড়িতে করে যাচ্ছে সাহেব বিবি এবং কোথাও—

বিলাতী বালিকাদুটি যুবতী দুজন
বসিয়াছে গায় গায় কেহ কারো কোলে
ফুলভরা সাজি যেন মালি করে দোলে।

কোথাও দেখা যায় স্বৈরিনী আসক্ত লম্পটের ভ্রমণদৃশ্য। কবির আক্ষেপ শোনা যায়—কবে,

বেড়াবে বাঙালী বাবু গাড়িতে বসিয়ে
পতিপরায়ণা বামা বামেতে লইয়ে।

চারদিকেই সারিবদ্ধ অট্টালিকা, প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, টাউনহলের দক্ষিণে দুর্গ তার প্রশস্ত প্রাকার ও অভেদ্য দ্বার—গঙ্গা দেখলেন মনোহর যাদুঘর। সন্ধ্যে হল। 'নীলাম্বরে কনে বউ সাজিল ধরনী'। গাড়ি চলে গেল সন্ধ্যার। ঘরে ঘরে জ্বলে উঠলো দীপ। দরজায় তালাচাবি দিল সদাগর। মুটের দল গেল হাসতে হাসতে। দারোয়ানেরা পড়তে বসলো তুলসীর দোঁহা। তখন বান বলে—

দেখ গঙ্গে অপরূপ শোভা নগরীর—
জ্বলিতেছে দীপপুঞ্জ, দুলিতেছে পাখা
গ্যাসালোকে কলিকাতা যেন আভামাখা
মাঝে মাঝে পথ বয়ে আলো চলে যয়া
ঝরা তারা গতি যথা আকাশের গায়।

লালদিঘী, জ্বর হাসপাতাল, গোলদীঘি, হেয়ারের সমাধি ও হিন্দু কালেজ

দেখলেন গঙ্গা। হেয়ার ও উইলসনের ছবি দেখার পর কলেজ রত্নদের পরিচয় দিলেন বান। প্রবলরসনা রামগোপালের অসম সাহসের পরিচয় পেলেন সুরধুনী। দেখলেন মনুর ব্যবস্থা বেত্তা প্রসন্নকুমার ও সুবিজ্ঞ বিচারপতি হরচন্দ্রকে। পূর্বদিকে চোখে পড়লো দীনজন লালন পালন তৎপর বিদ্যা-সাগরকে। তাঁর মাতৃভক্তি, শাস্ত্রাচারে বিধবাবিবাহ সিদ্ধ করার কথা শুনলেন বান। 'ললিত মালতী মালা কোমলতাময়' তাঁর রচনা। সুবিজ্ঞ স্মৃতি-শাস্ত্রবিৎ ভারতচন্দ্র ও প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, কাব্য ন্যায়-সুপণ্ডিত তারানাথ ও ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক মীমাংসা, বেদান্তশাস্ত্রের পণ্ডিত জয়-নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের কথা বলে বান। বিদ্যাসাগর বন্ধু কবি মদনমোহন, বিদ্যাভূষণ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, তারাশঙ্কর, রামকমল, কৃষ্ণকমল, রাজকৃষ্ণ, মহামতি প্রমথকুমার এঁদের কথাও বান উল্লেখ করে। পূতচরিত কৃষ্ণমোহনের খৃষ্টধর্মে মতি, তাঁর নীতিগর্ভ প্রবন্ধগুলি, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও তাঁর রহস্য সন্দর্ভপত্র, ভূদেব, বান এঁদের বঙ্গ সাহিত্য সাধক বলে উল্লেখ করে। ক্ষেত্র-নাথ, শরৎ, পিয়ারীচরণ, প্যারীচাঁদ ও আলালের ঘরের দুলাল, ফীল্ড্ সম্পাদক কিশোরীচাঁদ, দক্ষিণারঞ্জন, বেথুন, পুলিশরত্ন জগদীশকে স্মরণ করে যান। মহাকবি মাইকেলের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বান। স্মরণ করে রাজেন্দ্র, কালীকৃষ্ণ, নবীনকৃষ্ণ, দুর্গাচরণ, চন্দ্রদেব, জগদ্বন্ধু, মহেন্দ্র, দুর্গাদাসকে। তারপর হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার কথা—হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর সম্পাদক হলেন কৃষ্ণদাস, বেঙ্গলীর সম্পাদক গিরিশ, ইন্ডিয়ান মিরারের ব্রাহ্মধর্মকথা, ন্যাশন্যাল পেপারের সুমিত ভাষা, ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাকর, অক্ষয়কুমারের চারুপাঠ, রঙ্গলালের কর্মদেবী ও পদ্মিনীর বর্ণনা করে বান। রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম, দেশানুরাগী ও নাট্যানুরাগী পাইকপাড়ার রাজান্বয় প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের প্রসঙ্গও গঙ্গা বানের কাছে শোনেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনুবাদ কথার উল্লেখ করে কবির রসিকচিত্ত যেন একটু অবসর খোঁজে—

রহস্য কৌতুক হাসি রসিকতা ভরা
হুতোম পেঁচার ধাড়ী পড়েছেন ধরা।

রমানাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন, রাজেন্দ্র মল্লিক, মতি শীল, বিচারপতি শম্ভুনাথ আইনজ্ঞ, রমাপ্রসাদ এঁরাও বানের কথায় উল্লেখিত। গঙ্গা দেখলেন রাম-মোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ। দেবেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, কেশব-চন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, আবদুল লতিফ এবং লালবিহারী দের কথা গঙ্গা শুনলেন বানের কাছে।

উনিশ শতকের নবজাগরণের সামগ্রিক পরিচয় এই মানুষগুলির মধ্যে

বিকশিত হয়েছিল। দীনবন্ধু মিত্র নিজেও এই নবজাগরণের এক বৃহৎ পরিচয়। সাধারণতঃ সমকাল ও সমকালের মানুষদের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা সেই কালের মানুষের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রতিভা-বানেরা এ কথার ব্যতিক্রম। দীনবন্ধুও অনুভব করেছেন ঊনিশ শতকের সদাচঞ্চল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলিকে এবং তাদের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতির মধ্যেও কবির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় স্পষ্ট। দশমসর্গে কবি বাংলা দেশের নবজাগরণের সঙ্গে যুক্ত কর্মযোগী পুরুষদের পরিচয় দিয়েছেন প্রায় সাংবাদিকের মত। এই সাংবাদিক সত্তার প্রকাশ অনেক সময়ে তাঁর কাব্যের সঙ্গতিকে নষ্ট করেছে। কিন্তু কলকাতা ও কলকাতার মানুষদের বিচিত্র পরিচয় উদ্ঘাটনের মধ্যে কবির বাঙালী মনটিও অপ্রকাশিত নয়। গোমুখীদ্বার দিয়ে যে গঙ্গা ও তার শাখা নদীগুলি উত্তর ও মধ্য ভারতে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে সমুদ্র-সন্ধান করেছে তারই শস্যসমৃদ্ধ প্রাণশক্তি যেন এই মানুষগুলির মধ্যে। ধর্ম সমাজ সাহিত্য সংস্কার ও সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বেলিত এই প্রতিভাধরদের ভীড় ঠেলে যেন গঙ্গা তাঁর সমুদ্রসঙ্গমকে খুঁজে পেয়েছেন। সুরধুনী কাব্যের সমাপ্তি তাই আধুনিক কালে, যা দীনবন্ধুর এবং হিন্দু সংস্কৃতির কাল এবং তা বাঙালী দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়ন্ত্রিত।

সুরধুনী কাব্যের একটি বড় বৈশিষ্ট্য এর কাহিনীগুলি। গঙ্গার বিভিন্ন শাখানদীগুলি জাহ্নবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের প্রবাহ পথের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছে। সমগ্র সুরধুনী কাব্যের আখ্যান অংশগুলি এই শাখানদীগুলির বিচিত্র কথায় পূর্ণ। ধর্মক্ষেত্র ও তীর্থস্থান প্রসঙ্গে এই নদীগুলির যেমন প্রয়োজন হয়েছে তেমনি প্রয়োজন হয়েছে ইতিহাস ও সমকাল স্মরণ করার ক্ষেত্রেও। দেবী সুরেশ্বরী ছাড়া অন্যান্য যে নদনদী এ কাব্যের কাহিনী গঠনে সাহায্য করেছে, তাদের মধ্যে ঘর্ঘরা, করনালী, শোন, অজয় এবং সাগরদূত বান উল্লেখযোগ্য। গঙ্গা যে বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিতা হয়েছেন প্রসঙ্গত সেই সব স্থানের পৌরাণিক, অপৌরাণিক ও সামাজিক কাহিনী কবি বর্ণনা করেছেন। লক্ষ্য করতে হয়, নদীকে আশ্রয় করে কাব্য লেখার প্রচেষ্টা যেমন অভিনব তেমনি অভিনব নদীগুলিরই সাহায্যে পুরাণ, ইতিহাস ও সম-কালকে এক সূত্রে গ্রথিত করা। আর এই গ্রন্থন সম্ভব হয়েছে কাহিনীগুলির জন্যে। এ কাব্যের প্রথম সর্গে জাহ্নবী, পদ্মা, মেনকা, হিমালয়ের কথাবার্তা আচার-আচরণেই কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে। যদিও জাহ্নবীর যাত্রাপথের কাহিনীগুলি সাধারণতঃ তার শাখানদীর এবং তার অধিকাংশই পুরাণ ও ইতিহাস-সিদ্ধ ঘটনা—তবুও সেই কাহিনীগুলির বিশেষত্ব আছে। এ কাব্যের দ্বিতীয় ও পঞ্চম সর্গে যে কাহিনী দুটি আছে তার একটি স্থান ও অন্যটি

একটি নদীর সঙ্গে যুক্ত। এ দুটি কাহিনীসৃষ্টিতে দীনবন্ধু তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। এদের পরিচয় দেবার আগে এ কাব্যের অন্য কাহিনীগুলির নামোল্লেখের প্রয়োজন আছে।

সুরধুনী কাব্যের বিচিত্র স্থান কাল পাত্রের ইতস্ততঃ প্রকাশ প্রায় সর্বত্র। তবুও এদের মধ্যে অনুপ শহর, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, বকসার, ছাপরা, মুঙ্গের, কাটোয়া, কালনা, বর্ধমান, গুপ্তিপাড়া, কলকাতা এই সব অঞ্চলকে কেন্দ্র করে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সমকালের মানুষদের যে কথা, স্মৃতি দেখা দিয়েছে তার সবটাই কাহিনী নয়। অধিকাংশ পৌরাণিক কাহিনীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে কবি যেন ইঙ্গিত করেন সেই সিদ্ধ কাহিনীগুলির প্রতি। বসুদেব দেবকী মন্দির, কংসবধ প্রসঙ্গ, রাধাকৃষ্ণের কথা, বিশ্বেশ্বরের গঙ্গা কামনা এবং অসি ও বরুণকে প্রেরণ, বিশ্বামিত্রের তপোবনে রামচন্দ্রের আতিথ্য, ঘর্ঘরার জীবনকথা, গৌতম ও অহল্যা প্রসঙ্গ, সতী গঙ্গা বা নটবর-শম্পা-পুণ্ডরীক কাহিনী, শোনের জন্ম ও অগস্ত্য কথা, জরাসন্ধ ও কৃষ্ণ-ভীমার্জুন, অজয় নদের সঙ্গে দনুজের যুদ্ধ ও দেবকন্যা উদ্ধার, সন্ন্যাসীর দেববিগ্রহ ও বর্ধমানাধিপতির কাহিনী, কুলীন ও লম্পট স্বামীর কথা, রাজা রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র ও পুত্র শিবচন্দ্রের কথা, সাবিত্রী সরলা বিরজা বিমলা এই চার কন্যার কথা ইত্যাদি কাহিনী বা প্রসঙ্গগুলিই সুরধুনী কাব্যের সামগ্রিক কাহিনী নির্মাণ করেছে।

এই কাহিনীগুলিকে প্রথমতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়—(ক) পৌরাণিক ও (খ) অপৌরাণিক। পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) ধর্মভিত্তিক লৌকিক কাহিনী বা কিংবদন্তী, (খ) সামাজিক কাহিনী, (গ) ঐতিহাসিক কাহিনী।

সুরধুনী কাব্যে অবশ্য পুরাণসিদ্ধ ঘটনা বা কাহিনীর আনুপূর্বিক বর্ণনা নেই। কবি কয়েকটি চরণেই সেগুলির বর্ণনা দিয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনীগুলির অধিকাংশই অবিকৃত হলেও কোথাও কোথাও তা নতুনভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ, এ কাব্যের তৃতীয় সর্গে বর্ণিত কৃষ্ণের দেহত্যাগের অংশটি গ্রহণ করা যেতে পারে। কবি রাধাকৃষ্ণের কথা মথুরা বৃন্দাবন প্রসঙ্গে যা স্মরণ করেছেন তা পুরাণসিদ্ধ কিন্তু রাধাকৃষ্ণের মৃত্যুর বর্ণনাটি সম্পূর্ণ কবির তৈরী। অংশটির একটু পরিচয় দিলে রাধাকৃষ্ণের প্রতি কবির রোমান্টিক দৃষ্টি অনুভব করা সম্ভব হবে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পৃথিবী তখন গভীর সুষুপ্তিতে। নিকুঞ্জ মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হল। পথে এসে দাঁড়ালেন রাধাকৃষ্ণ। রাধার মধুর মুখ মলিন, বিষাদিনী বিনোদিনীর নীল নেত্রে অশ্রুর চিহ্ন। গিরিধারীর হাত ধরে এগিয়ে চললেন রাধিকা, আঁচল লুটিয়ে পড়েছে

মাটিতে। প্রবাহিনী তটে এসে দাঁড়ালেন দুজনে। কিশোরী রাধার সমস্ত আকুতি, আর্তিকে ধর্মদর্শনের বর্মে ঢেকে কৃষ্ণ ঝাঁপ দিলেন কালীদহে আর শ্রীরাধিকাও 'পড়িল জীবন মাঝে যেন পাগলিনী'। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণ-চরিত্রে কৃষ্ণের দেহত্যাগের যে সম্ভাব্য কারণগুলি দিয়েছেন তার সঙ্গে কাব্যের পার্থক্য থাকাই সঙ্গত। কিন্তু এই কাহিনীটির যে পরিবেশ ও বিষাদময় সৌন্দর্য তা এই মৃত্যুকে রোমান্টিক মহিমা দান করে এবং কবিও যেন সচেতন-ভাবে গঠন করেন তাঁর কাহিনীকে।

দ্বিতীয় বিভাগের কাহিনীতে সামাজিক ও ঐতিহাসিক কথার পরিচয় স্বল্প এবং সেগুলিতে সাংবাদিকতার প্রকাশ আছে। কিন্তু এই বিভাগের ধর্মভিত্তিক লৌকিক কাহিনী বা কিংবদন্তী স্তরের দুটি কাহিনী সুরধুনী কাব্যের আখ্যানভাগকে অভিনবত্ব দিয়েছে। কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টিতে দীন-বন্ধুর নাটকগুলিতে যে পরিচয় আছে তা যেন এখানে কাব্যাকারে বর্ণিত। সেই দুটি কাহিনীর বর্ণনা দিলে এ কাব্যের আখ্যান বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হতে পারবে।

প্রথম কাহিনীটি অনুপ আহুতি ও ঋষি হোমানলের। দ্বিতীয় সর্গে গঙ্গা পুরাতন অনুপ সহরে উপনীত হওয়ার পর কাহিনীটি বর্ণিত। সংক্ষেপে কাহিনীটি এই :—

প্রাচীনকালে হোমানল ঋষির তপোবন ছিল অনুপ সহরে। গম্ভীর স্বভাব হোমানল ঋষির দেহ মধ্যাহ্ন মিহিরের মত তেজোময়। তাঁর কন্যার নাম আহুতি। অগ্নির মত তাঁর রূপ, বীণার মত কণ্ঠ। বেদে ছিল তাঁর বুৎপত্তি। হোমানলের মেধাবী শিষ্যের নাম অনুপচন্দ্র।

বসন্তের রাত্রি তখন শেষ হয়ে আসছে। কুমুদিনীর দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে কান্নায়। গভীর ঘুমে আহুতি অচেতন। স্বপ্নের মধ্যে ভেসে আসে যেন কার কণ্ঠ। দেবতা গন্ধর্বের চেয়েও সে সুমধুর। জেগে ওঠে ঋষি-কন্যা সেই গীতিকণ্ঠ শোনে। কিন্তু—

কি জ্বালা বলিল বালা নহে তো স্বপন
অনুপম অনুপের বেদ অধ্যয়ন।

উদাসিনী বিষাদিনী বাসি ফুলের মত হয়ে গেল আহুতি। সুনেত্রার নয়নের জল আকুল হয়ে উঠলো। মন হল অধীর, উন্মন। স্নান করেও যেন দেহ শীতল হয় না। তখন নিজেকে বিস্মৃত হওয়ার জন্যে গাঁথতে বসলো নাগ-কেশরের মালা। শেষ হলে ভাব পরিবর্তন হল কন্যার। গলায় মালা দুলিয়ে ফিরে গেলেন গৃহে।

প্রভাতের কাজ শেষ করে অনুপ বসলো পুজোয়—যেন সকালবেলার সূর্য।

এক এক করে নিবেদন করে বিল্বদল, দূর্বাদল, কুসুমচন্দন। তখন 'নাগকেশরের মালা প্রভা প্রকাশিল'। হোমানল ভয়ভীত নবীন ঋষি বিস্মিত হল —চুম্বন করলো সাদরে সেই মালাকে। প্রতিটি ফুল যেন আহুতির মুখপদ্ম।

সন্ধ্যা হয়ে এল। সোনার আতপে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠলো পৃথিবী। কচি লতাপাতা ফুল বাতাসে দুলছে—'নাচিছে ময়ূর মুখ ময়ূরী অধরে'। তখন আলবালে জল সেচনের জন্যে আহুতি গেলেন কূলের দিকে। চোখ তার সজল। কূলে এসে অবাক হয়ে দেখে অনুপ সেখানে বসে আর তার 'নাগকেশরের মালা গলে সুশোভন'। নবীন ঋষি উঠে দাঁড়ালো আহুতিকে দেখে। দুজনেই স্তব্ধ যেন অচেতন। পরে সম্বিৎ পেয়ে অনুপ বলে—

উচ্চ উপকূল পথ হয়েছে পিছল
উপরে আহুতি থাক আমি আনি জল।১

আনন্দে জল কলস নিয়ে নীচে নামে তাপস। তারপর জলপাত্র নেবার জন্যে নত হল নীলনেত্রা। ললাটে ললাটে হল শুভ স্পর্শন। চুম্বন করলো অনুপ তার অলকদাম আর অংস। ঋষিকন্যা ফিরে চললো আলবালের পথে, গলায় দুলছে নাগকেশরের মালা। তখন—

দশনে রসনা কাটি চমকি কহিল—
কেমনে কখন মালা গলে পরাইল।২

গান্ধর্ববিবাহ হল গোপনে। অন্তঃসত্ত্বা হল আহুতি। ঋষি হোমানল শুনলেন সমস্ত বিবরণ। ক্রোধে জ্বলে উঠে 'কামান্ধ কুষ্মাণ্ড কুণ্ড কিরাত কুক্কুর' বলে অনুপকে অভিশাপ দিলেন—'মর দিয়ে জাহ্নবীর আবর্ত ভিতর'। অর্ধমৃত

১। তুলনীয়ঃ

অপরাহ্নকালে—
জলসেক করিতাম তরু আলবালে,
আমারে হেরিয়া শ্রান্ত কেন দয়া করি
দিতে জলতুলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **বিদায় অভিশাপ**, (২৬শে শ্রাবণ) ১০ই মে ১৯১২।

২। তুলনীয়ঃ

চমকি মুখ দুহাতে ঢাকে শরমে টুটে মন
লজ্জাহীন প্রদীপ কেন নিভেনি সেই ক্ষণ।
*　　*　　*
শয়ন পরে লুটায়ে পড়ে ভাবিল রাজবালা
কে পরালে মালা!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সুপ্তোত্থিতা', (১৫ই জৈষ্ঠ ১২৯৯) **সোনারতরী**, ২রা জানুয়ারী ১৮৯৪।

আহুতির দিকে দৃষ্টিপাত করে তাকে 'পাতকিনী, পাপিনী, পামরি' বলে অভিশাপ দিলেন—

গর্ভিনী অনলে তোরে করিব না দান
বৈধব্য পাবন তোর করিনু বিধান।

জাহ্নবী জলে জীবন বিসর্জন করলো অনুপ। হোমানল গেলেন হিমালয়ে। শুধু শোকাকুল অপাংশুলা আহুতি বিলাপ করে ফেরে কাননে কাননে।

অনুপ যেখানে জলকলস দিয়েছিল তার হাতে সেখানে একদিন বিষণ্ন হৃদয়ে এসে বসলো আহুতি। বেদনায় ছলছল করছে চোখ। কাতর স্বরে কাঁদতে কাঁদতে অনুপকে ডাকতে থাকে আহুতি—'অভাগীরে একবার দেহ দরশন'। শোকের উচ্ছ্বাসে মনে পড়তে লাগলো মধুর মুহূর্তগুলি। তখন জল থেকে হঠাৎ দেখা দিল অনুপ—'বুকে তুলে নিল নিজ ব্যাকুলা রমণী'। তারপর—আহুতিকে নিয়ে জাহ্নবীর অতল জলে হারিয়ে গেল অনুপ।

দ্বিতীয় কাহিনীটির কথক ঘর্ঘরা। করনালী তীরে নৃশংস ধর্মহীন রাজা নটবর প্রসঙ্গের কাহিনীগত আবেদন যথেষ্ট। রাজা নটবরের রাজ্যে থাকতেন গুণবতী সম্পা। অতুলনীয় তাঁর রূপযৌবন—

মুরলী আরাব জিনি রব মনোহর—
কি শোভা সঙ্গীতে যবে কাঁপায় অধর।

রাজার পূর্বতন সেনাপতিপুত্র সুযোগ্য সৈনিক পুণ্ডরীকের সঙ্গে বিবাহ হল সম্পার। একদিন সকালবেলায় সম্পা যখন উপকূলে উপাসনারত তখন রাজা নটবর তার রূপ দেখে ব্যাকুল হলেন। উপাসনান্তে মরাল গমনে শম্পা ফিরে এলেন পুণ্ডরীকের কাছে। প্রিয়াকে সম্ভাষিত করে পুণ্ডরীক নানা উপমায়—

হৃদয় মৃণাল মম শূন্য করি প্রিয়ে
জলে ছিলে এতক্ষণ কেমনে ফুটিয়ে।
কি শোভা ধরেছ শম্পা উপাসনা করি
শুভ্র ধুতুরার মালা কুন্তল উপরি
সুষমা উপমা নাই তবু ইচ্ছা বলি
কাদম্বিনী মাঝে যেন ভাসে বকাবলী

অবশেষে পরিহাস ত্যাগ করে পুণ্ডরীক গ্রহণ করলো সম্পার হাত। কাছে বসলো শম্পা। কিছুকাল পরে পুণ্ডরীক গেলো সৈন্য নিকেতনে। একাকিনী সম্পার কাছে এল রাজার কুট্টিনী। সম্পার রূপমুগ্ধ রাজা বহুমূল্য উপহার পাঠিয়েছে তার কামবাসনা পরিতৃপ্তির জন্যে। রাজার এই বার্তা কুট্টিনী জানায়—

গোপনে রাজার সঙ্গে করিয়ে বিলাস

ভূপতি ভূপতি হয়ে রবে বারমাস
এ বারতা বিধুমুখি! কেহ না জানিবে
মম সনে কুঞ্জবনে গোপনে যাইবে।১

ক্রোধে জ্বলে উঠলো শম্পা—চোখে জল এল। কুট্টিনীকে 'কামিনীকুলের কালি কিরাত কিঙ্করি' এই গঞ্জনা দিয়ে বলে—

রাজার বড়াই তুই করিস পামরি,
আমি যে পতির সুখে রাজরাজেশ্বরী

*　　*　　*

বার হরে বারযোষা বলি বারবার
কলুষিত হইতেছে ভবন আমার

দেবতা দুর্লভ পুণ্ডরীকের মত পতি পেয়ে তিনি সহস্র রাজাকে পায়ের তলায় রাখতে পারেন তখন --

রাগত বেজির মত গরজি গভীর
ফুলাইয়ে কলেবর নত করি শির

ফিরে গেল কুট্টিনী। নিবেদন করলো রাজার কাছে সম্পার কথা। রাজা মনোদুঃখে ক্রোধে অস্থির হয়ে দূতীকে বললো পুণ্ডরীকের কাছে গিয়ে তার অভিলাষ জানাতে, বিনিময়ে তাকে প্রধান সচিবের পদ ও সহস্র মুদ্রা দেওয়া হবে। সম্পার কাছে ইতিমধ্যে নটবরের এই আচরণের কথা শুনে পুণ্ডরীক পদত্যাগ করলেন সৈনিক বৃত্তি থেকে। পুণ্ডরীক যখন এই অরাজকতার কথা চিন্তা করছে তখন এল রাজদূতী। সাহসে ভর করে সে জানালো রাজবার্তা। পুণ্ডরীক তখন —

কুলটা কুন্তল করে, জড়াইয়া ধরে
বলে তোরে থেঁতো করি আছাড়ি পাথরে।

কিন্তু স্ত্রী হত্যায় অপৌরুষ বিবেচনায় তাকে নিষ্কৃতি দিলেন। রাজা তার লাঞ্ছনার কথা শুনলো। সৈন্যদলের বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকার ফলে পুণ্ডরীককে হত্যা না করে তার যথাসর্বস্ব হরণ করলো রাজা। সর্বস্বান্ত পুণ্ডরীক করনালী তীরে নির্মাণ করলো পর্ণ কুটির আর, –

ভিখারীর বেশে তথা সম্পা ভার্যা সনে
করিতে লাগিল বাস হরষিত মনে।

১। তুলনীয় পদী ময়রানীর উক্তিঃ তোর ভাতার কোথায় তুই কোথায়, একথা কেউ জানতে পারবে না--এই রাত্রেই আমি সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো।—নীলদর্পণ, ৩।৩

বিধির বিপাক যেন এক সঙ্গে আসে। পুণ্ডরীক হলো অসুস্থ। অচেতন হয়ে 'পিপাসায় প্রাণ যায় বলে জল জল'। সেই সময় সন্ন্যাসীর বেশে এলেন সেনাপতি। সম্পাকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন যে, সেনারা রাজাকে বিনাশ করে পুণ্ডরীককে রাজা করবে এবং

রাজ কবিরাজ মাতা আসিবে এখনি
অবিলম্বে ভাল হবে ভাবী নরমনি

সান্ত্বনা দিয়ে সেনাপতি চলে যাওয়ার পর নটবরের পাঠানো দশজন দুর্বৃত্তের সঙ্গে এল কুট্টিনী। মৃতপ্রায় স্বামীকে কোলে করে কাতর স্বরে সম্পা মিনতি করলো কুট্টিনীর কাছে কিন্তু কুট্টিনী নিষ্ঠুর। নটবর সম্পাকে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো আর,

পাঠাইয়ে পুণ্ডরীকে বিজনকারায়,
রেখে দিল কেলি গৃহে মূর্চ্ছিতা সম্পায়।

সন্ধ্যাবেলায় চেতনা পেয়ে সম্পা স্বামীকে স্মরণ করে ক্রন্দন করলো বার বার। এমন সময় হীরকহার নিয়ে নটবর এল। সম্পা যেন, 'সীতা যথা হতমতি রক্ষসন্নিধান'। পাপাত্মার মুখদর্শন না করার জন্যে দুহাতে মুখ ঢাকলো সম্পা—

আতঙ্কে অবলা কাঁপি কাঁদিল কাতরে
ভুজবল্লি দিয়ে বারি অবিরত ঝরে।

নিষ্ঠুর নটবর সম্পাকে সান্ত্বনা দিয়ে হীরকহার পরিয়ে দিতে যায়। আর্তনাদ করে ওঠে সম্পা —

কোথা পতি পুণ্ডরীক প্রাণেশ আমার
নীচাত্মা নরেশ করে সতীত্ব সংহার।

এ সময় সেনাপতি অত্যন্ত দ্রুত এসে নিবারণ করে রাজাকে। ভয় দেখায় সেনাদের বিদ্রোহের। পরের দিন ক্ষিপ্ত বিহঙ্গিনীর মত সম্পা চিন্তা করছে স্বামীর কথা।

করনালী প্রতি বলে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
তব তটে সতী মরে দেখগো জননী

* * *

অনাথিনী ধর্মনাশে হয়েছে লোলুপ
এই বেলা অবলায় জলে দেহ স্থান,
নতুবা নীচাত্মা আসি বিনাশিবে প্রাণ।

এমন সময় কালান্তক যমের মত এসে দাঁড়ালো রাজা। সে বলে—

অনুমতি পুণ্ডরীক দিয়াছে তোমায়
কৃপাকরি নিজ দাসে রাখ রাঙ্গা পায়

নটবর তখন সম্পার অঙ্গস্পর্শের জন্যে এগোয়—আর্তনাদ করে সম্পা। আর,

সহসা তখনি এক বৃশ্চিক ভীষণ
ভূপ মুখে পড়ি করে রসনা দংশন।

রাজা সেদিন বিষজ্বালায় অন্যত্র যেতে বাধ্য হলেও পরের দিন আবার আসে। হাতে নিষ্কোষিত তরবারি—

বলিল পরুষবাক্যে শুনরে পামরি
হয় হত হবে আজ নয় রাজ্যেশ্বরী

*　　　*　　　*

এখন বচন রাখ তোল চন্দ্রানন
নতুবা কৃপানাঘাতে করিব নিধন।

ভূপতির ভয় প্রদর্শন হল নিষ্ফল। ক্রুদ্ধ রাজা তখন সম্পার শিরচ্ছেদে উদ্যত হল। তখনো রাজার কাম-কাতরতার প্রকাশ। সম্পা আকুল স্বরে পুণ্ডরীকে ডাকছে। তখন,

করনালী অকস্মাৎ বেগে উথলিয়া
লয়ে গেল কেলিগৃহ স্রোতে ভাসাইয়া
মরিল দুরাত্মা ভূপ-সুগভীর নীরে।

সম্পা ভাসতে ভাসতে তীরে এল। তপোবনের ঋষিরা পিতৃ স্নেহে তাকে বাঁচালেন। মন্ত্রী, সেনাপতি, সৈন্য, প্রজারা একমন হয়ে পুণ্ডরীককে বসালো সিংহাসনে। তপোবন থেকে রাজরানী হয়ে ফিরে এল সম্পা। সতী উদ্ধার করে করনালী হলেন সতী গঙ্গা।

অনুপ আহুতি কাহিনী গল্পের দিক থেকে নতুন নয়। আহুতি অনুপের ভালোবাসা ও গোপন বিবাহের ফল সন্তান সম্ভাবনা। ঋষি হোমানলের অভিশাপে গঙ্গায় ডুবতে হল অনুপকে আর আহুতিকে গ্রহণ করতে হল বৈধব্য সন্তাপ। এই বিচ্ছেদ অবশ্য পরে অনুপ আহুতির গঙ্গা অংক আশ্রয়ে মিলনেই সমাপ্ত হয়েছে। কাহিনীর আরম্ভেই আহুতি সমর্পিতা প্রাণ। 'অনুপম অনুপের বেদ অধ্যয়ন' শেষ পর্যন্ত গান্ধর্ব্য বিবাহে পরিণত। নাগকেশরের মালা গাঁথা বা জল আনার মধ্যে দুটি স্নিগ্ধ প্রাণের প্রকাশ। বাংলা মহাভারতের কচ ও দেবযানীর কাহিনীটি যেন নতুন রূপ নিয়েছে এখানে। আধুনিক বাংলা আখ্যান কাব্যে দীনবন্ধুর স্থান বিশেষভাবে স্মরণীয়। আখ্যান কাব্য রচনার ধারা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

রবীন্দ্রনাথের কচ দেবযানীর কাহিনীর সঙ্গে অনুপ আহুতির আখ্যানের বাইরের দিকের ঐক্য আছে। দুই কাহিনীতেই নায়ক গুরু গৃহে পাঠ নিতে এসে গুরু কন্যার সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদে কাহিনী শেষ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাহিনীতে সুর পৃথক, তার ব্যঞ্জনা ভিন্ন। দীনবন্ধুর কাহিনীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গে মিল নেই। মিল বহিরঙ্গের ঘটনায়।

সতী গঙ্গা বা করনালীর কাহিনী অবশ্য ভিন্ন। পুণ্ডরীক সম্পার বিবাহিত জীবনে রাজা নটবরের আকস্মিক আবির্ভাব কাহিনীকে গতি দান করেছে। রাজার ক্রোধে পুণ্ডরীক অপমানিত ও কারাগারে আবদ্ধ। সম্পাকে আনা হয়েছে, রাজার কেলি গৃহে। রাজা তার লালসা বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে প্রলোভন, অনুনয়ে ব্যর্থ হয়ে সম্পাকে হত্যা করতে উদ্যত এসময় গঙ্গা রক্ষা করেছেন সতীকে।

দুটি কাহিনী রসগত পরিণামের দিক থেকে ভিন্ন হয়েও একটি সঙ্গতিকে ধরার চেষ্টা করেছে। অনুপ আহুতির ভালোবাসায় সে স্নিগ্ধ তাপ আছে তা পুণ্ডরীক ও সম্পার জীবনে আরো পরিণত। অনুপ আহুতির ভালোবাসা আকস্মিক হলেও অসম্ভব নয়। স্বভাবতই ঋষি হোমানলের মনোভাব তাদের অজানা ছিল না। হোমানলকে আড়াল করার ফলেই যেন দুটি প্রাণের ভীরু সলজ্জ প্রকাশ ঘটেছে। অন্য পক্ষে পুণ্ডরীক জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তার বাধার পরিচয় নেই। তাদের ভালোবাসা তাই সরল, পূর্ণ এবং অবারিত। ঋষি হোমানল অনুপ আহুতির বিবাহকে স্বীকার করেন নি এবং তাঁরই অভিশাপে এদের জীবনে বিচ্ছেদ দেখা দিল। অন্য কাহিনীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে হলেও পুণ্ডরীক সম্পার স্বল্পকালের বিচ্ছেদ আছে। যদিও দুটি কাহিনীর পরিণতি মিলনান্তক।

দীনবন্ধুর প্রথম জীবনের কবিতার আলোচনায় তাঁর নাট্য প্রতিভার সঙ্গে কাব্যের যোগসূত্র লক্ষিত হয়েছে। সুরধুনী কাব্য প্রকাশের আগে তাঁর শেষ নাটক কমলে কামিনী ছাড়া অন্য সমস্ত রচনাই প্রকাশিত। কিন্তু তাঁর কাব্য ও নাটকের রূপ ও প্রকৃতি ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও জৈব শক্তির (elemental force) ক্ষেত্রে যে এদের সহধর্মিতা আছে সেকথা বলা চলে। সুরধুনী কাব্যের বিষয়-বস্তুতে, বর্ণনা কৌশলে ও হিন্দু ভারতবর্ষের পুরাণ কথা সংগ্রহে যে মন কাজ করেছে সেই মনের প্রকাশ ভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর অন্য কাব্য নাটকগুলিতে। লক্ষ্য করতে হয় সুরধুনী কাব্য প্রকাশ কালে রঙ্গলাল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের রচনা প্রকাশিত। এরা সকলেই তাঁদের কাব্যে ইতিহাস পুরাণ ও সমকালের কাহিনী ও ঘটনা গ্রহণ করেছেন। রঙ্গলালের

স্বদেশ চিন্তার তীব্রতা যে ইতিহাস প্রীতিকে তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত করেছে সেই ইতিহাসের কাব্যগত মূল্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। অথচ দীনবন্ধু সমকালের কথাসাহিত্যে ইতিহাসের প্রতিফলন অনেক সযত্নসৃষ্ট ও শিল্পরূপের অনিবার্যতাকে স্মরণ করায়। কাহিনীর দ্রুত গতি, অতর্কিত ঘটনাস্রোত এক নিবিড় রসচেতনায় যুক্ত থেকেও ঐতিহাসিক মোহের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পারে। দীনবন্ধুর কাব্যে সেই ঐতিহাসিক বোধ অথবা ইতিহাসাশ্রিত চৈতন্যের অবকাশ অল্প কেননা তাঁর কাব্যের মৌল চরিত্র গঙ্গা। যদিও কবিকে কাব্যের প্রয়োজনেই পুরাণ কথার জগৎ থেকে সরে আসতে হয়েছে কখনো ইতিহাসে, কখনো লোককথায় কখনো বা সমকালে। অনুপ আহুতির কাহিনী অথবা সতী করনালীর কাহিনীতে এমন এক চেতনা কাজ করে যে, মনে হয় দুটি কাহিনীই যেন পুরাণ সমর্থিত। অথচ এই পৌরাণিক মায়া সৃষ্টি করেও এই কাহিনী দুটিতে একটি লৌকিক সমাজচিন্তা ও গোষ্ঠীর ছবি বড় হয়ে ওঠে। একটি স্থান ও একটি নদীর কাহিনী ভূগোল, অর্থনীতি বা সমাজ বিজ্ঞানে যে পরিচয় বহন করে কাব্যে তার ব্যতিক্রমই বাঞ্ছনীয়। দীনবন্ধুও তাঁর দীর্ঘতম কাব্যে এক একটি স্থানকালের যে পরিচয় দিয়েছেন তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল লোকসমাজের শক্তিতে। লক্ষ্য করতে হয় এই সময়কার শ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদন কিংবা শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র কবিত্ব শক্তির ক্ষমতায় দীনবন্ধুর চেয়ে অনেক শক্তিশালী হয়েও তাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রকাশের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী চরিত্র কিংবা বাংলা দেশকে তেমন জীবন্ত করতে পারেন নি। তাঁর কারণ এঁদের কাব্যাদর্শ ভিন্ন এবং এঁরা দুজনেই ইংরেজী কাব্য, দর্শন, সাহিত্যের সঙ্গে দেশীয় কাব্য, দর্শন, সাহিত্যের সমন্বয় করতে পেরেছিলেন। মেঘনাদবধকাব্য তাই কাহিনীতে বাংলা দেশের পুরাণ কথা হয়েও ভাবগত ও রসপরিনতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন যেমন নতুন তিলোত্তমা, আয়েষা সূর্যমুখী, ভ্রমর, রোহিনী, প্রতাপ, ভবানন্দ। কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টির এই অভিনবত্বের আড়ালে বিদেশী প্রভাব এমন অলক্ষ্যে কাজ করেছে যে সহসা বিভ্রম হতে পারে মধুসূদন বা বঙ্কিম কাব্যের চরিত্রগুলি কতখানি দেশজ। মধুসূদনের কাব্যে যে বিস্তৃতির পরিচয় তা রামায়ণ কথার অংশ হওয়া সত্ত্বেও কবির ক্ষমতাকে তুলে ধরে। মহাকাব্যের ঘনপিনদ্ধকায়া, ঋজু প্রকাশ ভঙ্গী, ঘটনার ঘনঘটা ও রথ গজ অশ্বের শব্দে নাটকীয়তা অনিবার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিও জীবন যন্ত্রণার গভীর আত্মমর্যাদায় একই অনিবার্য শক্তিকে স্মরণ করায়। এদের কাব্য, উপন্যাসের পাশে দীনবন্ধুর কাব্যকে নিষ্প্রভ মনে হওয়াই স্বাভাবিক কেননা, তিনি গ্রহণ করেছেন এমন এক বিষয় যা সম্পূর্ণ অভিনব। গঙ্গার বিচিত্র পথে পুরাণ, ইতিহাস, লোককথার

ছায়ায় কবি কখনো কখনো তুলে ধরেছেন দু একটি ছবি। অনুপ আহুতি ও সতী করনালী এমনই দুটি উদাহরণ। আর এই লৌকিক গল্প দুটির ভিত্তি নাট্যকার দীনবন্ধুর মনোজগতের সঙ্গে অভিন্ন সত্যে যুক্ত বলে অনুমান করা যায়।

সুরধুনীকাব্যটি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের ভাষায় সম্ভবতঃ খণ্ড কাব্যের মর্যাদা পাবে।১ দুটি ভাগে ও দশটি সর্গে বিভক্ত এই দীর্ঘ কাব্যের গঠন নিশ্চিত প্রাচীন কাব্য-কলাকেই স্মরণ করায়। কিন্তু কাব্য আত্মার পরিচয় এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সে শক্তি অনুভব করলে এই কাব্যকে এক স্বতন্ত্র স্থান দিতে হয়। এ আলোচনার পূর্বে সুরধুনী কাব্যের কতগুলি শোভন চরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আলঙ্কারিক ভাষায় এগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা গেলেও এগুলির সৌন্দর্য নিশ্চিত এই নামের ওপর নির্ভরশীল নয়।

১। টল টল করে জল বিশাল নয়নে
সাগর সম্ভব বুঝি হবে বরিষনে।
২। পিঠে দোলে একাবেনী গলে মতিমালা
৩। বাসন্তী যামিনী শেষ যায় শশধর
কাঁদো কাঁদো কুমুদিনী কাঁপে কলেবর
৪। দিবা অবসান রবি ডুবিল ডুবিল
সোনার আতপে ধরা হাসিতে লাগিল
৫। নীচেয় থাকিয়ে কুম্ভ লইতে কহিল
নত হয়ে নীল নেত্রা কলসী ধরিল।
ললাটে ললাটে হল শুভ পরশন
অলকা অনুপ অংস করিল চুম্বন
৬। স্তম্ভের অদূরে ভগ্ন পৃথুরাজধানী
শোকাকুলা মরি যেন রাবনের রানী
৭। স্থির বিজলীর পুঞ্জ অনুভব হয়
৮। রাগত বেজির মত গরজি গভীর
ফুলাইয়ে কলেবর নত করি শির

১। কোন এক বিষয়ের উপর লিখিত অনতিদীর্ঘ যে কাব্য, আলঙ্কারিকেরা তাহাকে খণ্ড কাব্য বলেন। খণ্ড কাব্য মহাকাব্যের প্রণালীতে রচিত কিন্তু মহাকাব্যের সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত নহে। কোন কোন খণ্ড কাব্য মহাকাব্যের ন্যায় সর্গবন্ধে বিভক্ত নয়। আর যে সকল খণ্ড কাব্য সর্গবন্ধে বিভক্ত, তাহাতে সর্গ সংখ্যা আটের অধিক দেখা যায় না।

লালমোহন বিদ্যানিধি (ভট্টাচার্য), কাব্য নির্ণয়, ১৮৯৮, ৬।

৯। আতঙ্কে অবলা বালা কাঁদিল কাতরে
ভুঙ্গবল্লি দিয়ে বারি অবিরত ঝরে
১০। এলনা অগস্ত্য ফিরে বিষাদিত মন
বেদনায় ভুধরের ঝরিল নয়ন
সেই নয়নের জলে জনম আমার।

উদ্ধৃত চরণগুলি সুরধুনীকাব্যের অনেক শ্রেষ্ঠ চরণের কয়েকটি মাত্র। সুরধুনীকাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে এই চরণগুলির মূল্য কম নয়। লক্ষ্য করতে হয় উপমা, রূপক, সমাসোক্তি ও অনুপ্রাস অলঙ্কার এই চরণগুলির দেহ নির্মাণ করেছে। সেই অর্থে এগুলিকে বিভিন্ন আলঙ্কারিক নামে ডাকাই সঙ্গত। কিন্তু উপমা উপমায় পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক এবং সুকবির কাছে অলঙ্কারের ব্যবহার যেমন সুষ্ঠু হতে পারে তেমনি ব্যবহারিক ভাষার প্রয়োগও পাঠকের রসচেতনায় নতুন দিগন্তকে তুলে ধরতে সাহায্য করে। উদ্ধৃত চরণগুলির অধিকাংশই এই আলঙ্কারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে পাঠকের রসচৈতন্যকে জাগ্রত করতে পারে বলে মনে হয়। এর অন্তরালে কবির শব্দ সচেতনতা ও তা সাজানোর কৌশল কাজ করে। এরই ফলে আমাদের পরিচিত সংসারের ছবি হঠাৎ নতুন হয়ে ওঠে, আমাদের অর্ধপরিচিত স্মৃতি, প্রায় বিস্মৃত সংস্কার ও নিভৃত অনুসঙ্গগুলি আবার ফিরে আসে। এ পরিচয় এই চরণগুলিতে আছে।

সুরধুনীকাব্যের সঙ্গে সমকালীন কোন কাব্য গ্রন্থের তুলনা হতে পারে না। কিন্তু সমকালীন দু একটি গদ্য রচনার সঙ্গে এর গভীর মিল আছে। দশটি সর্গে বিভক্ত কাব্যটিকে পুরাণ ইতিহাস ও সমকাল উপজীব্য বিষয়। কবি যেন গঙ্গার প্রবাহ পথ ধরে তার শাখানদীগুলির পরিচয় দিয়ে গোমুখী দ্বার থেকে এসে পেঁাচেছেন সমকালে। স্বভাবতঃই এ কাব্যকে তাই এক ধরণের ভ্রমণ কথার মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। ঐতিহাসিক, সমকাল ও পুরাণকে একত্র গাঁথার এই অভিনব চেষ্টায় কবির অনুভূতি ও কল্পনাশক্তি যথেষ্ট সক্রিয়। এ সময়ে লেখা দু একটি জীবনী গ্রন্থে বিশেষকরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫) আত্মজীবনীতে ভ্রমণের পরিচয় আছে। কিন্তু তা নিতান্তই ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথের। অবশ্য আত্মজীবনী গ্রন্থে অন্য প্রসঙ্গের আকাঙ্ক্ষাই অনুচিত। তবু তাঁর গ্রন্থে হিমালয় যাত্রার পরিচয় পাঠককে অপরিচিত দেশ সম্পর্কে এক নতুন স্বাদ দেয়। ভ্রমণ কথা বা ভ্রমণ সাহিত্যে নতুনত্বের চিহ্ন থাকা স্বাভাবিক। দীনবন্ধুর সরকারী কর্ম-জীবনের বহু পরিবর্তন, কবিকে বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে পরিচিত করতে যেমন সাহায্য করেছে তেমনই তাঁর অন্তর্নিহিত ভাবশক্তি বিভিন্ন স্থানগুলির আত্মশক্তিকে জানারও চেষ্টা করেছে। সমকালের

শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরদের সঙ্গে তার পরিচয়ও তাঁর কল্পনাকে বিস্তৃত করেছিল সন্দেহ নেই। এছাড়া দীনবন্ধুর প্রতিভায় এক সাংবাদিক মনের পরিচয় আছে যা তার কাব্যে নাটকে প্রকাশ পেয়েছে এবং অনুমান করা চলতে পারে যে কবি ঐ সময়ে প্রকাশিত ভ্রমণ সাহিত্যগুলির সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। দুটি গ্রন্থের উল্লেখ সুরধুনী কাব্য পাঠে সহায়তা করতে পারে। দুটিই ইংরেজী ভাষায় লেখা গদ্য ভ্রমণ কথা। এদের একটির সঙ্গে সুরধুনীকাব্যের আশ্চর্য ঐক্য আছে।

প্রথম গ্রন্থটির নাম Moorcraft and Trebeck's Travels১, এই গ্রন্থের ভ্রমণ বৃত্তান্ত অবশ্যই গঙ্গাকে কেন্দ্র করে নয় যদিও প্রয়োজন মত গঙ্গার পরিচয় এ গ্রন্থে আছে। যে বিস্তৃত ভূভাগ লেখকদ্বয়ের দৃষ্টিতে এসেছে তাদের পরিচয় দেবার স্বভাব বা ধর্মের সঙ্গে সুরধুনী কাব্যের মিল আছে। দীনবন্ধু তাঁর কাব্যে প্রসঙ্গত কোন স্থান বা অঞ্চলের পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক পরিচয় দিতে গিয়ে হঠাৎ যেন বর্তমানের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিপাত করেছেন। পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী দীনবন্ধুর সাংবাদিক মন সেই মুহূর্তে সচেতন হয়ে গ্রহণ করেছে চার পাশের হাট, মাঠ ও অন্যান্য দিককে। যদিও তাঁর কাব্যের সৌষ্ঠব এতে বাড়েনি কিন্তু ইতিহাস ধরা দিয়েছে। সুরধুনী কাব্যের বিভিন্ন সর্গে এমন অনেক বর্ণনা আছে যা কাব্যের সঙ্গে যুক্ত নয় কিন্তু ভ্রমণকারীর মনোজগতের সঙ্গে যুক্ত। Moorcroft and Trebeck's Travel গ্রন্থের সঙ্গে এই দিক থেকে সুরধুনী কাব্যের মিল আছে। উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করা যেতে পারে। সুরধুনী কাব্যের চতুর্থ সর্গে গঙ্গা উপনীত হয়েছে গাজিপুরে। নগরটি সুন্দর। কুসুমকাননে শোভিত। এর পরবর্তী অঞ্চল বক্সার। গাজিপুরের কোন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা লৌকিক কাহিনী কবি দেননি। অথচ গাজিপুরের মহাজনদের ব্যবসা সম্পর্কে কবি বর্ণনা করেছেন।

মহাজনগণ করে নানা ব্যবসায়
আপনে রয়েছে থান গাদায় গাদায়
রহিয়াছে স্তূপাকারে লবণ কলাই,
কত যে চিনির কুঠী সংখ্যা তার নাই,

১। *Travels in Himalayan Provinces of Hindustan and the Punjab · in Ladakh and Kashmir; in Peshawar, Kabul, Kunluz and Bokhara* by William Moorcroft and Mr. George Treveck. From 1819-1825, I, London.

চলিতেছে, অবিরাম চিনিকরা কল,
প্রসব করিছে চিনি অতীব ধবল
ঢালিয়ে রেখেছে চিনি ভরিয়ে প্রাঙ্গণ
বালিয়াড়ি সিন্ধুতীরে দেখিতে যেমন।১

মহাজন ও তাদের ব্যবসার পরিচয় কাব্যের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় কিন্তু ভ্রমণকারীর চোখে তার মূল্য আছে। Moorcroft and Trebeck's Travel গ্রন্থে এমন নানা বিষয়ে বর্ণনা আছে যেগুলি ভ্রমণ কথায় অপরিহার্য। বস্তুতঃ ভ্রাম্যমানের চেতনায় যে ছবিগুলি উজ্জ্বল তা নিতান্তই ব্যক্তিগত অনুভবের। দীনবন্ধুর কাব্যে যে ভ্রাম্যমাণের ও সাংবাদিকের পরিচয় আছে তা অনেক ক্ষেত্রে কাব্যকে ম্লান করেছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি২ অনেক বেশি সুপরিচিত ও পঠিত। ভোলানাথচন্দ্রের Travels of a Hindoo ঊনিশ শতকের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী সমাজের বিস্তৃত পরিচয় ছাড়াও এই গ্রন্থটিতে ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় আছে। এ গ্রন্থের ভূমিকাকার J. Talboys Wheeler-এর ভাষায়—"The travels of the Babu in India are not the sketchy production of a European traveller, but the genuine *bonafide* work of a Hindoo wanderer, who has made his way from Calcutta to the Upper Provinces, and looked upon every scene with Hindoo eyes, and indulged in trains of thought and association which only find expression in Native society, and are wholly foreign to European ideas. European readers must be

১। তুলনীয়ঃ The road along the north or right bank of Alakananda was nothing more than a narrow, rugged, and undulating footpath. At this distance of rather less than two miles it was crossed by the Dundu, a small and shallow rivulet, which rises at Dunsir, about ten miles distant, in a north-easterly direction. A mile and a half further, the road led through a small town, called Muletha, the lands of which between the town and the river, were industriously cultivated with wheat, sugar-cane, tobacco and onions, arranged in terraces, and partly enclosed by dry wattled fences."

Moorcrofts and Trebeck's Travels.

২। Chunder, Bholanath. *The Travels of a Hindoo to various parts of Bengal and Upper India.* London, 1869 (Two Vols).

generally aware of the limited character and scope of the information which is to be obtained from the ordinary run of European travellers of India; the descriptions often very graphic, of external life; the appreciation of the picturesque in external nature, the perception of the ludicrous in Native habits, manners, and sentiments; and a moral shrug of the shoulders at all that is strange, unintelligible, or idolatrous:—all, however, combined with an utter want of real sympathy with the people, or close and familiar acquaintance with their thoughts and ways...... Our traveller perhaps does not tell us all he knows. Probably, like the candid old father of history, he has been fearful of medling too much with divine things, lest he should thereby incur the anger of the gods. But so far as he delineates pictures of Indian life and manners, and familiarizes his readers with the peculiar tone of Hindoo thought and sentiment, his travels are far superior to those of any writer with which we have hitherto become acquainted."

ভোলানাথ চন্দ্রের গ্রন্থটি সেকালের স্বদেশী ও বিদেশী মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। এই গ্রন্থে কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত যাত্রার কাহিনী আছে। ফলতঃ বাংলাদেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থানগুলি ও শ্রুতকীর্তি মানুষদের পরিচয় এ গ্রন্থে দেখা দিয়েছে। সুরধুনী কাব্যে গোমুখীদ্বার থেকে কবি বাংলাদেশে এসেছেন, আর ভোলানাথ চন্দ্রের গ্রন্থে বাংলাদেশ থেকে উত্তর ভারত পর্যন্ত যাত্রার কথা বর্ণিত হয়েছে। ভোলানাথ চন্দ্রের অসাধারণ শিক্ষা পাণ্ডিত্য ও ঐতিহাসিক অনুরাগ তাঁর গ্রন্থকে বিদগ্ধ-সমাজে পরিচিত করতে সাহায্য করেছে। সুরধুনী কাব্য পাঠক বাংলা-দেশের সমাজ, ধর্ম সংস্কৃতির অনেকখানি কৌতূহল এই গ্রন্থ থেকে নিবারণ করতে পারে। সুরধুনী কাব্যের বিভিন্ন স্থান ঘটনা ও কাহিনীর মিল এই ধরনের যে কোন ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থেই সম্ভব। আর যেহেতু এই গ্রন্থ একক মানুষের রচনা তাই ভ্রমণ কথার মধ্যেও একটি হিন্দুর সশ্রদ্ধ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে যা সুরধুনী কাব্যেরও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

বঙ্কিমচন্দ্র সুরধুনী কাব্য সম্পর্কে লিখেছিলেন—"ইহাও প্রচার না হয়, আমি এমত অনুরোধ করিয়াছিলাম, আমার বিবেচনায় ইহা দীনবন্ধুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই। বোধ হয় অন্যান্য বন্ধুগণও এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

এইজন্য ইহা অনেকদিন অপ্রকাশ ছিল।"১ সুরধুনী কাব্যের হাস্যরসের অভাব যে এই কাব্যকে জনপ্রিয় করেনি সে সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের কাব্য-নাটকে হাস্যরসের প্রাচুর্য তার রচনাকে লোকপ্রিয় করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, হাস্যরস-বিহীন কাব্য অকাব্য। বস্তুতঃ কবির ব্যক্তিত্ব যদি বিশেষ কোন রসচৈতন্যের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হতে পারে এবং কাব্য-কল্পনার সুউচ্চ শিখরে যাবার শক্তি তাঁর থাকে তবে নিশ্চিত তিনি তাঁর কল্পনাকে পাঠকের মনোজগতে পেঁৗছে দিতে পারেন। দীনবন্ধু মিত্র এমন এক সময়ে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন যেকালের কাব্য-আত্মার সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে একাত্ম করতে পারেন নি। মধুসূদনের কাব্যে বা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এই শিল্প-চৈতন্য কাজ করেছে। ঊনিশ শতকের মানসিক উপপ্লব ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতি, ভাবনা সম্পর্কে স্থির লক্ষ্যের পক্ষে অগ্রসর হতে পেরেছিল। বুদ্ধি ও যুক্তির স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি সুদৃঢ় হয়েছিল। কাব্যে উপন্যাসে এই ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়েও তুলে ধরেছিল নিভৃত চিন্তা, অনুসঙ্গ, ধ্যান-ধারণাকে। এদের প্রকাশ-ভঙ্গীতেও নতুনত্ব আছে। এই চমক নিশ্চিত সব নয় বরং যে জীবনদর্শন ও জীবন-রহস্য মধুসূদন বা বঙ্কিমের কাব্যে উপন্যাসে ধরা দিয়েছে তা আত্মিকশক্তির অধিকারী বলেই এত দৃঢ়। মধুসূদন বঙ্কিম সমসাময়িক অধিকাংশ কবি ঔপন্যাসিক তাঁদের কাব্য ক্ষেত্রে নিতান্ত ম্লান এই কারণে যে, তাঁরা অনেক সময়ই তাঁদের ক্ষমতার বাইরে গেছেন। সুরধুনী কাব্যের বিপুল সম্ভাবনার অনেকখানিই এই অভাববোধকে স্মরণ করায়। দীর্ঘ দিন ধরে লিখিত হয়েছে এই কাব্য। পুরাণ ইতিহাস ও সম-কালকে এক সূত্রে গাঁথার জন্যে কবি গ্রহণ করেছেন গঙ্গাকে। কিন্তু পুরাণ ইতিহাস ও সমকালের গঙ্গা পৌরাণিককালেই তাঁর প্রবাহ-পথ খুঁজে পেয়েছেন। অবশ্য এই কালগত ঐক্য না থাকায় কাব্যের কোন গভীর ক্ষতি হয়নি। বস্তুতঃ গঙ্গা ও তাব শাখা নদীগুলিকে কেন্দ্র করে কবি যে পুরাণ, ইতিহাস ও সম-কালের বর্ণনা করেছেন তার সমস্ত উপকরণগুলির প্রতি কবি-ব্যক্তিত্ব সমান-ভাবে কাজ করেনি। কোথাও পৌরাণিক কাহিনী এবং ঘটনা, কোথাও লোক-শ্রুতি, কোথাও ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা কবিকে আন্দোলিত করেছে। আবার দেখা গেছে সমকাল। এই বিচিত্র পথের অজস্র বৈচিত্র্যের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। কবির বর্ণনায় এই সঙ্গতি অনেক স্থানেই আছে।

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, **রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা** ১৮৭৭।

দীনবন্ধু সুরধুনী কাব্যের আখ্যাপত্রে কোলরিজের কবিতা সংক্রান্ত একটি উক্তির উল্লেখ করেছেন। সমস্ত কবি-প্রাণেরই একই কথা। দীনবন্ধুর ব্যক্তি-জীবনের দীর্ঘ প্রবাসবাস ও বিস্তৃত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সুরধুনী কাব্যের মধ্যে আছে। লক্ষ্য করতে হয় রঙ্গলাল হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র বর্তমান কালে আর তেমন সমাদৃত নন অথচ এক সময়ে এঁরা কাব্যক্ষেত্রে যথেষ্ট সাড়া তুলেছিলেন এবং কবি-প্রাণতার পরিচয়ও এঁদের মধ্যে যথেষ্ট। আসলে কালগত ভূমিকায় দাঁড়িয়ে ওঁরা সার্থকভাবে সমসাময়িক কাব্য-জীবনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু কল্পনার যে বিস্তৃতি ও গভীরতা কাব্যকে সুষমা দান করে, জীবন-রহস্য সন্ধানে যে দৃষ্টি কবিকে পূর্ণতা দেয় এবং যে অভিজ্ঞতা জীবনের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করে সৃষ্টিকে প্রজ্ঞায় রূপদান করে তোলে তা এঁদের কারুরই ছিল না। কাব্যের ক্ষেত্রে দীনবন্ধু এঁদেরই সগোত্র।

সুরধুনী কাব্যকে প্রকাশকাল থেকেই প্রায় অগোচরে থাকতে হয়েছে। সমকালীন সাহিত্য-চিন্তার সঙ্গে যুক্ত থেকেও দীনবন্ধু নতুন আঙ্গিক এবং ভাবনাকে তেমন গভীরভাবে কাব্যে গ্রহণ করেন নি। এমন একটি মানুষের পরিচয় এই কাব্যে আছে যা বিচিত্র শিল্পবোধ ও সংস্কারের সঙ্গে জড়িত। কাব্যারম্ভে কথক হিসেবে গ্রহণ করেছেন তিনি বীণাপানিকে। গ্রহণ করেছেন সংস্কৃত ও মঙ্গলকাব্যের বর্ণনাকে। একটি সশ্রদ্ধ হিন্দুর চরিত্র নতমস্তক হয়েছে তীর্থস্থান আর দেবালয় বর্ণনায়। আবার এখানেই ইংরেজী শিক্ষা, সভ্যতা হিন্দুত্বের অভিমান, সমকালীন প্রতিভাবানদের স্বীকৃতিযুক্ত। পুরাণ, ইতিহাস ও সমকাল বর্ণনার মধ্যে 'সরলা বিমলা বিরজা সাবিত্রী' এই চার কন্যার অপ্রাসঙ্গিক অথচ সুন্দর বর্ণনা স্থান পেয়েছে এই কাব্যে। লক্ষ্য করতে হয়, এ কাব্যের বিস্তৃতি শুধু ভূখণ্ডের দিক থেকেই নয়, কালগত দিক থেকেও। পুরাণ, ইতিহাস ও বর্তমানকে মিশিয়ে নেওয়ার জন্যে কবির আয়াসও যথেষ্ট। অথচ কবির ইতিহাস-প্রীতির সঙ্গে ঐতিহাসিক-বোধ না থাকার ফলে কবি কোন ঐতিহাসিক সত্যে যেতে পারেন নি। গোমুখীদ্বার থেকে যে গঙ্গাকে তিনি তাঁর কাব্যে বাংলা দেশে উপস্থিত করেছেন সেই গঙ্গা নিতান্ত বর্তমান কালের পরিচ্ছেদে শোভিতা। বস্তুতঃ প্রাণের দিক থেকে তিনি সমস্ত দৈবী মহিমা ও ঐশ্বর্যচ্যুতা বাঙ্গালী গৃহবধূ। সুরধুনী কাব্যের শেষ অংশে সুন্দর বনে উপস্থিত হয়েছেন দেবী সুরেশ্বরী। সেই নিবিড় অরণ্যে 'একাকিনী নারায়ণী কাঁদিতে লাগিল।' পরে কালু রায় দক্ষিণ রায়ের পূজা দান করে,

'মলিন হৃদয়ে গঙ্গা চলিতে লাগিল'।
গঙ্গা সাগরেতে পরে আসি উতরিল,
পরি তথা শাঁখা শাড়ী সিন্দূর চন্দন,

হাস্য মুখে সাগরে করিল আলিঙ্গন।

গঙ্গার এই মূর্তিই কবিকে আন্দোলিত করেছে। বস্তুতঃ সুরধুনী কাব্যের প্রথম সর্গে হিমালয়, মেনকা, পদ্মা ও গঙ্গার বর্ণনায় কবি যে সুযোগ গ্রহণ করেছেন তা সম্ভব হয়নি অন্যান্য সর্গে। হিমালয় মেনকার একমাত্র কন্যাকে গৃহের মধ্যে যেভাবে দেখা যায় ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূভাগে তাদের অন্য পরিচয় স্বাভাবিক। দীনবন্ধু মিত্র সুরধুনী কাব্যের সেই সমস্ত স্থান-গুলিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেখানে গঙ্গা ও তার সহচর-সহচরীরা মানব-মানবীর রূপে দেখা দিয়েছে। অন্য অংশের পথ-বর্ণনার মধ্যেও মানবিক আবেদন যথেষ্ট কিন্তু কবির গ্রহণ-বর্জনের ক্ষমতা অন্ততঃ একালে খুব প্রশংসা পাবে না। বস্তুতঃ দীনবন্ধুর এই বর্ণনা-বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই কাব্যের সঙ্গতিকে নষ্ট করেছে। কানপুর থেকে কটলি নির্মিত খাল, বৃন্দাবনের হনুমান বর্ণনা, পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চল সম্পর্কে পদ্মার ভাষণ, কাটোয়ার কাষ্ঠভাষা, বিভিন্ন স্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি অংশগুলি কাব্যের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও স্থান পেয়েছে।

কিন্তু এই সমস্ত দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সুরধুনী কাব্যের সৌন্দর্য কম নয়। কবি তাঁর কাব্য উৎসর্গ করেছিলেন সহোদরপ্রতিম মহেন্দ্রলাল সরকারকে।১ মহেন্দ্রলালের মধ্যে কবি লক্ষ্য করেছিলেন নানারূপ মহত্বের চিহ্ন। কিন্তু এই গ্রন্থ উৎসর্গ করার পেছনে সেই মহৎ মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানানো ছাড়াও অন্য সত্য কাজ করেছে। সুরধুনী কাব্য একই আধারে পুরাণ, ইতিহাস ও সমকাল বর্ণনায় একটি বাঙ্গালীর পরিচয় উপস্থিত করে। ঊনিশশতকের নবজাগরণবুদ্ধ সংবেদনশীল একটি কবিপ্রাণের ইতিহাস এই কাব্যে আছে। দীনবন্ধু মিত্রের কাব্যনাটকে সেই বাঙ্গালীমন কাজ করেছে যা সেই শতকের

১। দীনবন্ধু মিত্রের পৌত্র শ্রীতপাইচাঁদ মিত্র মহাশয় বর্তমান লেখককে লিখে-ছেন (১৭ই জুন ১৯৬৫) 'আমার পিতা ৺ললিতচন্দ্র মিত্রের নিকট হইতে আমার পিতামহ (দীনবন্ধু মিত্র) ও তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সম্পর্কে অনেক গল্প শুনিয়াছি। দীনবন্ধু মিত্রের উদার হৃদয় ও সদাস্ফূর্ত প্রফুল্লময় পরিচয় ঐ গল্প-গুলির প্রাণ। ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত দীনবন্ধুর আন্তরিক সম্প্রীতি ছিল। এই প্রীতির পরিচয় তাঁহাকে সুরধুনী কাব্য উৎসর্গ করা। দীনবন্ধু চরিত্রে যে নির্মল হাস্যরসের অফুরন্ত প্রাচুর্য ছিল, তাহা বিস্ময়কর। মহেন্দ্রলাল সরকার সম্পর্কে একটি গল্প আছে, যাহা দীনবন্ধু ও মহেন্দ্রলাল উভয় ব্যক্তিত্বকেই মুহূর্ত-মধ্যে দেদীপ্যমান করিয়া তোলে। গল্পটি এইরূপঃ কোন সময়ে মহেন্দ্রলাল সরকারের নিকট একজন অসুস্থ লোক আসেন। ডঃ মহেন্দ্রলাল তাহাকে যথাসম্ভব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাহার কোন শারীরিক অসুখ নাই। তখন তিনি সেই ভদ্র-লোককে প্রেসক্রিপসান দিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, তুমি দীনবন্ধুর সঙ্গ কর।'

সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত একটি বাঙ্গালী, সামাজিক তীব্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করেছে। আর বাঙ্গালী চরিত্রের সঙ্গে মাতৃ-মূর্তির যে গভীর যোগ, তাই তাকে একথা শিখিয়েছে যে, জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী। দীনবন্ধু মিত্রও যেন এই সত্যকে অবলম্বন করে নবজাগ্রত চেতনায় প্রাণবন্ত হয়ে ঊনিশ শতকের সমস্ত বিরুদ্ধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অনুভব করেছেন বাঙালীর প্রাণ-শক্তিকে তার চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে। অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র হিসাবে কবি যেন খুঁজে পেয়েছেন একটি মাত্র প্রবাহকে। তাই পুরাণে এসে সন্ধান করেছেন তার উৎসমুখ—ইতিহাসে ব্যপ্ত হয়েছেন দেশকালে আর বর্তমানে অনুভব করেছেন গঙ্গার সেই কুলপ্লাবী স্রোতধারার আশ্চর্য ফসলকে। ঊনিশ শতকের বাংলাদেশ তারই মূর্তরূপ। দীনবন্ধু তাই সুরধুনী কাব্যে যেন হিন্দু ভারতবর্ষ ও তার সার্থক উত্তরাধিকারীদের খুঁজে পেয়েছেন। এই ঐতিহাসিক পরিচয় যেমন সুরধুনী কাব্যের এক বৈশিষ্ট্য তেমনি আর এক বৈশিষ্ট্য এর অভিনব কাব্যবস্তু।

দীনবন্ধু মিত্রের গদ্য-রচনা

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলীর (১) দ্বিতীয়-খণ্ডে সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত অথচ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত, দীনবন্ধুর গদ্য-পদ্য রচনাগুলি 'বিবিধ ঃ গদ্য-পদ্য' নামে সংগৃহীত হয়েছে। এই রচনাগুলির অধিকাংশই তাঁর ছাত্রাবস্থার। দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম জীবনের কবিতা অধ্যায়ে এই রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়েছে। 'বিবিধ ঃ গদ্য-পদ্য' সংগ্রহের অধিকাংশ রচনা পদ্য হলেও দুটি গদ্য রচনা, কয়েকটি কবিতার আংশিক গদ্যভাগ পূর্বে আলোচিত হয়নি। দীনবন্ধু মিত্রের এই গদ্য রচনাগুলির সংখ্যা মোট সাতটি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর দশম সংখ্যক গ্রন্থে এই রচনাগুলির ছ'টির প্রকাশকাল আছে। এগুলিকে কালানুযায়ী সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

১। কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ। চোকে আঙগুল দিয়া বুঝাইয়া দিই. সংবাদ প্রভাকর, ৯ই আগষ্ট, ১৮৫৩।

২। কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ। হাতে হাতে পাপের ফল, সংবাদ প্রভাকর ১৮ই নভেম্বর, ১৮৫৩।

৩। **বিধবার বিবাহ**, সংবাদ প্রভাকর, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬।

৪। **বিধবার বিবাহ**, সংবাদ প্রভাকর, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬।

৫। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ, বঙ্গদর্শন, কার্তিক, ১২৭৯, (১৮৭২)।

৬। পোড়া মহেশ্বর, মধ্যস্থ, ১৮ই, ২৫শে কার্তিক ও ২রা অগ্রহায়ণ ১২৭৯ (১৮৭২)।

৭ **জনক-জননীর স্নেহ** ... ... ।

দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর দশম সংখ্যক 'বিবিধ ঃ গদ্য পদ্য' সংগ্রহের সূচীপত্রে তিনটি রচনা স্থান পেয়েছে। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ, পোড়া মহেশ্বর ও কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। এই তিনটি রচনার শেষ লেখাটিকে সাধারণভাবে গদ্য ব'লতে আপত্তি আছে। এটি নাটকের ঢং-এ লেখা একটি ব্যঙ্গচিত্র। নাটকের মতই দৃশ্যবিভাগ ও নাটকীয় চরিত্রের সংলাপ এতে আছে। স্বভাবতঃই আঙ্গিকের দিক থেকে এই জাতীয় রচনার স্থান ভিন্ন। আমাদের বিবেচনায় 'কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ'কে দীনবন্ধু মিত্রের গদ্য রচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ ও পোড়া মহেশ্বর ছাড়াও দীনবন্ধুর ছাত্র-জীবনের কবিতাগুলিতে গদ্য অংশ দেখা গেছে। এই লেখাগুলি মূলতঃ

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড) (১৩৫১) ১৯৪৪।

বতারহ অংশ। কোথাও কবিতার মুখবন্ধ হিসাবে কোথাও উপসংহার হিসাবে, আবার কোথাও পত্রের আকারে এগুলি প্রকাশিত। দীনবন্ধুর প্রথম জীবনের কবিতা আলোচনায় এই কবিতা সংযুক্ত গদ্য লেখাগুলি সম্পর্কে আলোচনা হয়নি। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ ও পোড়া মহেশ্বর পরিণত কালের দুটি সম্পূর্ণ গদ্য রচনা—তাঁর ছাত্রাবস্থায় লেখা 'গদ্য-পদ্য'-এর লেখা গদ্যর মত নয়। দীনবন্ধুর ছাত্রাবস্থার এই গদ্য রচনাগুলির পরিচয় সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণযোগ্য।

'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ। চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিই' ও 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ। হাতে হাতে পাপের ফল' এই দুটি কবিতার ভূমিকা ও উপসংহার হিসাবে গদ্য-রচনার প্রকাশ। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারীর সঙ্গে কবিতা-যুদ্ধের পরিচয় এতে আছে। প্রথমে কবিতাটির গদ্য অংশে দ্বারকানাথ অধিকারীর প্রতি ব্যঙ্গ তেমন তীব্র নয়—'নির্মলবর্ণা সরলতাদেবীর পবিত্র ক্রোড়ে শয়ন পরায়ণ হইয়া তদীয় প্রাণাধিক প্রাণপুত্র সরল কবি স্তন্যপানে নম্রতারূপ পয়ঃপান করিয়া মাতৃস্তন্য প্রদর্শনপূর্বক সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছিলেন।' সরলকবি মায়ের অনুপস্থিতিতে বিমাতা হিংসার প্ররোচনায় ও মন্ত্রণায় একটি অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করে প্রকাশ করলেন। 'সরলকোল ছাড়িয়া গরলকোলে আইলে শিশুব নাম সরলকবির পরিবর্তে বুনো কবি হইল।'

দ্বিতীয় কবিতাটির গদ্য উপসংহার অংশে দ্বারকানাথ অধিকারীর প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তীব্র ও তিক্ত। এই কবিতার রাজকন্যা চণ্ডলার কোটালের সঙ্গে অবৈধ প্রণয় ও পরে স্বামী হত্যার কথা বর্ণিত। কামোন্মত্ত চণ্ডলা স্বহস্তে পতির শিরশ্ছেদ করে কোটালের সঙ্গে অন্যত্র যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পথে কোটাল ছলনার আশ্রয় নিয়ে তাকে সম্পূর্ণ নিরাভরণ ও নিরাবরণ করে ত্যাগ করে। রাজকন্যা যখন নদীতে নিজের লজ্জা সম্বরণ করে দাঁড়িয়ে, তখন এক শৃগাল এসেছিল মাংসখণ্ড নিয়ে। জলে মাছ দেখে সে মাংসখণ্ড পরিত্যাগ করে নদীতে নামলো। নকুল এসে নিয়ে গেল তার মাংসখণ্ড—আর মাছ হারিয়ে গেল গভীর জলে। রাজকন্যা শৃগালকে ব্যঙ্গ করেছিল 'একুল ওকুল তব গিয়েছে দু-কুল'। শৃগাল তাকে এই কথা বলেছিল—'আত্মচ্ছিদ্রং নজানাসি পরচ্ছিদ্রানুসারিণী। জার স্বার্থে পতিং হত্বা জলে তিষ্ঠসি নগ্নিকা।' কবিতাটির গদ্য উপসংহার অংশে কবি, 'আমার দিগের বুনো কবিটি প্রায় চণ্ডলাব মত চপল' বলে আরম্ভ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই রচনাটি একটি পত্র-বিশেষ। দ্বারকানাথ অধিকারীর সঙ্গে দীনবন্ধুর বাক্‌যুদ্ধের তীব্রতা এখানে প্রকাশিত। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অংশ উধৃত ক'রলে এই দুই কবির কলহ

এবং মানসিকতা স্পষ্ট হতে পারে।

"কবিবর এরূপ কলহ করিতে আমাকে নিরস্ত হইতে লিখিয়াছেন। সুখের বিষয় বটে, কিন্তু তিনি কি জানেন না যে, আমি অনেকদিন 'বিবাদ বাড়বানলে সরলতা সলিল' সেচন করিয়াছি, তাঁহার তো উপদেশ নয় উপদেশছলে গায়ের ঝাল মিটান। গালাগালির সহিত উপদেশ প্রদান করা কিরূপ সভ্যতা তাহা 'অসভ্য' কিরূপে বুঝিতে পারিব। একজন সভ্য সুবাণীর পুত্র রস আকাঙ্ক্ষায় বলিয়াছিল 'কালা শিউলি রস দিবি', তাহাকে শিউলি উত্তর করিল, 'আহা! যে মধুর বচন, রস ছেড়ে গুড় দিতে ইচ্ছা করে।"

"হে অধিকারী মহাশয়, যদ্যপি বিবেচনা করিয়া দেখেন তবে আমি কখনই মা-মাসী তুলিয়া গাল দিই নাই, বরং আপনি এবিষয়ে দোষী হইয়াছেন, যেহেতু বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে 'আয়াসের ছেলে' বলিয়া আপনার কুচ্ছনৈপুন্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আপনার পক্ষে এসকল অতি সহজ কথা, কেন না আপনি যাহার গর্ভজাত বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে, বোধ করি এই ভ্রমকূপে নিপতিত হইয়াছেন।"

"আপনার অল্প বয়সে এত আত্মাভিমান কেন, ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। তুমি কি বিবেচনা করিয়াছ, তুমি সূর্য আমি রাহু, আপনার কি নিশ্চয় বোধ হইয়াছে আমি নীচ আপনি সুবোধ, মহাশয় কি যথার্থ জানিয়াছেন মাদৃশ লোকের আপনার যোগ্য নয়। এসকল জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্নে আপনার দৃঢপ্রত্যয় হইয়া থাকিবে নতুনা সাধারণ পত্রে প্রকাশ করিতেন না।

..এই সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহার গালাগালির উত্তর না দিয়া তাঁহার সদুপদেশ অবলম্বন করিলাম, কারণ তাঁহার মন্দ কথায় রাগান্ধ হইয়া যদ্যপি সৎকথা না শুনি তবে Shakespeare আমাকে বলিবেন, "You are one of those, that will not serve God, if the devil bid you."

'হাতে হাতে পাপের ফল' কবিতার এই গদ্য উপসংহার অংশটি নিশ্চিত সাহিত্য গুণান্বিত নয় কিন্তু ছাত্র ও যুবক দীনবন্ধুর পরিচয় এখানে আছে। আলোচনাচ্ছলে বিদ্রূপের কশাঘাত ও প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে নিজের শক্তি সম্পর্কে কবি সচেতনতার পরিচয় রেখেছেন। সংস্কৃত ও ইংরেজী কাব্যপাঠের পরিচয়ও এই লেখাটিকে প্রবন্ধের স্তরে উন্নীত করেছে। দীনবন্ধুর ছাত্রাবস্থার চিঠি হিসেবে এর ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

বিধবার বিবাহ দুবার প্রকাশিত পত্রাকারে একটি রমনীয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। 'মেয়েলী ছন্দে' লেখা 'বিধবার বিবাহ' পদ্যটির ভূমিকা হিসেবে গদ্য অংশের আবির্ভাব। এই গদ্যাংশে অনুপমা নাম্নী কোন এক চতুর্দশ বর্ষ বয়স্কা বিধবা কন্যার দুঃখ কথার পর্যালোচনা আছে। বিদ্যাসাগর রচিত 'বিধবা

বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত হয়েছিল স্বল্প কাল আগে। দীনবন্ধু, বিধবার বিবাহ রচনায় পল্লী নিবাসিনী নারীকুলের কথোপকথনের মাধ্যমে বিদ্যাসাগরকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁর রচনার অনেক অংশ গভীর সহানুভূতি স্নিগ্ধ এমন কি বিদ্যাসাগর রচনার সহধর্মী—"আমার শরীরে কি এ কঠোর রূপ একাদশীর উপবাস সহ্য হয়। প্রাণ যায় যায় আর বাঁচি না, শরীর শুষ্ক ও কম্পিত হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে যেন চারিদিক শূন্য দেখিতেছি, এ অভাগিনীকে আর কতকাল এরূপ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেক, ও একাদশীর উপবাসে কলেবর জীর্ণ শীর্ণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবেক, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কি দুর্দশা না ঘটিল? বসন ভূষণে বর্জিত, বেশ ঘুচিয়াছে, কেশ গিয়াছে, অবশেষ শেষ হইলেই বোন অশেষ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, আর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা নাই, জনক-জননী যাঁহারা প্রাণতুল্য প্রিয়পাত্রী করিয়া অপর্যাপ্ত প্রীতি ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে হতভাগ্য ও পাপীয়সী ভিন্ন আর কোন সম্ভাষণই করেন না, শ্বশুর-শাশুড়ী যাঁহাদের যতনের ধন ও কণ্ঠের হার ও আনন্দের আধারস্বরূপ হইয়া অসীম সুখ-সম্ভোগ করিয়াছিলাম, তাঁহাদেরও এক্ষণে বিষদৃষ্টি হইয়াছি ও তাঁহারা রাক্ষসী বলিয়া আব মুখাবলোকন করেন না, আহা! আর কতকাল এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিব প্রাণ পরিত্যাগ করিবারও তো কোন উপায় দেখিতেছি না।" উদ্ধৃত অংশটির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব'-এর গভীর মিল আছে।

কবিতা সংযুক্ত এই আলোচনার শেষ রচনাটি 'জনক জননীর স্নেহ' কবিতার মুখবন্ধ। সন্তানের প্রতি জনক-জননীর অপরিসীম স্নেহ ও ভালোবাসার পরিচয় এখানে বর্ণিত। সন্তান পালনের জন্যে পিতামাতার গভীর দুঃখ-কষ্ট এবং তা অস্বীকার করে সন্তানের জন্যে সর্বস্ব বিসর্জন পিতা-মাতার স্নেহকে ঈশ্বরদত্ত শক্তিতে অধিষ্ঠিত করেছে। লেখক জনক-জননীর স্নেহে প্রাকৃতিক শক্তিকে অনুভব করেছেন। তাই সন্তান স্নেহ নিতান্ত পশু-বিহঙ্গমকুল থেকে মানবকুলে একই শক্তিতে বিরাজমান। এই কবিতাটির রচনাকাল অজ্ঞাত। লক্ষ্য করতে হয়, পূর্বের আলোচিত গদ্য-রচনাগুলির কোনটিই পণ্ডিতি বাঙলায় রচিত নয়। অর্থাৎ তৎসম শব্দের প্রাচুর্য, আভিধানিক শব্দ ব্যবহার অথবা সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু 'জনক জননীর স্নেহ' রচনাটিতে ভাষার এই প্রাচীন প্রয়োগরীতি স্পষ্ট। অনুমান করা চলতে পারে যে, এটি দীনবন্ধুর নিতান্ত প্রাচীন রচনা। লেখক এই রচনাটি আরম্ভ করেছেন এইভাবে—"সর্বতেজঃ পুঞ্জ করুণাবরুণাগার নির্মল নির্বিকার সর্বসদ্‌গুণাধার পরম পবিত্র অনাদ্যনন্তদেব মণ্ডিত নিখিল

ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় সৃষ্টিবস্তু দৃষ্টিপথে পতিত হয় অথবা সেমুষী সহযোগে মনোভাণ্ডারে আনা যায়, তৎসমূহের প্রতি ক্ষণকাল অনন্যমনে এবং সরলান্তঃকরণে জ্ঞানালোচনা করিয়া দেখিলে অচিরাৎ প্রতীতি হইবে তাহারা নিরন্তর নিয়ন্তার গুণরাশি প্রকাশ করিতেছে।...জগন্মণ্ডলে জনসমাজে জনক জননী সন্তানের প্রতি যে উৎকৃষ্ট কোমল স্নেহ প্রকাশ করেন, সে কেবল মাতা, পিতার পিতা, বিশ্বপিতার করুণানুরূপ। দয়ার্ণব পরমাত্মা যেমন প্রেমাদরে এবং অবিরক্তচিত্তে সীমাশূন্য জগৎ সংসার প্রতিপালন করিতেছেন, তদ্রূপ জনক জননী সন্তান-সন্ততির সুখ সম্পাদনে সানন্দচিত্তে সতত রত আছেন।"

'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' ও 'পোড়ামহেশ্বর' এদুটি রচনা দীনবন্ধুর পরিণত কালের। 'বিবিধ ঃ গদ্য পদ্য' এর রচনাকাল ১৮৫১ থেকে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। দীনবন্ধুর কর্মজীবন শুরু হয়েছে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ ও পোড়ামহেশ্বর প্রকাশিত হবার আগে তাঁর সর্বশেষ নাটক 'কমলে কামিনী' ছাড়া অন্য সমস্ত রচনাই প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী এই তিনটি উপন্যাসও তখন প্রকাশিত। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ ও পোড়ামহেশ্বর রচনা দুটির স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া ও কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে অভিনবত্ব আছে। অধিকাংশ সাহিত্য-ইতিহাসকারেরা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রথম সার্থক ছোটগল্পকারের সম্মান দিয়েছেন। তার মূল কারণ দীনবন্ধুর কয়েকটি জনপ্রিয় নাটক ছাড়া তাঁর অন্য সমস্ত রচনাই অপঠিত এবং অবহেলিত। কৌতূহলী পাঠক দীনবন্ধুর একটি গদ্য রচনায় অন্ততঃ প্রথম সার্থক ছোটগল্পের রূপ লক্ষ্য করবেন। সেই আলোচনায় যাবার আগে যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ ও পোড়ামহেশ্বরের কাহিনী সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যাক।

যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ

কুড়রামদত্তকে ঘুমন্ত অবস্থায় যমপুরীতে এনেছিল যমদূতেরা। কুড়রাম ভয়ংকর লোক। দাঙ্গা, চুরি, রাহাজানি, মিথ্যা মোকদ্দমায় সিদ্ধহস্ত। যমপুরীতে এসে যুক্তি-কৌশলে সদাশিবের একটি জাল পরোয়ানার জোরে সে যমরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজা হল। চাকরি হারিয়ে যম অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। যমমাতা লক্ষ্মীর কাছে এসে অনুরোধ করলেন চাকরি ফিরিয়ে দেবার। লক্ষ্মীর অনুরোধে বিষ্ণু গেলেন ব্রহ্মার কাছে। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও যম এলেন মহেশ্বরের কাছে। তাঁরই পরোয়ানায় যে যম পদচ্যুত হয়েছেন একথা জেনে তিনি বিস্মিত হলেন এবং যমকে আশ্বাস দিয়ে সদলবলে উপস্থিত হলেন যমালয়ে। ইতিমধ্যে কুড়রাম অজস্র পাপীদের নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার

করেছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর আসার সঙ্গে সঙ্গে কুড়রাম শিবকে তুষ্ট করলো স্তবস্তুতিতে। শিব তাকে ফিরিয়ে দিলেন আবার মর্ত্যলোকে। কুড়রাম ঘুম ভেঙ্গে দেখলো সে শুয়ে আছে আগেব জায়গাতেই।

পোড়া মহেশ্বর

সরাবপুর গ্রামের পুরোভাগে পোড়া মহেশ্বরের অবস্থান। পোড়া মহেশ্বর একটি সুগোল শিলাস্তম্ভ--মন্দির বহুকাল আগেই ধ্বংশ হয়েছে। মহেশ্বরেব মাথার এক পাশে চটা ওঠা, কিম্বদন্তী, পোড়া মহেশ্বরের মাথার মধ্যে স্পর্শমণি ছিল। অনেকদিন আগে এক সন্ন্যাসী যোগবলে এই স্পর্শমণির কথা জেনেছিলেন। সেই মণিলাভের আশায় তিনি এলেন সরাবপুরে। মন্দিরেব সামনে অশথ গাছেব তলায় তিনি আসন পাত্লেন। সন্ন্যাসীর আকৃতি ও আচার-আচবণের ফলে কিছু দিনের মধ্যে সমস্ত গ্রামবাসী তাঁকে ভয় পেতে লাগলো। এক সপ্তাহেই সন্ন্যাসী সম্পর্কে নানাপ্রকাব অলৌকিক কথাব রটনা হল। সুমিত্রা গোয়ালিনী তাব একজন প্রত্যক্ষ দর্শিনী। এমনকি দৈবক্রমে সুমিত্রাও অলৌকিক শক্তির অধিকাবিণী হল। দামু ঘোষের বৃদ্ধা জননীও সন্ন্যাসীর সঙ্গে যমরাজ ও যমবাজপুত্রের কথোপকথন শুনেছে। এইভাবে সন্ন্যাসী গ্রামবাসীদেব কাছে আবো ভীতিকব হযে উঠলো। এই অবস্থায় সন্ন্যাসী একদিন দুপুরবেলায় নিজের চারদিকে আগুন জেবলে আর্তনাদ করতে থাকলো এই বলে, কোথা হে গ্রামের লোক, ত্বরায মন্দিরে আইস, পামর সন্ন্যাসী আমাকে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতেছে, সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর। মহাদেবের মন্দির থেকে এই আর্তনাদ শুনে গ্রামের সমস্ত লোক এল সাহায্যের জন্যে। সন্ন্যাসীকে চিৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করে কোন উত্তর না পেয়ে তারা ফিরে গেল, মনে করলো ভৌতিক কান্ড। তখন সন্ন্যাসী রোজই ঐভাবে নিজের চারদিকে আগুন জেবলে চিৎকাব করতো। গ্রামের লোকেরা ক্রমশঃ সন্ন্যাসীব এই আচরণকে পাগলামী মনে কবে আর সাহায্যের জন্যে এলনা। এইভাবে কিছুদিন যাবার পর সন্ন্যাসী একদিন মহেশ্বরের চারপাশে আগুন জবালালো। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মহেশ্বব আর্তনাদ করলেন বাববার কিন্তু কেউই এলনা সাহায্যেব জন্যে। তীব্র যন্ত্রণায মহেশ্বরের মস্তক বিদীর্ণ হল আর স্পর্শমণি ছিট্‌কে বেরিয়ে এল। মাটিতে পডার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হল হ্রদের। সন্ন্যাসী সেই হ্রদেব জল সেঁচে ফেলে উদ্ধাব কবলে স্পর্শমণি, আব সকাল হবাব আগেই বিদায় নিল গ্রাম থেকে।

'পোড়ামহেশ্বর' রচনাটি কিংবদন্তী মূলক কাহিনী। সন্ন্যাসীর স্পর্শমণি উদ্ধাব-কথা এই গল্পে ছোট গল্পের ভাবঐক্যে পবিণত হতে পারতো,

কিন্তু অনাবশ্যক সুমিত্রা গোয়ালিনীর ও দামু ঘোষের বর্ষীয়সী জননীর বিভিন্ন ও বিচিত্র বিস্তারিত বর্ণনায় সেই ঐক্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে এই গল্পে সন্ন্যাসীর সঙ্গে যমরাজ ও যমরাজপুত্রের দীর্ঘ কথা-বার্তার বর্ণনা কিংবদন্তীর রসকেও নষ্ট করেছে। কোথাও কোথাও ব্যক্তি দীনবন্ধুও কাহিনীর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই গল্পের খলাসির বিল, সুমিত্রা গোয়ালিনী ও দামু ঘোষের জননী বঙ্কিমের উপন্যাসেও আছে।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ছোট গল্পের উদ্ভব ও বিকাশ। সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের ছোট ছোট উপদেশাত্মক কাহিনী, কথা সরিৎসাগর বা আরব্যরজনীর গল্পের যে আবেদন তা ছোট গল্পের নয়, যদিও এই কাহিনী-গুলির মধ্যে ছোট গল্পের বীজ উপ্ত ছিল। বস্তুতঃ ছোট গল্প একটি স্বতন্ত্র রূপবন্ধ। জীবনের একটি খণ্ডাংশকে তুলে ধরার যে পরিচয় ছোট গল্পের প্রাণ, তা একটি বিশেষ রীতি বা স্টাইল। বাংলা ছোট গল্প১ গ্রন্থে ছোট গল্প পূর্ব রচনাগুলিকে চূর্ণক, আখ্যানক, নক্সা ও নভেলা, এই চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। লক্ষ্য করতে হয় ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলির মাধ্যমে ছোট গল্পের রীতিকে গ্রহণ করার চেষ্টা হয়েছে অসীম এবং রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোট গল্পের যে সার্থকতা তার অংকুর ও বিকাশকালে এই চূর্ণক, আখ্যানক, নক্সা ও নভেলার দান অসামান্য। উপরি-উক্ত গ্রন্থে নভেলা যে উপন্যাসের জন্ম ও বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে সে-কথাও লেখক বলেছেন। নভেলার ধর্ম এবং লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন লেখক এই বলে, "মনে রাখতে হবে চূর্ণক, আখ্যানক ও নক্সা ধারার পরিণতি নভেলায় নয়—নভেলা একটি পরবর্তী নতুন ধারা। ছোট গল্পের ইতিহাসে নভেলার দান সামান্য নয়। স্পেনের ছোট গল্পের ইতিহাসে নভেলার দান সমালোচকেরা বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন। সার্ভান্তাসের Novelas Ejemplares (১৬১৩) প্রকাশিত হবার পর ছোট গল্প ত্বরান্বিত হল। শুধু স্পেন নয়, অন্যান্য দেশেও এই ধরনের নভেলা প্রচলিত ছিল। বিশেষভাবে স্মরণীয় ইটালী। ইংরাজী ও ফরাসীতেও ছোট গল্পের পূর্বপ্রস্তুতি ছোট ছোট উপন্যাস বা দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যেই।" বাংলা ছোট গল্পের প্রস্তুতি পর্বে যে চূর্ণক, আখ্যানক, নক্সা বা নভেলাগুলি কাজ করেছে তা ক্রমশঃই পাঠককে ছোট গল্প আস্বাদনে আকা-ঙ্ক্ষিত করেছে। বস্তুতঃ এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে নতুন আঙ্গিক, রূপবন্ধ। একটি মুহূর্তের রূপায়নে সমস্ত জীবন আলোকিত হয়ে উঠেছে। পাঠকের এই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়েছিল সংবাদপত্রের মাধ্যমে। "সংবাদপত্র সব

১। শিশিরকুমার দাশ, **বাংলা ছোট গল্প**, ১৯৬৩।

দেশেই ছোট ছোট কাহিনী রচনার উৎসাহ সঞ্চার করেছে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের ছোট গল্পের জন্ম সংবাদপত্রে। বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি।"১ বাংলা ছোট গল্পের ঊষা লগ্নে তাই নভেলার পাশাপাশি গড়ে উঠেছে এক ধরনের গল্প যার পরিসর অল্প, ঘটনা কম ও কাহিনী জটিলতাহীন। সাধারণভাবে এই কাহিনীগুলিকে লেখকেরা উপন্যাস অথবা ক্ষুদ্র উপন্যাস বলেছেন। এই লেখাগুলির মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ ছোট গল্পের রূপ দেখা গেছে। ঘটনা বিরল, চরিত্র বিরল একটি জীবনের পূর্ণাঙ্গ কাহিনীকে তুলে ধরার পরিণতি ছোট গল্পের এবং সাহিত্যের ইতিহাসে ছোট গল্পের এই পরীক্ষা বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করেই সম্ভব হয়েছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে (১২৭৯, চৈত্র) বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হল ইন্দিরা। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে (১২৮০, জ্যৈষ্ঠ), বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমানুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধুমতী গল্পটি এবং পরের বছর (১২৮১ জ্যৈষ্ঠ) ভ্রমর পত্রিকায় সঞ্জীবচন্দ্র 'দামিনী' ও 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' নামে দুটি গল্প লিখলেন। বঙ্কিমরচনাবলীর সম্পাদকেরা 'ইন্দিরা' সম্পর্কে লিখেছেন, "ইহাকে আধুনিকযুগের ছোট গল্পের পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্য নানা বিষয়ের মত বঙ্গদর্শনে ছোট গল্প রচনার পরীক্ষায়ও প্রবৃত্ত হন। ইন্দিরা এই পরীক্ষার প্রথম ফল।"২ বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ইতিহাসকারেরা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' এবং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রামেশ্বরের অদৃষ্ট ও দামিনীকে প্রথম ছোট গল্প বলেছেন।"৩ কিন্তু এই গল্পগুলির আগে প্রকাশিত হয়েছে দীনবন্ধু মিত্রের 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' ও 'পোড়ামহেশ্বর'। দীনবন্ধু মিত্রের গদ্য-রচনার

১। শিশিরকুমার দাশ, **পূর্বোক্ত** পৃঃ, ২৭।

২। যোগেচন্দ্র বাগল, ভূমিকা, **বঙ্কিম-রচনাবলী**, সাহিত্য-সংসদ, (১৩৬৩) পৃঃ, ৩৪।

৩। সুকুমার সেন তাঁর **বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**, দ্বিতীয় খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে বলেছেন, শশিচন্দ্র দত্তের 'টাইমস অব ইয়োর,' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ উপন্যাস মালার (১৮৭৭) কয়েকটি গল্পে ছোট গল্পের বীজ দেখা দিয়াছে। ইহার পূর্বে এমন তিন-চারিটি গল্প বাহির হইয়াছিল যাহাতে ছোট গল্পের রূপ দুর্লক্ষ্য নয়। এমন তিনটি গল্প হইতেছে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' এবং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী'......রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যে সকল গল্প লেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে কেবল দামিনীতেই ছোট গল্পের লক্ষণ বেশি মাত্রায় বিদ্যমান।" ১৯৬৩ (১৩৭০), পৃঃ, ১৬৯।

ভূদেব চৌধুরী তাঁর **বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে** লিখেছেন 'মধুমতী' বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ ছোট গল্প' দ্বিতীয় সং, ১৯৬২, পৃঃ, ২৪৫।

আরো দ্রষ্টব্য : শিশিরকুমার দাশ, **পূর্বোক্ত**, ভূদেব চৌধুরী, **বাংলা ছোট গল্প ও ছোট গল্পকার**, ১৯৬২।

স্বল্পতা এবং প্রধানতঃ নাট্যকার পরিচয়ের ফলে তাঁর গদ্য রচনাগুলি অধিকাংশ আলোচকের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। দীনবন্ধু মিত্রের গদ্য রচনার অপ্রসার নিশ্চিত এই অপরিচয়ের কারণ কিন্তু এই অপরিচয় যদি দীনবন্ধুর গদ্য রচনাকে যোগ্য সম্মান দানে বিরত হয় তখন তা দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ ও পোড়ামহেশ্বর সাহিত্যের ইতিহাসে ও আলোচনায় যথার্থ স্থান পায়নি বলেই মনে হয়।

'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' উপন্যাস নামে প্রকাশিত দুটি পরিচ্ছেদে একটি ছোট গল্প এবং সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যে একশ্রেণীর ছোট গল্পের সূত্রপাত এ গল্পে সার্থক রূপ নিয়েছে। সেই সময়ে প্রচলিত অদ্ভুত গল্প বা উদ্ভট গল্পের সংগে এ গল্পটির আত্মীয়তা থাকাও অসম্ভব নয়, কিন্তু লেখক যে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে সতর্কতার সংগে ও এ গল্পের কাহিনী পরিস্থিতি ও চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। গল্পটির মৌল আবেদন হাস্যরসে এবং লক্ষ্য করতে হয় লেখক সমকালীন অন্যান্য লেখকদের মত বিষয়বস্তু সংগ্রহে ভিন্নধর্মী। মধুমতী, রামেশ্বরের অদৃষ্ট, কিংবা দামিনী গল্পের চরিত্র ও কাহিনী পরিচিত, আমাদের ঘরের, সর্বোপরি এই গল্পগুলিতে যে কারুণ্য ও বিষাদের ছায়া আছে তা পাঠক মনকে উদ্বেলিত করে। দীনবন্ধু মিত্রও তাঁর চারপাশের ছড়িয়ে থাকা সংসার থেকে সংগ্রহ করেছেন উপকরণ, কাহিনী আর অত্যন্ত সুকৌশলে আমাদের পরিচিত সংসারের গায়ে ছদ্মবেশ পরিয়ে উপস্থিত করেছেন এমন এক স্থানে যার সংগে আমাদের পরিচয় নিতান্তই স্বল্প। বিশেষতঃ যমপুরীর সংগে বন্ধুত্বের প্রশ্ন ওঠেনা। কিন্তু যেহেতু তিনি বেছে নিয়েছেন একটি ভিন্ন পন্থা তাই স্বভাবতঃই দীনবন্ধু মিত্রের গল্পের উপকরণ অন্য লেখকের উপকরণ নাও হতে পারে এবং সেজন্য নিশ্চিত তাঁর গল্পকে অস্বীকার করা যায় না।

হাস্যকর অবস্থা এবং হাস্যরস এক বস্তু নয়। দুটির মধ্যেই অসংগতি এবং বেদনা আছে কিন্তু এই অসংগতিযুক্ত বেদনা যখন হাস্যরসে রূপ নেয় তখন তা হয়ে দাঁড়ায় সহানুভূতিস্নিগ্ধ। তা কোন লেখায় স্পষ্টরূপে প্রকাশিত, কোথাও অলক্ষ্যে গতিশীল। অবশ্য যে অসংগতি বেদনার সৃষ্টি করে তার গভীরতা এবং মর্যাদা অসংগতির মাত্রা এবং বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। তাই সব অসংগতিই মহৎ বেদনার সৃষ্টি করেনা, সব বেদনাই মহৎ অসংগতি থেকে উপজাত নয়। যে পরিমিত সুখে আনন্দ, তা অসহনীয় হয়ে ওঠে তার মাত্রার স্ফূরণে এমনকি তা গভীর দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সময় সময়। বস্তুতঃ সুখ-দুঃখের অনুভবে এই মাত্রাবোধ বিপর্যস্ত হলে সুখ হয়ে দাঁড়ায় দুঃখ, দুঃখ হ'য়ে দাঁড়ায় সুখ। কিন্তু এই ব্যক্তিগত অনুভব নিজের ক্ষেত্র ভিন্ন

অন্যের পরিস্থিতিতে অন্য ভাবের সৃষ্টি করে। হাস্যরসের অনুভব আনন্দ-দায়ক কিন্তু হাস্যকর পরিস্থিতিতে নিজেকে ফেলতে আনন্দ হয়না।

যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ গল্পে দীনবন্ধু মিত্র যে অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছেন তার নবত্ব এবং বৈচিত্র্য অসামান্য। প্রধানতঃ স্থান, কাল, পাত্রপাত্রী-দের অবস্থান, ভাষা, আকৃতি, আচরণের অসঙ্গতি এই গল্পের হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। গল্পের আরম্ভেই যমরাজ-সভার যে বর্ণনা তা পুরাণ চরিত্র সম্পর্কে অসঙ্গতির বোধ সৃষ্টি করে। উদাহরণ দিয়ে একথা স্পষ্ট করা যেতে পারে। যমরাজ কোন এক গ্রীষ্মের দিনে, দিনের রাজকাজ করতে না পেরে রাত্রিতে, "মহাসমারোহে কাছারি আরম্ভ করিলেন। গ্যাসালোকে সভামণ্ডপ আলোক-ময়, ফরাসী-প্রুসীয় মহাযুদ্ধ হইবার অব্যবহিতকাল পূর্বে ক্রীত বিস্তীর্ণ ফরাসী গালিচা বিস্তারিত, দেওয়ালে নৈপুণ্য কুশল শিল্পিশ্রেষ্ঠ ম্যাকেব বিনির্মিত ঘুঘু ঘড়ি, কয়েকখানি সম্পূর্ণ মূর্তি দর্শনোপযোগী মুকুর, কিন্তু সকলের উপরই আবরণ—কারণ, কালান্তক মহোদয় একদিন কাচাভ্যন্তরে স্বীয় মূর্তি দর্শন করিয়া ইংরাজী দশঘণ্টা একাদশ মিনিট মূর্চ্ছিতাবস্থায় নিপতিত ছিলেন। অদ্যকার বিশেষ কার্য কি, এই প্রশ্নের পর 'মুন্সি চিত্রগুপ্ত অচিরাৎ গাত্রোত্থানপূর্বক স্বসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, 'ভগবন্, অদ্য পি এণ্ড ও কোম্পানীর স্টীমারে ভীয়া বিণ্ডিসি একখানি সরকারী চিঠি এবং সমীরণ-যানে একখানি বেনামি দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি, উভয়েই বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত এবং উভয়ই 'জরুরী' শব্দাঙ্কিত।" যমরাজ-সভা গ্যাসালোকে উজ্জ্বল, বিস্তীর্ণ ফরাসী গালিচা কিংবা নিজের মূর্তি দর্শনে যমরাজের মূর্ছাকাল সম্পর্কে সঠিক সময় ইত্যাদি বর্ণনায় হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। চিত্রগুপ্তকে প্রধান মুন্সি সম্ভাষণ বা চিঠিদুটি আসার পরিচয়ে একই অসঙ্গতির পরিচয়। পুরাণবর্ণিত চরিত্রগুলিকে তাদের স্বাভা-বিক বেশে দেখাই কাম্য কিন্তু যদি দেখা যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা যম তাঁদের দেবতার মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়ে সাধারণ মানুষের মত হয়ে দাঁড়িয়ে-ছেন, তা'হলে এই অসঙ্গতি কৌতুকের সৃষ্টি করে। দেব-চরিত্রের এই অসঙ্গতিজনিত হাস্যরস 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' গল্পে প্রচুর। কয়েকটির উদাহরণ দিলে গল্পটির মৌল আবেদন স্পষ্ট হবে।

(ক) যমের কর্মচ্যুত অবস্থার বর্ণনা ঃ শ্রীসদাশিবের জাল পরোয়ানার জোরে কুড়রাম দত্ত হলেন যমরাজ। তখন, "যমরাজ সদাশিবের পরোয়ানার মর্মাবগত হইয়া হা হতোস্মি বলিয়া রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, দত্তজ মহাশয়, কখন চার্জ লইবেন, দত্তজ উত্তর দিলেন, এই দণ্ডে, চিত্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ চার্জের কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া উভয়ের স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন;

এবং যমরাজ সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক পারিষদবর্গের সহিত উপবেশন করিলেন। কুড়রাম গাত্র দোলাইতে দোলাইতে এবং স্ফূর্তিবিস্ফারিতবদনে সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া চিত্রগুপ্তের প্রতি একটি জমাওয়াশীল বাকি প্রস্তুত করিতে অনুজ্ঞা দিলেন। তখন গদিচ্যুত যম কুড়রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ধর্ম্মরাজ, আমার কয়েকদিনের রাহাখরচ করিয়া বাড়ি যাইতে পারি।' ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, 'আমি এবিষয়ে ভগবান ভবানীপতিকে জানাইব, তিনি অনুমতি দিলেই আপনার দরমাহা ও সরঞ্জামি চুকাইয়া দেওয়া যাইবে।' পুরাতন যম নূতন যমের এতদ্বাক্যে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন 'ধর্ম্মরাজ, আস্তাবলে যে বয়ারদ্বয় আছে, তাহার একটি সরকারী আর একটি আমার নিজ খরিদ, যদি অনুমতি হয়, আমার নিজ খরিদা বয়ারটি আমি লইয়া যাই।' ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, 'তুমি দুইটিই লইয়া যাও, আমি কলিকাতা হইতে ত্বরায় চেঁঘুড়ীওয়ালা বাবুদের এখানে আনয়ন করিব।"

(খ) যমপত্নী কালিন্দীর আকৃতির বর্ণনা ও তার নতুন স্বামী সন্নিধানে আসা ঃ

"যে যখন যমত্ব প্রাপ্ত হয়, কালিন্দীও তখন তাহারই রাণী। কালিন্দী কৃষ্ণবর্ণা এবং স্থূলাংগী. তাহার উদরপরিধি চতুর্দশগজ দুইফুট পাঁচইঞ্চি; হস্তি-মস্তকের ন্যায় মস্তক, রোগা রোগা চুল, এবং ঢিবি-যুগলে বিভক্ত; সীমন্তে সাতহাত লম্বা, দুইহাত চওড়া, আধহাত ঊর্দ্ধ সিন্দূর-রেখা, ললাট এত প্রশস্ত, উপত্যকাধিত্যকাকীর্ণ না হইলে সেখানে বসাইয়া দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করান যাইত, নাসিকা নাতিখর্ব্ব নাতিদীর্ঘ, তাহাতে একটি নথ্ দুলিতেছে, নথটি কুম্ভকারচক্র-পরিমাণ মোটা, নোলকটি যেন একটি কলসী, মুক্তাদ্বয় দুটি সুপক্ক বিলাতি কুমড়াবিশেষ, দাঁতগুলিণ দীর্ঘ এবং অতিশয় উচ্চ, ওষ্ঠদ্বারা ঢাকা পড়েনা, জিহ্বাটি গো-জিহ্বা, হাত দিলে কর কর করিয়া উঠে, ডাক্তারেরা দেখিলে বলিবেন, কালিন্দীর জ্বর হইয়াছে, কালিন্দীর ত্বক মসৃন নহে, হাতীর গায়ের মত ঘস-ঘসে। নবাভিষিক্ত রাজার পরিতোষ সংসাধনার্থ কালিন্দী বেলা দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেশবিন্যাস করিলেন। ক্রমে ক্রমে একশত বিরাশীখান শাড়ী পরিধান করিলেন, কিছুতেই মন উঠিল না, পরিশেষে একখানি চুনুরি শাড়ী মনোনীত হইল। অঙ্গে আধমণ সর্ষপতৈল ঢেউ খেলিতে লাগিল, প্রকাণ্ড গণ্ডদেশে মুখামৃত সহযোগে অভ্রখণ্ডসমূহ শোভা পাইতে লাগিল। পদযুগলে বাইশগাছা মল। ঘুঘু বাড়ীতে ঘু ঘু করিয়া এগারটা বাজিল, রাজমহিষী অমনি বামহস্তে পানের-বাটা, দক্ষিণহস্তে পূর্ণঘট ধারণপূর্ব্বক ঝম ঝম করিয়া অপরিচিত স্বামী সন্নিধানে গমন করিলেন।"

"শয়ন-মন্দিরে কুড়রাম দিব্যাস্তরণ সংস্তীর্ণ-বিস্তীর্ণ শয্যাতলে শয়ন করিয়া ভাবিতেছেন, 'যমালয় হইতে পলায়ন করিবার উপায় কি,...... শয়নাগারে অসলারের বাড়ীর ঝাড় জ্বলিতেছে। শয্যার নিকটে কয়েকখানি সেরউডের বাড়ীর কোচ এবং চেয়ার বিরাজিত। কালিন্দী তথায় আগমন করিয়া দাঁত-গুলি বাহির করিয়া একটু হাসিয়া কুড়রামকে নমস্কার করিলেন। কুড়রাম কহিলেন, 'কল্যাণী তুমি কে?' কালিন্দী বলিল, 'আমি যমরাজ রাজমহিষী কালিন্দী, আপনার দাসী, ধর্মরাজের সেবা করিবার নিমিত্ত আগত।' কুড়রাম ভাবিলেন, এইবারে গেলেম, যদিও দুই-একদিন এখানে থাকিতাম, এ মূর্তি দর্শনে আর থাকিতে পারিনা; মহিষীর গায় গা ঠেকিলে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইব, কি কৌশলে এই রক্তবীজবিনাশিনীর ভীষণালিঙ্গন হইতে উদ্ধার হই; কালিন্দী কুড়রামকে দুর্ম্মনায়মান দেখিয়া কহিলেন, প্রাণবল্লভ, আমি তোমা-বই আর জানিনা

তুমি শ্যাম আমি প্যারী, তুমি শুক আমি শারী,
তুমি যাঁড় আমি গাই, তুমি হাতা আমি ছাই,
তুমি বেড়ী আমি হাঁড়ী, তুমি ঘোড়া আমি গাড়ী,
তুমি বোলতা আমি চাক, তুমি ঢাকী আমি ঢাক,
তুমি পোকা আমি ফুল, তুমি কর্ণ আমি দুল,
তুমি ছাগ আমি ছাগী, তুমি মিন্সে আমি মাগী,
তুমি ডাণ্ডা আমি গুলী, তুমি বাঁশ আমি ডুলি,
তুমি ডালা আমি ডালি, তুমি শালা আমি শালী।"

বিষ্ণুর বর্ণনা ঃ "বিষ্ণু সম্প্রতি একটি গরুড়ের জুড়ি কিনিয়াছিলেন; পক্ষীদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে অতিশয় ব্যস্ত, একবার 'ওহো বেটা, ওহো ও বেটা' বলিয়া গাত্রে হস্তবিক্ষেপ করিতেছেন, একবার কোঁচার অগ্রভাগ দ্বারা ঠোঁট মুছাইয়া দিতেছেন, একবার তাহাদের বক্রগ্রীবা অবলোকন করিতেছেন; এমত সময়ে বিন্দী আসিয়া আদালতের সমন সার্ভ করিল। বিষ্ণু যদিও অতিশয় গরুড় প্রিয়, ওয়ারেণ্টের আশঙ্কায় অচিরাৎ বিন্দীর অনুগামী হইলেন। লক্ষ্মীর কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করত নারায়ণীর নবচম্পকদামসম চিবুকে একটি আদর গর্ভ টোকা মারিয়া কহিলেন, 'আসামী হাজির দণ্ডবিধান করুন।' নারায়ণী প্রণয়পূর্ণ রোষকষায়িত লোচনে বলিলেন, 'কথার শ্রী দেখ, উহাতে যে আমার অকল্যাণ হয়, দাসীকে অমন কথা বলিলে তাহাকে কেবল অপ্রতিভ করা হয়।"

মহেশ্বরী ও মহাদেবের বর্ণনা ঃ "মহাদেব চা খাইয়া বলিলেন, 'ভগবতী আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে; পাচিকাকে বল, সকালে আমাকে মৌরলা

মাছের ঝোল দিয়া চারিটি ভাত দেয়।' ভগবতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'রজনীর বৃত্তান্ত কি তোমার মনে আছে? যে কাণ্ড করিয়াছিলে, আর যে তোমাকে সজীব দেখিব, মনে ছিল না, আমি কিনা সেই রাত্রিতে ঘাটে গিয়া গা ধুয়ে আসি।'

"মহাদেব অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, 'প্রেয়সি, আমি তোমার রাঙ্গাপদে পদে পদে অপরাধী; আমি তোমার পদারবিন্দ ধারণ করিয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আমার অপরাধ মার্জনা কর।' মহাদেব মহেশ্বরীর পদদ্বয় ধরিয়া আছেন, এমন সময় ব্রহ্মা সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভগবতী লজ্জাবনত-মুখী হইলেন, শিব কহিলেন—'ব্রহ্মা আমি ভগবতীর ধ্যান করিতেছিলাম'।"

এই গল্পের প্রধান পাত্র কুড়রামের বর্ণনা ঃ কুড়রামের বয়স পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর। মস্তকে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, মধ্যভাগে একটি চৈতনক, তাহাতে দুইটি তাম্র মাদুলি; ললাট প্রশস্ত, মধ্যস্থলে দড়কা রোগ সম্বন্ধীয় রেখাদ্বয় রাজ-দণ্ডবৎ শোভা পাইতেছে; ভ্রূযুগল স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় না, চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু জ্যোতিহীন নহে, নাসিকাটি লম্বা, অল্প মঙ্গোলীয়ান কট বলিয়া বোধ হয়; নাসারন্ধ্রে নানা বর্ণের চিকুর, গুম্ফ আয়তনিবিড়, কঠিন এবং অবিরত দণ্ডায়-মান, সপ্তাহে একবার করিয়া কেয়ারি করা হয়। গলায় সুবর্ণ তার জড়িত কৃষ্ণকলি ফুলের বিচি সদৃশাক্ষ মালা; বাহুতে ইষ্ট কবচ, মধ্যভালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা, অঙ্গুলে একটি রজত একটি কাঞ্চন অঙ্গুরীয়; পরনে ময়ূরকণ্ঠী চেলির জোড়, পায়ে ফুল-পুকুরে চটী, সর্বাঙ্গে লোম, মস্তকের কেশে আবাসস্থান সংকীর্ণ বিধায় সমৃদ্ধশালী উৎকুনকুল গাত্রলোমে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। উদরটি স্থূল, কিন্তু নিরেট, অদ্যাপি ভুঁড়ি বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কুড়রাম জননীর অদূরদর্শিতা হেতু আঁস্তাকুড়ে ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন। ধাত্রী তাঁহাকে সে স্থান হইতে কুড়াইয়া আনে, সেইজন্য তাহার নাম কুড়রাম।'

উদ্ধৃত অংশগুলিতে কুড়রাম ব্যতীত পুরাণসিদ্ধ-চরিত্রগুলিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে উপস্থিত করেছেন লেখক। যম, বিষ্ণু, মহাদেব ছাড়াও যমমাতা যমপত্নী, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা এদের পরিচয় সংক্ষিপ্ত হলেও তা এ গল্পে আছে। যমপুরীর নিতান্ত আধুনিক গৃহসজ্জার বর্ণনা যে কৌতুকের সৃষ্টি করে, কর্মচ্যুত যমের দীন কথাবার্তা সে কৌতুককে আরো দীপ্ত করে তোলে। বিষ্ণুর শাস্ত্রীয় রূপের সঙ্গে এ গল্পের 'ওহো বেটা' উচ্চারণকারী বিষ্ণুকে মিলিয়ে নিতে গিয়ে অসঙ্গতির অনুভব হাসির আবর্ত সৃষ্টি করে। মঙ্গলকাব্যের শিব শ্মশান-মশানযাত্রী গঞ্জিকা সেবী লৌকিক রূপে

প্রকাশিত। কিন্তু দীনবন্ধুর গল্পে শিবও যেন নতুন হয়ে ওঠে। সিদ্ধিতে নেশা হয়না বলে শিবের অভিযোগ। নন্দী শুনেছিল সিদ্ধিতে ঝুল মিশাতে পারলে নেশা গভীর হয়। মহাদেবের ভর্ৎসনায় "গত নিশিতে নন্দী ষাঁড়ের ঘর হইতে কতকটা ঝুল আনিয়া সিদ্ধিতে মিশাইয়া দেন, তাহাতেই ধূর্জটির ঘোরতর নেশা হয়। নেশার প্রথমোদ্যমে ব্যোমকেশ 'ব্রেভো' নন্দী বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্ষণকাল পরে যেমন নেশা পাকিয়া আসিল অমনি অম্বিকার অঙ্গে ঢলে পড়িলেন। বমন-প্রবাহে শয্যা ভাসমান, দিগম্বরী হাবুডুবু খাইতেছেন।" এ গল্পের শিব তাই মাতাল অবস্থায় নন্দীকে 'ব্রেভো' জানায়. লক্ষ্মী দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করেন, ব্রহ্মা বেদচতুষ্টয়ের প্রুফ দেখেন, যমমাতা সাধারণ জননীর মত রূপে প্রকাশ পান। কালিন্দীর রূপবর্ণনায় 'ক্রমে ক্রমে একশত বিরাশি' শাড়ী পরার পরিচয়, অঙ্গে সর্ষপতেলের ঢেউ ইত্যাদির বর্ণনায় নতুন স্বামী সন্নিধানে যাবার আন্তরিক আগ্রহ ও সলজ্জ প্রকাশ বিশুদ্ধ হাসির সৃষ্টি করে। কুড়রামের বর্ণনাও একই রসে সিক্ত।

দীনবন্ধু মিত্রের এই গল্পটির ভাষা আলোচনা করলে এর অন্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ভাষার হাস্য রসাত্মক উপকরণ চোখে পড়ে। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ গল্পটির ভাষার প্রথম বৈশিষ্ট্য (ক) বর্ণনামূলক অংশের সংস্কৃত মূলকতা অর্থাৎ তৎসম শব্দের ব্যবহার ও সমাস বাহুল্য। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ গল্পের প্রথম পৃষ্ঠার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়ঃ—

মূল শব্দ ১৪২টি; সংস্কৃত সমাস ২৮টি; তৎসম শব্দ ৮৭টি; বিদেশী শব্দ ১৪টি (ইংরেজী ৮টি, ফারসী ৬টি)।

প্রকৃত পক্ষে দীনবন্ধুর গদ্যে সংস্কৃত মূলকতা অত্যন্ত স্পষ্ট। তবে ইংরেজী বা ফারসী শব্দের প্রয়োগের ফলে তাতে কথ্য ভাষার গুণও যথেষ্ট রয়েছে।

(খ) কোন কোন ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতমূলকতা ইচ্ছাকৃত (deliberate) প্রয়োগ। যেমন, 'ডেংগুচন্দ্র হাড়ভাঙগার' চিঠির ভাষা। এখানে সংস্কৃতমূলক ভাষা প্রকৃতপক্ষে হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। হাস্যরস সৃষ্টিতে ভাষার যে শক্তি তা দীনবন্ধু অবহিত ছিলেন। প্রাকৃত বাংলাকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত করলে তা হাস্যকর হতে পারে, আবার প্রাকৃত বাংলার সঙ্গে সাধু বাংলার মিশ্রণও হাসির উপাদান হতে পারে একথা দীনবন্ধু জানতেন। 'কালাজ্বর-কে' কৃষ্ণদাদাতে পরিণত করা প্রথম স্তরের উদাহরণ, ডেঙ্গুচন্দ্র হাড়ভাঙ্গা দ্বিতীয় স্তরের উদাহরণ। এই চিঠিতে ডেঙ্গুজ্বরের অভিযানকে পৌরাণিক পরিবেশে (setting) রাখার জন্যেই দীনবন্ধু অস্মদাদি, মদীয়, এতদভাবিষ্যবাণী প্রয়োগ করেছেন।

(গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য দীনবন্ধু মিত্রের অনুপ্রাস প্রয়োগের প্রচেষ্টা স্বাভাবিক কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তা deliberate এবং হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে। উদাহরণ, কুড়রাম প্রদত্ত শিবের জালপত্র ঃ তোমার অখণ্ড প্রচণ্ড রাজদণ্ড খণ্ডন করা যায় নাই......তুমি......অতিশয় পাষণ্ড হইয়াছ, রণ্ডামি ভণ্ডামি, ষণ্ডামি তোমার অঙ্গের আভরণ হইয়াছে।

(ঘ) দীনবন্ধুর বাংলায় নিতান্ত সাধারণ গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ আছে। তুলনীয়, বেহারাদের (কাহারদের) ভাষা ঃ মোরা নব ঠাকুরকে আনতি গিয়েলাম, তা ভুল করে তোমারে এনে ফেলিছি: মারামারি করবেন না, আর মোরে ঝা বলবেন, তাই করবো। এছাড়া ধবন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগও প্রচুর। সেই সঙ্গে ফারসী এবং ইংরেজী শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়।

(ঙ) আলঙ্কারিক উপাদান (Rhetoric aspect) : হাস্যরসের একটি উপাদান হল বৈপরীত্য সৃষ্টি। সেই বৈপরীত্য ভাষার দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন,—

(১) নাসিকাটি লম্বা, অলপ মঙ্গোলীয়ান কট বলিয়া বোধ হয়।

(২) নাসারন্ধ্রে নানা বর্ণের চিকুর।

(৩) গুম্ফ আয়ত নিবিড়......সপ্তাহে একবার করিয়া কেয়ারি করা হয়।

(৪) মস্তকের কেশে আবাসস্থান সংকীর্ণ বিধায় সমৃদ্ধশালী উৎকুনকুল গাত্র লোমে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে।

(চ) বাক্য গঠন (Sentence Construction) : দীনবন্ধুর রচনার বৈশিষ্ট্য তাঁর বাক্যগুলি দীর্ঘ।

(ক) বাক্যের ভিতরে নানাবিধ দ্রব্য......কাচের দোয়াত ইত্যাদি। এই বাক্যে ৫১টি শব্দ আছে—পৃঃ ৬

(২) মস্তকে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ......করিয়া কেয়ারি করা হয়। এই বাক্যের শব্দসংখ্যা ৫৫টি। পৃঃ—৪—৫

(৩) কালিন্দী কৃষ্ণবর্ণা এবং স্থূলাঙ্গী......হাতীর গায়ের মত খসখসে। শব্দসংখ্যা ৯৬টি। পৃঃ ১০—১১।

কিন্তু হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় ধরনের বাক্যগঠনেই তাঁর দক্ষতা। তাই তাঁর কথোপকথনগুলি জীবন্ত। সাধারণ বাঙ্গালীর মুখের বাক্য ছোট ছোট। দীনবন্ধুর রচনায় কথোপকথন তাই ছোট বাক্যের সমষ্টি। এই প্রসঙ্গেই ব্রহ্মা, বিষ্ণুর ভাষার সঙ্গে শিবের কথাবার্তার পার্থক্য লক্ষনীয়।

ব্রহ্মা ঃ যমরাজ রাজকার্য পর্যালোচনায় সম্যক পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। পৃঃ—১৮।

বিষ্ণু ঃ যম আপনার সন্তান।

শিব ঃ ব্রহ্মা, আমি গাঁজা খাই বটে, কিন্তু গাঁজাখোরের মত কর্ম করিনা... পৃঃ—২১—২২।

'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' গল্পে লেখক একটি সুপরিকল্পিত স্বপ্নের সাহায্যে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সাধারণভাবে ছোট গল্পে একটি অখণ্ড ভাব বা ঐক্য থাকে, তা জীবনের একটি খণ্ডাংশ বলেই তাকে অখণ্ড-রূপে ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে দেখা সম্ভব। আর সেই খণ্ডরূপটিও হঠাৎ এক মুহূর্তে জ্বলে উঠে সমস্ত জীবনকে যেন উদ্ভাসিত করে তোলে। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষের উপকরণ এমন এক জগতের, যা আমাদের পুরাণ-চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত। স্বভাবতঃই পুরাণসিদ্ধ চরিত্রগুলির সমাবেশে এবং কুড়রাম বা কালিন্দীর আবির্ভাবে এমন কোন সত্য তীক্ষ্ন হয়ে ওঠেনি যা আমাদের সমাজের বা ব্যক্তির কোন সমস্যাকে তুলে ধরে। কেননা এ গল্পের পরিবেশ ভিন্ন, চরিত্র পৌরাণিক এবং আবেদন অসঙ্গতিজনিত হাস্যরসে। লেখক অতি পরিচিত অথচ কৌশলময় একটি আঙ্গিক ব্যবহারে গল্পের সমস্ত কাহিনীকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। গল্পের শেষে মহাদেব কুড়রামকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'বাপু, তুমি সশরীরে কি প্রকারে যমালয়ে আগমন করিলে?' কুড়রাম তার আসার বিবরণ ব্যক্ত করে আত্মপক্ষ সমর্থনে যে যুক্তি দেয় তা একাধারে তার চরিত্র ও গল্পের রসকে এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত করে তোলে। তারই ভাষায় "আমি এখানে পেঁাছিয়া মহা দুর্ভাবনায় পড়িলাম, অপরিচিত দেশ, সহায়-সম্পত্তিহীন, কি করি, অবশেষে কাগচ-কলম লইয়া একখানি পরোয়ানা দ্বারা যমকে পদচ্যুত করিলাম। আত্মপক্ষ সমর্থনে হুজুরের নামটি জাল করিয়াছিলাম। অধীনের সে অপরাধ মার্জনা করিতে হইবে। বিশেষ, 'ধায়ে-ন্নিতং মহেশং রজত গিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং' ধ্যান করিতে করিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। যে কুড়বাম লোচনপুরের কাছারির আটচালায় শুয়ে নিদ্রাভিভূত এবং পরে তারই নিদ্রিতাবস্থায় যে কাহিনী পাঠককে যমপুরী, স্বর্গ ও কৈলাসের বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত করে সমস্ত গল্পের মধ্যে তাকে নিদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায় না। অথচ, 'কুড়রাম নিদ্রাভঙ্গে দেখেন, লোচনপুরের কাছারি বাড়ীর আটচালার পার্শ্বস্থ কামরায় চারপায়ার উপব শয়ন করিয়া আছেন'—এ-কথা বলে গল্প শেষ করেছেন লেখক। তখনই পাঠকের সুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত হয়—স্বপ্নাবস্থার পরিবেশ থেকে ফিবে আসে বাস্তবে, আর পুরাণ-সিদ্ধ-চরিত্রগুলির সমস্ত অসঙ্গতি যেন আরো মধুর হয়ে ওঠে। বাস্তবে যমের দুঃখ-কথা কল্পনা করা শক্ত, কিন্তু স্বপ্নে সম্ভবতঃ তা নয়।

কুড়রাম চরিত্র বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়। চণ্ডীমঙ্গলের 'ভাঁড়ুদত্ত' কিংবা

আলালের ঘরের দুলাল-এর ঠকচাচা তার পূর্বপুরুষ। কিন্তু যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ গল্পটির কাহিনী, পরিস্থিতি ও চরিত্র চণ্ডীমঙ্গলের বা আলালের ঘরের দুলালের সহধর্মী নয়, তা তার আবির্ভাবকালে স্বতন্ত্র মর্যাদা নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা কথা-সাহিত্যের ছোট-বড় গল্পধারায় 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' গল্পটির একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ঊনবিংশশতক থেকে সুরু করে নিতান্ত আধুনিক কাল পর্যন্ত যে কথা-সাহিত্যের উদ্ভব বিকাশ ও ক্রমপরিণতি, সেখানে যে ধরনের লেখাগুলির প্রাচুর্য তা অধিকাংশ সময়েই করুণ রসকে প্রাধান্য দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং এঁদের সমকালের লেখায় একথার পরিচয় পাওয়া যাবে। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যতিক্রম সম্ভবতঃ ঊনিশশতকে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আধুনিক-কালে রাজশেখর বসুর মধ্যে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভিন্ন অর্থে tragic সাহিত্যের বিপরীতধর্মী। ত্রৈলোক্যনাথের যে স্বতন্ত্র পরিচয় তাঁর গল্পে, উপ-ন্যাসে, তা স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ কৌতুকে মধুর। জীবনের যে অসঙ্গতি অন্য লেখককে গভীর দুঃখের সঙ্গে পরিচিত করেছে, ত্রৈলোক্যনাথের কাছে সেই অসঙ্গতিই সমস্ত জ্বালাকে সরিয়ে স্নিগ্ধ ও সুস্মিত কৌতুকের দিব্যচ্ছটায় বিকশিত। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও যেন গভীর অভিজ্ঞতার সূত্রে বাঁধা পড়ে; ক্রোধের পরিবর্তে কৌতুকের রসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অসঙ্গতি। ত্রৈলোক্যনাথ সেই জীবন অভিজ্ঞতার রচয়িতা এবং এই অর্থে দীনবন্ধুরও উত্তরাধিকারী। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ গল্পটি যে ত্রৈলোক্যনাথকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ এই গল্পটিকেই একটু ভিন্ন উপকরণে সাজিয়ে একই পরিবেশে বর্ণনা করা।১ সেখানেও যমপুরীর বর্ণনা, যমের পদচ্যুতি, পাপীতাপিদের উদ্ধার, পরিশেষে দেবতাদের দর্শন এবং মর্ত্যে ফিরে আসার পরিচয় আছে। কৌতুহলীর দৃষ্টিতে দীনবন্ধু ও ত্রৈলোক্যনাথের এই কাহিনী দুটির অভিন্নতা চাপা থাকে না। 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' গল্পটির এই বৈশিষ্ট্য আলোচনার পর তাকে শুধু প্রথম ছোট গল্প নয়, হাস্যরসাত্মক গল্পধারার প্রথম গল্প বলেও স্বীকার করতে হয়।

১। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, **নয়নচাঁদের ব্যবসা**, পঞ্চম-অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ পৃ ৬৮-৬৫।

প্রথম প্রকাশ জন্মভূমি ১৩০১-১৩০২, পরে ভূত ও মানুষ (১৮৯৭) গ্রন্থে সংকলিত।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯২৯।

নীলদর্পণ নাটকের পটভূমি

সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক তিনবছর পরে নীলদর্পণ নাটকের প্রকাশ ১। এই নাটকের পটভূমিতে বাংলাদেশের এক বিরাট বিদ্রোহ আত্মগোপন করে আছে। আধুনিক কালে নীলদর্পণ নাটককে সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত শিল্প বলে মনে হতে পারে ২—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নাটক এক বিশেষ সময়ের বাংলাদেশকে পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছে, তা শুধুমাত্র উত্তেজনা বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে নয়। কর্ম উপলক্ষে বাংলা ও বৃহৎ বাংলার নীলকর অধ্যুষিত স্থানগুলির সংগে দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল এবং এই অঞ্চলগুলির চাষি রায়ত সম্প্রদায়ের অসহায় অবস্থাকেও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। মহৎ নাট্যকারের দৃষ্টিতে নীল-চাষের পরিনামকে নীলদর্পণ নাটকে রূপ দেওয়ার যে চেষ্টা তা প্রকৃতপক্ষে একটি জাতির অখণ্ড জীবনকে তুলে ধরেছে। তাই নীলদর্পণ নাটকের গভীর যন্ত্রণা গোলক বসুর পরিবারের মধ্যে সংহত হয়ে নেই তা ব্যাপ্ত হয়েছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। এ নাটকের জীবন স্পন্দন অনুভব করার জন্যে নাটকের পটভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় এবং বলা বাহুল্য তা ইতিহাস সমর্থিত।

ইতিহাস জাতির জীবন বিচ্ছিন্ন কোন সত্য নয়। ব্যক্তি ও সমাজের অনুকূল ও প্রতিকূল ঘাত-প্রতিঘাত, আশা-আকাঙ্ক্ষার অন্তরালে ইতিহাস আপন পথ নির্ণয় করে নেয়। যখনই জাতির প্রাণশক্তি এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীল অবিরত চঞ্চল ঘটনা প্রবাহের সংগে নিজের সংগতি হারায় তখনই দেখা দেয় অব্যবস্থা। রাজনীতি বা দেশ শাসনের ক্ষেত্রে তা মাৎসন্যায় এবং নীতি ও জীবন-চর্চার ক্ষেত্রে তা অবক্ষয়। ইংরেজ রাজত্বের সূচনা থেকেই এই অবক্ষয় দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী ইংরেজরা দেশের শাসন ব্যবস্থার প্রতি তেমন মনোযোগী হননি যতখানি মনোযোগী হয়েছিলেন বাণিজ্যিক বুদ্ধিতে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চুক্তি মত প্রাপ্য টাকা ছাড়াও ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে

১। ২রা আশ্বিন, ১৭৮২ শকাব্দ (১৮৬০ খৃ) ঢাকা, রামচন্দ্র ভৌমিকের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

২। ১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে দীনবন্ধু মিত্রের সুবিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হইল। এই আর এক ঘটনা যাহাতে বঙ্গসমাজে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিল, কোন গ্রন্থবিশেষে যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না। 'নীলদর্পণ' কে লিখিল, তাহা জানিতে পারা গেল না, কিন্তু বাসাতে বাসাতে 'ময়রানী লো সই নীল গেজেছ কই' ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলিল।
শিবনাথ শাস্ত্রী, **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ**, ২য় সং ১৯৫৭।

ক্লাইভের ব্যক্তিগত উপার্জনের কয়েক কোটি টাকা ইংরেজ বণিকের যে পরিচয় বহন করে সেই নির্মম ধনাকাঙ্ক্ষা নীলকরদের মধ্যে আরো তীব্র রূপে প্রকাশ পেয়েছে। রেভারেণ্ড জেমস লংয়ের বিবৃতিতে, ইণ্ডিগো কমিশনের সাক্ষ্যে এবং অনেক বিশিষ্ট মানুষের চিঠিপত্রে এর যথেষ্ট পরিচয় আছে ১। লক্ষ্য করতে হয় সিপাহী বিদ্রোহ আকস্মিক হলেও তার প্রস্তুতি ছিল অনেক বেশি অথচ সিপাহী-বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা ব্যাপকভাবে ইংরেজ রাজপুরুষদের তেমন সচেতন করেনি। তার প্রমাণ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সাঁওতাল ও নীল বিদ্রোহ। অবশ্য নীলবিদ্রোহ অন্য দুটির চেয়ে গভীর ও ব্যাপক। আর নীলদর্পণ নাটককে সম্পূর্ণ অনুভব করার জন্যে নীলকর পীড়িত বাঙালী সমাজের চিত্র যেমন তুলে ধরার প্রয়োজন, তেমনিই প্রয়োজন নীলকরদের নীচতা ও নিষ্ঠুরতার চিত্রও। অপ্রাসঙ্গিক হওয়া সত্ত্বেও এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। উইলিয়াম হিকির (১৭৭৭—১৮০৮) স্মৃতিকথায় এর উল্লেখ আছে। কলকাতায় ডক তৈয়ারীর জন্যে (Radapore খিদিরপুর) কর্ণেল ওয়াটসনের সঙ্গে কোম্পানীর চিফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বাংলাদেশে এসেছিলেন মেজর আর্কিবল্ড ক্যাম্পবেল। গবর্ণমেণ্ট ডক তৈরীর জন্যে জমি দান করলেও তাতে এ নির্দেশ ছিল স্থানীয় মানুষদের জমির ন্যায্য ক্ষতিপূরণ যেন দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক বাঙালীই তাদের বসতভূমি বা ভিটের মায়া পরিত্যাগ করতে পারেনি। "অবশেষে ওয়াটসন সাহেব একদিন একদল সেপাই পাঠিয়ে তাদের ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে দিলেন। তারপর রাতারাতি সেই জায়গা চষে একেবারে মাটির সঙ্গে এমনভাবে সমান করে দিলেন যে, দেখে সেখানে কোনদিন লোকেয় বসবাস ছিল বলে চেনাই যেত না।২ এ সম্পর্কে হিকি আরো বলেছেন যে, এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠিত হওয়া সত্ত্বেও "যারা উৎখাত হয়েছিল, তারা আর পৈতৃক ভিটেতে

১। "Mr. E. Delatour, then the Magistrate of Faridpur, said before the Indigo Commission : there is one thing more I wish to say ; that considerable odium has been thrown on the missionaries for saying that 'not a chest (of ?) Indigo reached England without being stained with human blood.' That has been stated to be an anecdote. That expression is mine and I adopt it in the fullest and broadest sense of its meaning."

From a letter of Rev. C. Bomwesch, dated 25.1.1760 to the Editor, Indian Field. Pradhan, Sudhi in collaboration with Sen Gupta, Sailesh, *Nil Darpan.*

২। বিনয় ঘোষ, **সুতানুটি সমাচার**, ১৯৬২, পৃঃ ৪৯।

ফিরে আসতে পারেনি, এই পর্যন্ত জানি। ক্ষতিপূরণ তারা পেয়েছিল অথবা আদৌ পেয়েছিল কিনা তা জানিনা।"১ খিদিরপুরের গোকুল ঘোষের সংগে জমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা কোম্পানীর সংগে হয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনা নীল বিদ্রোহের বহু পূর্বে হলেও জোর করে জমি গ্রহণ করার মধ্যে ইংরেজ বণিকের স্বার্থ সম্বন্ধই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নীলকরদের সংগে এই মনোভাবের কোন পার্থক্য নেই।

"১৭৮৯ অব্দের ২৯শে অক্টোবরের সরকারী ঘোষণাপত্র থেকে জানা যায় যে Louis Bonnaud (ফরাসীয়) ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম ইউরোপীয় নীলকর।"২ Louis Bonnaud৩ সম্পর্কে প্রমোদ সেনগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন— বাংলা দেশে ১৭৭৭ সালে লুই বনো (Louis Bonnaud) নামক একজন ফরাসী বর্তমান প্রণালীতে প্রথম নীল প্রস্তুত করা আরম্ভ করেন। এই ফরাসী বণিকটি ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে এসে চন্দননগরের নিকট তালডাঙ্গা ও গোন্দলপাড়ায় দুটি নীলকুটি স্থাপন করেন। নীলের ব্যবসায়ে বনো প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক হন। আরো অনেক স্থানে তিনি নীলকুঠি স্থাপন করেন।"৪ ঢাকার ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলায় নীলের কুঠি ছিল মাত্র দুটি। নীলের ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক হওয়ার ফলে তা ক্রমশই প্রসারিত হতে থাকে। বিশেষ করে রাজানগর, সিরাজাবাদ, ইছাপাশা, সাভার প্রভৃতি অঞ্চলে নীলচাষ এত বৃদ্ধি পেল যে, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় মোট ৩১টি নীলের কুঠি সংস্থাপিত হল।৫ যতীন্দ্রমোহন রায় তাঁর ঢাকার ইতিহাসে নীলকরদের ব্যবসার এবং নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা বলেছেন। সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর খুলনার ইতিহাসে নীলকুঠিগুলির বিস্তৃত পরিচয় আছে। Indigo Commission Report, Gastrell's Statistical Reports বা Grant's Minute-এ ফরিদপুর, যশোর ও নদীয়ায় উৎপন্ন নীলকে পৃথিবীর

১। পূর্বোক্ত।

২। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, **কলিকাতা সেকালের ও একালের**, ৬৭৬।

৩। এ সম্পর্কে বিশেষ দ্রষ্টব্য গ্রন্থ—Rainey, H. J. *Biographical sketch of the First Indigo Planter in India,* Asian. March 18, 1879.

৪। প্রমোদ সেনগুপ্ত, **নীল-বিদ্রোহ ও বাংগালী সমাজ**, ১৯৬০, ৫।

৫। Dr. Taylor-এর Topography of Dacca তে এই বিবরণ আছে। দ্রষ্টব্য : যতীন্দ্রমোহন রায়, **ঢাকার ইতিহাস**, ১ম খণ্ড ১৯২২, ১৪০।

শ্রেষ্ঠতা দেওয়া হয়েছে।১ সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর ইতিহাসে Bengal Indigo Co.-র উল্লেখ করেছেন। Bengal Indigo Co. নদীয়া-যশোহরের সবচেয়ে বড় 'কানসরন' ছিল এবং এর অধীনে চারটি প্রধান 'কানসরন' ছিল। মোল্লাহাটি কানসরনের কুঠির সংখ্যা ছিল ১৭টি। বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানীর প্রবল প্রতাপান্বিত Mr. R. T. Larmour মোল্লাহাটিতে থাকতেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে জেমস ফরলঙ (J. Forlong) মোল্লাহাটি কানসরনের প্রধান হয়ে আসেন এবং এই কুঠির অত্যাচারকে লক্ষ্য করেই দীনবন্ধু নীলদর্পণ রচনা করেছিলেন।২ দ্বিতীয় প্রধান কানসরেনের নাম ছিল কাঠগড়া কানসরন। কপোতাক্ষী নদীর পশ্চিম পারে ও মোল্লাহাটির উত্তর দিকে এর অবস্থান ছিল। এখানেই প্রথম নীল বিদ্রোহ হয়।৩ কুমুদনাথ মল্লিক তাঁর নদীয়া কাহিনীতে এই ধর্মঘটের উল্লেখ করেছেন। স্যার জন পীণ্টার গ্রাণ্ট ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের Lieutenant Governor হলেন। "এ সময়ে নদীয়া ও যশোহর জেলায় বহু প্রজা ও জমিদারবর্গের সহিত অনেক অত্যাচারী নীলকরের প্রকাশ্য-ভাবে বিবাদ বাধিয়া উঠে এবং লক্ষ লক্ষ প্রজা ধর্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হয় যে, নীলের দাদন লইবে না বা নীলের চাষ করিবেন না"।৪ প্রকৃত পক্ষে বাংলা দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের এই ধর্মঘটের অন্তরালে নীলচাষজনিত দীর্ঘ দিনের বেদনা জমে ছিল।৫ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের অষ্টম আইন (Regulation VIII of

১। The Indigo manufactured in this side of India is of prime quality and that of lower Bengal, specially which is produced in the districts of Nuddea and Jessore is probably the very finest in the whole world. *Indigo Commission Report,* para 72, 21. আরো দ্রষ্টব্য ঃ The finest Indigo that the world produces is, I believe, generally admitted to that of Bengal, and second to none is the indigo of Jessore and Fureedpore. *Gastrell's Statistical Reports,* 1868, II.

২। সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৯২২ (১৩২৯) পৃঃ ৭৫৮-৭৯০। ৩। সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত।

৪। কুমুদনাথ মল্লিক, **নদীয়া কাহিনী**, ২য় সং, ১৯২২ (১৩১৯)।

৫। It was an unwholesome system, but long went on without any serious outbreak. Eventually, however, when prices improved and other products became more profitable, the riots felt very much aggrieved at being compelled to sow indigo on the planters' own terms. About the time when the rent question was settled by the new law, there had been a combination of the ryots and an outbreak against the indigo system known as the "Indigo rebellion". Campbell, Sir George, *Memories of My Indian Career.* ed. Bernard, Sir Charles E, II, 1895, 104.

1819) অনুযায়ী জমিদারদের পত্তনী তালুক বন্দোবস্ত করার অধিকার দেওয়া হল। ফলে অসংখ্য তালুকের সৃষ্টি হল এক একটি পরগণায়। নীলকরেরা পত্তনী নিলেন অনেক তালুকের। এমন কি দেশীয় বিত্তশালীরাও যোগ দিলেন নীলের ব্যবসায়ে। সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন, "সাহেবদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কল চালাইবার জন্য উহারা সাহেব ম্যানেজার রাখিয়াছিলেন"। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ আইন (Regulation VI of 1823) নীলকরদের পক্ষে অনুকূলতার সৃষ্টি করলো। কেননা এই আইনের বলে "নীলকর যে সব চাষীদের টাকা বা নীল বীজ দাদন দিয়েছে তাদের জমির উপর একটা বিশেষ স্বত্ব ও অধিকার (a lien and interest in the land) পেল।" কিন্তু এই আইনের অধিকারে নীলকরেরা খুশি হয়নি। তাদের নতুন দাবীর ভিত্তিতে তৈরী হল ১৮৩০ সালের পঞ্চম আইন (Regulation V of 1830)। এই আইনে বলা হল দাদন গ্রহণকারী কৃষকের পক্ষে নীলের চাষ না করা আইনসঙ্গত নয়—অতএব এই আইন অনুযায়ী নীল চাষে অসম্মত দাদন গ্রহণকারী কোন কৃষকের বিরুদ্ধে ফৌজদারির অভিযোগ আনা যায় এবং অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে কৃষককে কারাবাস করতে হবে।১

এই আইনগুলি নীলকরদের ধনাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করতে প্রকৃতপক্ষে সহায়তা করেছে। বাংলা দেশের অধিকাংশ গ্রামের প্রান্তে নীলকরদের এই লোভ ব্যাপ্ত হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে। নীল আন্দোলনের এই পটভূমিকে কেউ কেউ অনুভবও করেছিলেন। নীলকরদের অত্যাচারের পরিণাম সম্পর্কে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন Lord Canning একটি চিঠিতে—

"I assure you that for about a week it caused me more anxiety than I have had since the days of Delhi, and from that day I felt that a shot fired in anger or fear by one foolish planter might put every factory in Lower Bengal in flames."২

বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার ইতিহাসে নীলকরদের অত্যাচার কাহিনী যত স্পষ্ট তার চেয়ে তা অনেক স্পষ্ট সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায়। ঘটনার বিবরণে ইতিহাস যত বেশি মনোযোগী, তার চেয়েও বেশি সত্য সন্ধানে। কিন্তু সাময়িক পত্র-পত্রিকাতে ঐতিহাসিক দৃষ্টির দূরপ্রসারী গভীরতা না থাকলেও প্রাত্যহিক ঘটনাগুলি স্থান পায়। আর তা যদি গুণের দিক থেকে বলিষ্ঠ হয় তখন সেই ঘটনাও ইতিহাসে স্থান করে নেয়। নীলকরদের ভয়াবহ

১। এই আইন বিধিবদ্ধ হবার দু বছর পরে মে মাসে একমাত্র যশোহর জেলাতেই ১৬২ জন চাষী নীলের ব্যাপারে জেলে রয়েছে।

২। প্রমোদ সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭।

অত্যাচারে বাংলা দেশের সমগ্র কৃষক-জীবন এত বেশি আক্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়েছিল যে, তা সাময়িক উত্তেজনা বা বিদ্রোহের সত্যে থেমে থাকেনি, তা বস্তুত ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা পেয়েছে। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নীলচাষ ও নীলকর সংক্রান্ত তথ্যের গুরুত্ব অসাধারণ। হরকরা, সংবাদ প্রভাকর, Hindoo Patriot বা Indian Field ইত্যাদি পত্রিকায় নীলচাষ ও নীলকরদের অত্যাচার প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। দরিদ্র কৃষককে জোর করে নীলচাষে বাধ্য করা, পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করা ছাড়াও আরো হীন অপরাধে নীলকরেরা দুষ্ট ছিলেন। এই সময়ের বিভিন্ন লেখকদের লেখায় চিঠিপত্রে এ সম্পর্কে বারংবার উল্লেখিত হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০—১৮৬৬) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নীলচাষের কুফল সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে লেখক অত্যাচারের ও কৃষকদের গভীর যন্ত্রণার বিশদ পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছিলেন।১ আলালের ঘরের দুলালেও নীলকরদের এই অত্যাচারের কথা চিত্রিত হয়েছে।২ নীল-বিদ্রোহকে যারা

১। এক্ষণে চতুর্দিক হইতে এই কথাই শ্রুত হওয়া যাইতেছে যে, নীলকরদিগের অত্যাচার তদপেক্ষায় (ভূস্বামীদিগের) ভয়ানক, তাঁদের দৌরাত্ম্যে প্রজাকুল নির্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে। বাস্তবিক যেমন কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দুই ভিন্ন ভিন্ন সমুদ্র দৃষ্টি করিলে, সহসা তাহাদের পরিমাণ নিরূপণ ও পরস্পর তারতম্য নিশ্চয় করা যায় না, কারণ তাহাদের উভয়কেই অসীমপ্রায় বোধ হয়। সেইরূপ ভূস্বামী ও নীলকরদিগের অশেষ প্রকার উপদ্রবের বিষয় পর্যালোচনা করিয়া পরস্পর তারতম্য করা দুষ্কর। কারণ, উভয়েরই অত্যাচারজনিত দুঃসহ দুঃখরাশির সীমা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত ও বাক্যপথের অতীত। নীলকরদিগের কার্যের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কেবল প্রজা পীড়ন করিয়া স্বকার্য উদ্ধার করাই তাঁহাদের সংকল্প।

অক্ষয়কুমার দত্ত, **পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা** ৪, ৮৪, ১৮৫০।

২। যশোহরে নীলকরের জুলুম অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রজারা নীল বুনিতে ইচ্ছুক নহে, কারণ ধান্যাদি বোনাতে অধিকলাভ, আর যিনি নীলকরের কুঠিতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন, তাহার দফা একেবারে রফা হয়। প্রজারা প্রাণপণে নীল আবদ্ধ করিয়া দাদনের টাকা পরিশোধ করে বটে, কিন্তু হিমারের লাঙ্গুল বৎসর বৃদ্ধি হয় ও কুঠেলের গোমস্তা ও অন্যান্য কার পরদাজের পেট অল্পে পুরে না। এইজন্য যে, প্রজা একবার নীলকরের দাদনের সুধামৃত পান করিয়াছে, সে আর প্রাণান্তে কুঠির মুখো হইতে চায় না, কিন্তু নীলকরের নীল না তৈয়ার হইলে ভারি বিপত্তি।

টেকচাঁদ ঠাকুর, **আলালের ঘরের দুলাল**। (বসুমতীর বসন্ত উপহার) (১৩১৩) ১৯০৯, ১৫১।

আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে প্রজাদের সমর্থন করেছিলেন, শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১) তাঁদের অন্যতম। অনাথনাথ বসু শিশিরকুমার ঘোষের জীবনীতে লিখেছেন, "নদীয়া ও যশোহর জেলায় নীলকরদিগের অত্যাচারের মাত্রা অন্যান্য জেলা অপেক্ষা অতিরিক্ত। নীল উৎপাদন উপলক্ষে নরহত্যা, গো-হত্যা, গৃহদাহ, সতীর সতীত্ব নাশ প্রভৃতি কত পাপকর্মই যে সম্পাদিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতিকারের আশায় রাইতগণ বিচারালয়ে উপস্থিত হইত বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফলপ্রাপ্ত হইত না। কারণ তদানীন্তন ইংরেজ রাজপুরুষেরা নীলকরদিগের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগকে ভয়ও করিতেন"।১ Indigo Commission-এ সাক্ষীর বিবৃতিতে Sir Ashley Eden বলেছিলেন—

"There certainly was failure of justice, which in my opinion, may, to a great extent, be attributed to the strong bias, which the governor and many of the officers of the Government has always displayed in favour of those engaged in this particular cultivation. .I consider that it has frequently been the case that the Government officials have sacrificed justice to favour the planters. I will go further and say that, as a young Assistant, I confess, I have favoured my own countrymen in several instances."

সংবাদ প্রভাকরে নীলকরদের প্রতি জেলা বিচারকদের এই পক্ষপাতিত্বের পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে। বাংলার লেফেটনান্ট গভর্নর 'অনারেবল' হালিডে সাহেব সম্পর্কে সংবাদ প্রভাকরে স্পষ্ট ভাষায় এ কথা লেখা হয়েছে যে, কৃষকদের দুর্গতির সম্পূর্ণ বিবরণ জানা সত্ত্বেও গভর্নমেণ্টের কাছে রিপোর্ট পেশ করার সময় তিনি তার উল্লেখ করেন না। এবং "মফঃস্বলে যে সমস্ত খোদাবন্দ ধর্মাবতারেরা অসংখ্য প্রজার ধন-প্রাণের উপর বাধ্য, জিলার অবস্থা দর্শন অথবা শিকারে গমন করিলে নীলকুঠিতেই ভোজন, শয়ন ও নীলকর সাহেবদিগের কন্যাপুত্র ও প্রেয়সীর সহিত আমোদ-প্রমোদ ও নীলকরের হস্তিতেই আরোহণপূর্বক ব্যাঘ্র, হরিণ, মহিষ, শূকরাদি পশু হনন করিয়া থাকেন, সুতরাং নীলকরের মোকদ্দমায় পক্ষপাত করিতে হইলেও অনায়াসে করিয়া বসেন"।২ এ সম্পর্কে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেক নীল-

১। অনাথনাথ বসু, **মহাত্মা শিশিরকুমার** (১৩২৭) ১৯২০।

২। বিনয় ঘোষ, **সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র**, ১৯৬২।

করদের সঙ্গে বিচারকদের আত্মীয়তা ছিল। "ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের নিকট নীলকর সাহেবদের অত্যাচারঘটিত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে সুবিচার হয় না, যেহেতু প্রজারা হুজুরকে জুজুর অপেক্ষা অধিক ভয় করে, সুতরাং তাহার সমীপস্থ হইয়া সকল বিষয় জ্ঞাত করিতে অক্ষম হয়, কেবল আমলা-দিগেই হর্তাকর্তা বোধ করে, কিন্তু নীলকরদিগের মধ্যে অনেকেই ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষের হস্ত ধরিয়া সেকহ্যান্ড করেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটদিগের সহিত কোন কোন নীলকরের আলাপ ও কুটুম্বিতা আছে"।১

নদীয়ার হাসখালি (Hanskhally) থেকে W. L. Hutchinson Bengal Hurkaru পত্রিকার সম্পাদকের কাছে একটি দীর্ঘ চিঠিতে সেই সময়ের নীলকর ও রাইয়তদের মনোভাব পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। ঐ চিঠিতে নীলকর ও নীলকর পক্ষীয়দের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ আছে। তিনি লিখেছেন—"We hear them (নীলকররা) complaining against the ryots, and calling them rogues, niggers, liers and hundred similar epithets. If the ryots are so bad, why not avoid doing business with them? Do not engage them, nor make advances for Indigo leaf."

ঐ চিঠিরই শেষ অংশে লেখক স্পষ্টকরে বলেছেন যে, নীলকরেরা তাদের নিজেদের স্বার্থেই রাইতদের মুক্তি দিচ্ছে না—"It is the planter that is anxious to have the ryots do so, for it is less expensive."

নীলচাষের চুক্তিপত্র (Contract) যে কত নির্মম ছিল তার উদাহরণ আছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। একটি চুক্তিপত্র সম্পূর্ণ উদ্ধার করা যাক।

To—

This is written by me Scheedam Doss, this deed of contract for growing indigo whereas yourself and your brother—purchased in 1260 sal the—factory and you have since by partition and demarkation come into sole possession of the above factory and its outstangs; and whereas on the adjustment of the account resting on my previous contract to grow indigo for the above factory there appears a balance of rupees two against me. In consideration of those two rupees, and two rupees more which I now take in advance, I engage to cultivate two bighas of land

১। বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত।

with indigo plant for your above named factory, from 1262 to 1271 sal, being a period of ten years; I engage to deliver this produce annually at the factory, and according to former custom the price thereof shall be calculated at the rate of nine bundle per rupee. The price of seed, cost conveyance, and whatever other means of cultivation I may receive from the factory, shall be deducted therefrom. Should any balance remain in my favour, I shall receive it in cash. Should the balance be against me, I will discharge it by growing indigo in the ensuing year on as many beeghas as shall be covered by the ammount thereof, at the rate of two rupees per beegha. Should the price of the plant cover the amount of the advance I shall annually take an advance to the extent above mentioned during the term of this engagement. Should I make default in cultivating or selling the produce to anybody else, I shall be liable to damages to the extent of the value of the corresponding quality of wrought dye. To this effect I execute this deed according to the contract I have entered into.

Dated—".১

হুগলি জেলার কোন এক নীলকুঠির থেকে উপরি উদ্ধৃত চুক্তিপত্র তুলে ধরে সম্পাদক প্রশ্ন করেছেন—"Whether it is not a record of tyranny and oppression, or misrule and misgovernment?"

এই নিষ্ঠুর অত্যাচার নীলচাষ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই প্রকাশিত। দাদন দেওয়ার যে নির্মম ইতিহাস নীলদর্পণ নাটকে দেখা গেছে তা সমকালের পত্রিকাগুলিতে আরো তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। বলপ্রয়োগে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করানোর জন্য অসংখ্য কৃষককে যেমন বন্দী থাকতে হয়েছে আলোবাতাসহীন গুদাম ঘরে তেমনি সেই সংগে অনাহার ও শ্যামচাঁদ প্রয়োগে মৃত্যুর সংখ্যাও কম নয়। আর শুধু চাষীই নয়, সেই সঙ্গে তদানীন্তন কালের অনেক জমিদারদের অবস্থাও হয়েছিল অনুরূপ। Hindoo Patiot পত্রিকায় এই দাদন দেওয়ার ব্যাপারকে Ceremony of Advancing বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। নীলমামদো না নীল-

১. Hindoo Patriot, April 7, 1860. *Selections From Papers On Indigo Cultivation in Lower Bengal with an Introduction and A Few Notes by A. Ryot,* 1860, 22

দানবের দাদন দেওয়ার প্রণালীর সামনে দাঁড়িয়ে মৃতপ্রায় কৃষক সম্প্রদায় রুদ্ধ কণ্ঠে আর্তনাদ করার চেষ্টাই করেছে। আর এর পরিবর্তে মিথ্যা জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়েছে তাদের। দাদন দেওয়ার আড়ম্বরপূর্ণ বিবরণের সঙ্গে পরিচিত হলে নীলদর্পণ নাটকের কৃষক-জীবনের হাহাকারকে সম্পূর্ণভাবে অনুভব করা যাবে। পত্রিকা থেকে সমস্ত অংশটুকু উদ্ধার করার প্রয়োজন আছে।

"The worship of the blue Mammon is yearly inaugurated with the ceremony of making advances. Most our readers who hear so much of the liberality of the factory in making these advances and the rascality of ryot in not working it off have probably never witnessed it. A description will not be unacceptable to them.

About the month of Kartic and Aghran the factory ameen makes out a list of all the cultivator class of ryots inhabiting the villages which comprise a factory line, with number of ploughs and bullocks, and the extent of land which each individual is master of at the time, and submits it to the Gomastha or the native superintendent who, after consulting with his European superior as to the number of beeghas which would be that year laid under indigo plant nakes a distribution of the whole quantity, noting down opposite the names of the ryots in the list, and the number of beegahs which each of them would be required to cultivate. This is done by the factory servants of course without consulting the cultivators or even endeavouring to ascertain whether they would be able to meet the engagemants to be imposed upon them. A month or fifteen days after this, the ryots are ordered to repair to the factory, and the factory Tageedgir brings them such as a shephered would drive in his flock. Very generally the advance money is paid by the native Gomastha, but in some cases, to meet conscience and public opinion, the task is undertaken by the superintendent himself. The ryots crowd in the open compound before the verandah, where the Saheb sits in a chair surrounded by his native subordinates, who squat on the floor with the account books and with purses containing money. If there be

a big tree in the compound the ryots are fortunate enough to obtain some protection from the sun, in not they are obliged to stand exposed to its rays. The muhurir of the factory then calls out the name of a ryot from the list before him and then sings aloud to the effect ;—"You Nazir Mahmood of Neelcooteepoor, last year you cultivated two beegahs of land with indigo, but as by the report of the ameen it appears that you have purchased additional cattle, you are to cultivate one beegha more this season, you are booked for three beeghas from this year. But factory account show a balance of four rupees against your name, so deducting that sum from six rupees, which the ammount to which you are entitled this season for three beegahs, there are left two rupees, from which again deduct two annas on account of a stamp paper for your Kabooleut, 12 annas for the price of indigo seed to be supplied to you at four annas per beegah and six annas for the repair of roads at one anna on every rupee, in all making a total of one rupee and four annas, the sum which you are now to receive for the cultivation of three beegahs amounts to 12 annas. Now come forward and take it, the Saheb will pay you with his own hands. "No sooner is the speech ended than, "Dohye Saheb," Nazir Mahmood screeches out "Bo not burden me with an additional beegah, for I will not be able to cultivate so many as three beegahs. I come here with the purpose of soliciting you to relieve me of one of the two beegahs which I have hitherto sown with indigo. For God's sake, take mercy on me Saheb; Allah has taken away from me only ten months ago my eldest son, who was a prop of my old age and the chief assiatant in my labour of the field, he it was who ploughed your indigo lands, and it was through his exertions that my whole family got a mouthful of paddy everyday to support our strength. But he has forever left us, and his two brothers are mere boys who have not yet learned to hold the plough. Since my eldest boy's death other afflictions have come upon me, somehow or other I am afflicted with a sore leg, for

while, if I am not speedily cured, I will scarcely be able to go out to the fields myself. The new bullock reported by the Ameen was purchased by my son before his death, but has been mottgaged by me to defray the expense of his sickness and funeral. May God increase your riches and make you Governor of this country, but be kind enough to deliver me from your Khata." "Neel hoga" is the brief answer of the Saheb. "Dohey Saheb", again shrieks out the man. A reply as brief as the first is impatiently vouchsafed, Nazir Mahamood becomes somewhat obstreperous, upon which Tageedgir and Chuprasee bound towards him and after shower of blows and slaps pull him forward. "Then kill me, you all' is the grumble with which Nazir Mahmood resigns himself to his fate. "Bring him here to receive his advance money" calls out the Mohurir, and the man is shoved forward close to the Saheb. "Hold forth your hand", the man with great reluctance obeys, and the superintendent drops three quarter pieces in his hands. The Saheb then asks him, "How now, have you got your money ?" "Yes, Sir," doles out Nazir, "but what am I to do with these three little silver bits ?" "Throw it in yonder stream of water, if you like", is the prompt reply. Another ryot is called. The same scene, with some little difference in the details, is enacted untill the whole of ceremony is concluded, or in some cases the Saheb, tired of the business, and hearing his Khansamah announce tiffin or breakfast, hastens to satisfy craving nature, leaving the remainder in the hands of the Gomastha." ১

সহায় সম্পদহীন পুত্র শোকাতুর রাইতের প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণের পরিণাম সহজেই অনুমেয়। এর দুঃখ এত গভীর যে তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখেনা। মনে রাখতে হবে, নীলকরদের এই অত্যাচারের অন্তরালে কখনো

১। Hindoo Patriot, March, 31, 1860, *Selection from Papers on Indigo Cultivation in Lower Bengal with an Introduction and a Few Notes by A. Ryot,* 1860, 19-21.

কখনো প্রকাশ্যে এদেশীয় কর্মচারীরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। নীল-দর্পণ নাটকের আমিন বা গোমস্তা সম্প্রদায়ই সেদিন সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্নই নয় বিপর্যস্তও করেছিল। সামান্যতম কারণেও তারা গ্রামের প্রধান কৃষককেও আঘাত করতে পিছিয়ে আসেনি। Hindoo Patriot পত্রিকায় নদীয়া জেলার শ্যামনগরের গরপোতা অঞ্চলের এক কুটীর গোমস্তার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। গোমস্তা ঐ অঞ্চলের নীল চাষীদের এই মর্মে আদেশ দেয় যে, নীল চাষের জমিতে কোথাও যেন কোনরকমের ঘাস বা আগাছা না থাকে! সাধারণতঃ জমি পরিষ্কারের জন্যে আগাছা বা ঘাস কেটে ফেলে সেই জমির ওপর পশু চরানো হত। অথচ যে আদেশ এল তা একেবারেই নতুন "In other words, indigo fields have never been known to require that particular mode of weeding by which Aous paddy fields were cleared," রাইতরা অন্য শস্যের ক্ষতির কথা বিবেচনা করে গোমস্তাকে টাকা দিয়ে আপোষ-মীমাংসা করলো। ৩০০৲ টাকায় ঐ মীমাংসা হল এবং ঠিক হল গ্রামের প্রধান ঐ টাকা তোলার দায়িত্ব নেবে। শ্যামনগরের প্রধান মোড়ল আমীর মণ্ডলের অনুপস্থিতির জন্যে তার ভাই কালু মণ্ডলের ওপব এই ভার পড়লো। কিন্তু কালু গ্রামের অন্যান্য কৃষকদের কাছ থেকে টাকা তোলার দায়িত্ব গ্রহণ না করে নিজের অংশটুকু কুঠির 'Tagidgeer' কাছে দিয়ে নিজের জমির কাজে যুক্ত হল। কালু মণ্ডলের এই অবাধ্যতার কথা শুনে গোমস্তা দু'জন শরকিওয়ালার সঙ্গে তাগিদগীরকে পাঠালো, কালুকে ধরে আনার জন্যে—"The Shurkiwallahs lost no time in proceeding to Kaloo's home, gave him a severe beating, bound his hands tightly behind his back, and were bringing him to the factory." গরপোতা দিয়ে যাওয়ার সময় কুঠির লোকেরা মুজদীন মণ্ডল বলে একজন বৃদ্ধ কৃষককে ঘরে বসে থাকতে দেখে সে কেন নীলচাষের জমি পরিষ্কার করতে যায়নি এই প্রশ্ন করে,—

"Moozdeen, in answer gave him to understand that he had already paid his share to the head man of the village, who were engaged in the collection; and in order to prove his assertion, offered to conduct them to the presence of the head man; upon which one of the peons through sheer wantonness, caught hold of his beard, and began dragging away saying 'come old hog, now show us the way to your fathers, Munduls.' The old man not being able to sustain the violence, fell down in a swoon with

his face on the ground, but his persecutors, instead of relenting, treated him with several kicks of his back."১

নীলকর ও তার অনুচরদের এই নৃশংস অত্যাচার সে সময়ের সমস্ত সৎ মানুষকে আত্মিক ক্ষেত্রে বিপন্ন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এই অত্যাচারের গভীরতা ও ব্যাপ্তির ফলে বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মের মানুষ নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেন। শুধুই যে মহাত্মা শিশিরকুমার বা হরিশ্চন্দ্র নীলকরদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন এমন নয়। বস্তুতঃ বহু ইংরেজ রাজপুরুষ, উচ্চ পদস্থ বাঙগালী কর্মচারী ও জমিদারদের পাশে ইংরেজ মিশনারিরা নীলকরদের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।২ অনেক সময় মিশনারিদের রক্ষা করার জন্যে প্রয়োজন হয়েছে রাজশক্তির। অবশ্য রাজশক্তি নীলকরদের যত অবজ্ঞা করেছে তার চেয়েও বেশি ঘৃণা করেছে মিশনারিদের।৩ নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদকে কেন্দ্র করে

১। *Hindoo Patriot,* January, 14, 1860. *From Papers on Indigo Cultivation in Lower Bengal with an Introduction and a few Notes by A. Ryot,* 1860, 106.

২। At a Missionary Conference which was that year (1856) held, that Rev. G. C. Cuthbert made the following remarkable statement :

"He had lived in an indigo factory for twelve months in the Krishnagar district. He had found the planters most hospitable and kind ; but all that he saw gave him the conviction that the system is a forced system, and is stained with oppression and cruelty."

The Indigo Blue Book, *The Calcutta Review,* June, 1860, 363.

৩। How long would the Missionaries remain in India, if they were not backed and protected by British bayonets ? The planters, being now deserted by those who hold bayonets at their command, are as a matter of course, thrown into the power of a hostile race who hate civilian missionary and planter in equal degree, or perhaps the missionary the most and the planter the least.

Brahmin and Pariahas, pp. 69-70, ed. Pradhan, Sudhi and Sen Gupta, Sailesh, *Nildarpan, Introduction.*

রেভারেণ্ড জেমস লংয়ের কারাদণ্ড ও জরিমানার পেছনে বিচারক সম্প্রদায়ের এই মনোভাব কাজ করেছে এমন অনুমান অসঙ্গত নয়।

রাজা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নীল চাষকে সমর্থন করে-ছিলেন এবং রাম মোহনের নীলচাষ সংক্রান্ত মনোভাব নীলকরদের সহায়তাও করেছে। রামমোহন লর্ড বেণ্টিকের সময়ে একথা প্রকাশ করেছিলেন যে বাংলাদেশের নীলচাষের অঞ্চলগুলি দেখে তাঁর এ-কথাই মনে হয়েছে যে নীলচাষীরা অন্যান্য চাষীর তুলনায় বেশি বিত্তবান। রামমোহনের এই মনো-ভাব এবং তার সত্যতা কতখানি এ সম্পর্কে পত্রিকায় আলোচনা হয়েছে। তা উদ্ধার করা যেতে পারে—

"The great authority brought forward to confute charges against the planting system is Rammohan Roy, who declared in the time of Lord W. Bentinck that he had lately take tour through Bengal, and did not notice that the ryots in indigo districts were worse off than the rest of the people. He even thought them better clothed than the generally of the natives. But what did Rammohun Roy know of the matter ; on a question of unitarian doctrine, we do not doubt that he was a great authority, but he never was in a position to speak with authority as to the condition of the people in indigo districts ; he made a hurried tour through 'several districts in Bengal' and his remarks are no more entitled to respect in the face of the most contrary evidence, then the letters to the times of that most ridiculous imposture, Wingrove Cook, on the same subject. Moreover, Rammohun's evidence was given thirty years ago, whereas we speak only of the condition that the people in the present time. This constant assertain that the people in the indigo district are better off than in those Rice districts, and the usual deduction therefrom that Indigo Cultivation is beneficial to the people, is one of the most fallacious arguments that have even been put forward in defence of the planters ; it is the result of the most extraordinary confusion of cause and effect, the fact is that the planters are in these dis-

tricts because they are rich, not that the districts are rich because of the planters."১

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে নীলকরদের অত্যাচার এত তীব্র হয় যে তার প্রতিক্রিয়ার ফলে গভর্ণমেণ্ট একটি Indigo Commission ২ তদন্তের জন্যে নিযুক্ত করে। ১৮ই মে কৃষ্ণনগরে কমিশনের প্রথম অধিবেশন ৩ বসে এবং প্রকাশ্যে নীলকর ও চাষ সংক্রান্ত ব্যাপারে তদন্ত সুরু করে। তিন মাস ব্যাপী কমিশন সর্বসমেত ১৩৪ জনের সাখ্য গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ১৪ জন গবর্ণমেণ্ট কর্মচারী, ২১ জন নীলকর, ৮ জন মিশনারি, ১৩ জন জমিদার এবং ৭৭ জন রায়ত বা প্রজা।৪ স্যার এসলি ইডেনের সাক্ষ্যের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। রাণাঘাটের জমিদার জয়চাঁদ পাল চৌধুরীর সাক্ষ্যকে বঙ্গেশ্বর বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বলে মনে করেছিলেন। জয়চাঁদ পাল চৌধুরীও একজন বিখ্যাত নীলকর ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হবেছে যে—

"Babu Joychand pal Chowdhury a great Zamindar who is or was a great indigo planter (having had thirty two concerns in his estate and shares in nine other concerns) is asked, 'If the rayots have for the last twenty years been unwilling to sow indigo,

১। Indian Field, February, 1860, Selections From Papers On Indigo Cultivation in Lower Bengal With An Introduction and A Few Notes by A. Ryot, 1860.

২। Indigo Commission : W. S. Seaton—Kar, esq—President ; R. Temple, esq, C. S. Member ; Rev. J. Sale, to represent the interest of the ryots in the committee, and the missionaries. W. F. Furgusson, esq, nominated by the Indigo Planters Association to represent the interest of the body and Babu Chandra Mohan Chatterjee nominated by the British Indian Association to represent the land holders interest.

৩। A Commission of enquiry for investigating into the causes of Indigo disputes was instituted. It first sat at Calcutta. It issued a notice of appearance. The Indigo Planters, the Zamindars, the Missionaries, the Officials, and Non-Officials, and the heads of the Ryots, accordingly obeyed its summons. They were duly examined and their depositions taken. Subsequently the members went into the Indigo Districts with a view to conduct their enquiries on a wider scale." Bose, Kumud Behari, *Indigo Plants And All About Them,* 1903, 9.

৪। কুমুদনাথ মল্লিক, পূর্বোক্ত।

how then have they gone on cultivating the plant upto the present time?' To this he answered, 'By numerous acts of oppression and violence, by locking then up in godowns, burning their houses, beating then etc,' The whole of this gentleman's evidence is very instructive as proceeding from a great Zamindar and practical native indigo planter. This diluted into becoming official language, I find to be the conclusion of the Commission and it is certainly the inevitable diduction from the whole body of evidence."১

কমিশনের অন্যান্য সাক্ষ্যগুলিও কম মূল্যবান নয়। প্রকৃতপক্ষে কৃষক রাইতদের সাক্ষ্যই নীলকরদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রকৃত স্বরূপকে যেমন স্পষ্ট করেছে তেমন আর কেউ নয়।

স্যার এসলি ইডেন যখন বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন তিনি এই মর্মে একটি পরয়ানা দেন যে, নিজের জমিতে নীলচাষ করা না করা কৃষকদের ইচ্ছাধীন। তাতে আশ্বস্ত হয়ে ১৮৫৯ সালে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ দরিদ্র কৃষক নীলধর্মঘট করে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন যশোহর চৌগাছার বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে গ্রামের মানুষ। একে নীল হাঙ্গামা বলে অভিহিত করার চেষ্টা হয়েছে। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার ঘোষ এই ধর্মঘটে চাষীদের সহায়তা করেছিলেন। এই ধর্মঘটের একটি বিবরণ J. P. Grant দিয়েছেন। কমিশন যখন সাক্ষ্য গ্রহণে ব্যস্ত ছিল তখন গ্রাণ্ট নদীয়া ও যশোহরের মধ্যবর্তী কুমার ও কালীগঙ্গা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি লিখেছেন:— "On my return a few days afterwards along the same two rivers, from dawn to dusk, as I streamed these two rivers for some 60 or 70 miles, both banks where literally lined with crowds of villagers claiming justice in this matter. Even the women of the villages on the banks were collected in groups by themselves; the male who stood at and between the riverside villages in little crowds must have collected from all the villages at a great distance on either side. I do not know that it ever fell to the lot of any Indian officer to steam for 14 hours through a continued double street of suppliants for

১। Minute of the Ltut. Governor on the Report of the Indigo Commission, para 40. কুমুদনাথ মল্লিক, পূর্বোক্ত।

justice ; all were most respectful and orderly but also were plainly in earnest. It would be folly to suppose that such a display on the part of ten thousands of people, men, women and children has no deep meaning. The organisation and capacity for combined and simultaneous action in the cause, which this remarkable demonstration over so large an extent of country proved, are subjects worthy of much consideration."১ নীল বিপ্লবের সময়ে কতকগুলি নীলকরের বিরুদ্ধে আদালতে যে মামলা উপস্থিত হয়, তার মধ্যে Mr. Cookburns Case, Mr. White's Case, Mr. Mear's Case, Mr. Mac Arthur's Case ২,—এইগুলি অভিযোগ এবং গুরুত্বের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। বলপ্রয়োগে নীলকুঠিতে ধরে নিয়ে যাওয়া এবং কুঠির অন্ধকার গুদামঘরে অনাহারে আটক রাখা ছাড়াও আরো নির্মম অত্যাচারের কাহিনী এই সব মামলাগুলির মধ্যে আছে, হাঁসখালির শীতল তরফদার সম্পর্কে বলা হয়েছে,—"Seetal Turufdar was carried to the Bansbarriah Factory of Mr. White, and thence to Sonatollah and other factories belonging to the same gentleman ; and lastly, when secrecy in that part of the country became impossible, he was dragged to the Sindooree Factory in Zillah Jessore, whose manager, Mr. George Mears, is well known all around as the "terrible planter", and who, we believe, is a near relative of Mr. Hampton. Mr. Hampton must know of Seetal Turufdar's death, which beyond the shadow of doubt, took place at Sindooree.৩ এই শোচনীয় মৃত্যু আরো নির্মমভাবে নিম্ন বাংলার প্রায় সমস্ত অঞ্চলে ঘটেছে। নীলকরেরা প্রয়োজনমত সশস্ত্র লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালা পাঠিয়েছে কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে লাঙল এবং গরু কেড়ে নেবার জন্যে। Mr. Cockburns-এর মামলায় এর কলঙ্কিত রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। এখানেও জমি ও সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে একটি কৃষককে।

১। Sir J. P. Grant's Minute of 17th September, 1860.

২। Mr. Mac Arther এর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগের বিবরণ।
দ্রষ্টব্য: *The Calcutta Review,* June, 1860, 357.
এই অভিযোগ *Indian Field,* July, 9, 1859 প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩। Hindoo Patriot, December 31, 1859, A Ryot, *ibid,* 85.

সাময়িক পত্রিকায় এর বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,—"Perhaps one of the strongest proofs of the truth of the charges of lawless violence and oppression that we have so often been compelled to urge against the Indigo Planters, and of the complete impunity with which they can, under the existing laws for trial of Europeans commit the most henious offences, is to be found in the case of Government and Jaubee Bewa, versus, Majun Ali Khan and others, decided in the Court of Nizamut Adawlut on the 16th September. We say it is one of the strongest proofs that could be obtained, not because the case is one atom worse than similar cases which day by day occur in every district in Eastern Bengal in which indigo cultivation is carried on ; but simply because by chance the case has come before the district courts, and the usual defensive weapons of forgery, perjury and corruption have in this instance not been altogether succesful in defeating justice.[১]

নীলকরদের উদগ্র অর্থলোভই যে কৃষকদেব জীবন বিপন্ন করেছিল, এমন নয়। তাদের ধনলোভের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নীতিশূন্য ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা। নীলকরদের মিথ্যা মোকদ্দমার সামনে বাঙালী কৃষক তাব অসহায় অবস্থাকে সেদিন প্রত্যক্ষ করেই মুক্তি পায়নি, তাদের গৃহজীবনের পবিত্রতাকে কলুষিত হতে দেখেছে। নীলদর্পণ নাটকের নবীন, মাধব ও বিন্দুমাধবের সঙ্গে নদীয়ার চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাসের অত্যাচারিত জীবনের মিল আছে[২]। নদীয়ার কৃষক পরিবারের কন্যা সুন্দরী হরমণিকে হরণ করার প্রসঙ্গ নাটকে ক্ষেত্রমণির রূপে প্রত্যক্ষ হয়েছে। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এ সম্পর্কে লিখেছেন।"

Indeed Khetramani of the drama was none but Harimani, a peasant girl of Nadia in flesh and blood known as one of the beauties of Krishnagar who was carried of to the Kulchikatta

১। *Indian Field,* November 19, 1859, *Selections from papers on Indigo Cultivation in lower Bengal with an introduction and a few notes by a Ryot,* 1860, 61.

২। Dasgupta, Hemendra Nath, *The Indian Stage,* II, 1956, 92.

factory in charge of Archibald Hills, the Chota Saheb, where the girl was kept in his bed-room till late hours of the night and the kind magistrate of Amarnagar was no other person than Mr. W. J. Herschel, grandson of the great astronomer."১

নীল কমিশন বাঙগালী কৃষকদের মনে আশার সঞ্চার করলেও এর ফল কৃষকদের পক্ষে সন্তোষজনক হতে পারেনি। কেননা, নীলকমিশন নীলচাষের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করলো। অবশ্য এই সময় থেকে বিচার ব্যবস্থার সুবিধের জন্যে গভর্ণমেণ্ট জেলাগুলিকে বেশি সংখ্যক মহকুমায় বিভক্ত করে সর্বত্র আদালত স্থাপিত করলো। পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে সৈন্যও রাখা হল যাতে কোন রকম অব্যবস্থার সৃষ্টি না হয়। ফলে নীলকরদের অত্যাচার অনেকটা কমে আসতে থাকে, যদিও নীল-কমিশন নীল-করদের অত্যাচার নিবারণের জন্যে সাক্ষাৎভাবে কোন নিয়ম বেঁধে দেয়নি। অবশ্য এই সময় চুক্তি-ভঙ্গের অজুহাতে নীলকরেরা বহু প্রজাকে সর্বস্বান্ত করেছিল। অবশেষে ১৮৬৮ সনের অষ্টম আইনের বলে নীল-চুক্তি আইন রদ করা হল। এবং ১৮৯২ সালে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নীল প্রস্তুত হবার পর বাংলা-দেশের চাষীরা নীলকরদের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেল।

এ হল সংক্ষিপ্তভাবে বাংলাদেশের নীলচাষ ও নীলকরদের অত্যাচারের ইতিহাস। এই অত্যাচারিত কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল বলেই নীলদর্পণ নাটকে তার চিত্র এত বাস্তবরূপে ফুটে উঠেছে। নীল আন্দোলনের মধ্যে বাংলাদেশের বিপন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। ইংরেজ নীলকরদের যে উদগ্র ও নিষ্ঠুর লোভের সঙ্গে কৃষকদের সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে তার শক্তি কৃষকদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। অথচ সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে বরণ করে বাংলাদেশের কৃষক সম্প্রদায় যে নীলকরদের বিরোধিতা করেছে, সেখানে একটি কি দুটি বাঙ্গালী নয়, সমগ্র বাঙগালী সমাজের একটি একত্রিত রূপের পরিচয় বড় হয়ে ওঠে। দীনবন্ধুর বহু দেশদর্শিতা ও অসাধারণ সহানুভূতি এই সামাজিক বিপ্লবকে শিল্পে রূপদান করেছে। আর তা যেহেতু সমাজ-বিচ্ছিন্ন কোন সত্যে বদ্ধ নয় তাই এই নাটকের কয়েকটি চরিত্রের অন্তরালে অসংখ্য মানুষের পদধ্বনি ও অসংখ্য মানুষের আর্তকণ্ঠ থেকে আছে। বস্তুতঃ দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের পটভূমি তাই আরো বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

১। Dasgupta, Hemendra Nath, *Ibid,* II, 92.

দীনবন্ধু-পূর্ব বাংলা লঘুনাটকের ধারা

আধুনিক বাংলা নাটকের জন্ম ঊনবিংশশতকে এবং তা পাশ্চাত্য প্রভাবে পরিপুষ্ট। বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ অবশ্য সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিন্তু বাঙালী জনসাধারণের রসবোধ তৃপ্ত করার মত কোন নাটক মধুসূদন দীনবন্ধু পূর্বকালে ছিলনা। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর কলকাতায় প্রথম বাংলা নাটক অভিনীত হয়েছিল ১। রুশদেশবাসী হেরাসিম লেবেডক ২—তাঁর হিন্দুস্থানী ব্যাকরণের (১৭০১) ভূমিকায় বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার কথা, বাঙালী জনসাধারণের রসবোধ এবং *The Disguise* ও *Love is the Best Doctor* নাটকদ্বয়ের অনুবাদ সম্পর্কিত মন্তব্য করেছেন। বাঙালী জনসাধারণের রসবোধের উল্লেখ করেছেন লেবেডক এইভাবে—

"....I have translated two English dramatic pieces, namely The Disguise, and Love is the Best Doctor, into the Bengal language ; and having observed that the Indians preferred mimicry and drollery to plain grave solid sense, however purely expressed—I therefore fixed on those plays, and which were most pleasantly filled up with a group of watchman, *chokey-dars :*

১। Thus fortified by patronage, and anxious to exhibit, I set about building a commodious Theatre, on a plan of my own, in Dom-Tollah (Dome Lane) in the centre of Calcutta ; and in the meanwhile I employed my linguist to procure native actors of both sexes,—in three months both Theatre and Actors were ready for representation of the Disguise, which I accordingly produced to the public in the Bengal language, on the 27th of November, 1795 ; and again on the 21st of March, 1796."

Lebedeff Herasim, *A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialect* (180, 1) ed. Saha, Mahadev Prasad, *Introduction* 1963.

২। Dasgupta, R. K., *Oxford Slavonic Papers,* vol. VII.

আরো দ্রষ্টব্যঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত—'গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেদিয়েভ', দেশ, বৈশাখ, ১৩৬২। 'লেবেডেফ চর্চায় নূতন পর্ব দেশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮।

savoyards, canera; thieves, *ghoonia;* lawyers, gumosta; and amongst the rest a crops of petty plunderers."

লেবেডফ তাঁর এই দুটি নাটক বাঙালী অভিনেতা, অভিনেত্রীর সাহায্যে অভিনয় করিয়েছিলেন এবং বাঙালী পণ্ডিতেরা তাঁর অনুবাদ-কর্ম সমর্থনও করেছিলেন। লেবেডফ তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় সাধারণভাবে ভারতবাসীদের ('Indians') উল্লেখ করলেও অনুমান করা সংগত যে, বাঙালী জনসাধারণের রুচি বা রসবোধ সম্পর্কেই তিনি এই কথাগুলি বলেছেন। বিশুদ্ধ ভঙ্গীতে প্রকাশিত হলেও গভীর উপদেশমূলক কথার চেয়ে এদেশীয় লোক যে অনুকরণ ও হাসি-তামাসা বেশি পছন্দ করে লেবেডফের এই মন্তব্যটি ইতিহাস সমর্থিত।

লক্ষ্য করতে হয় কবিওয়ালাদের গানে, তরজা, আখড়াই ইত্যাদির মধ্যে আসরের স্থূল উত্তেজনা তৃপ্ত হয়েছে এবং তা নতুন কলকাতার ধনিক সম্প্রদায়ের রসবোধের পরিচয়কে স্পষ্ট করে। লেবেডফের নাটক অভিনয়ের দীর্ঘকাল পরে বাঙালীর নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজী শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায় বিদেশী কাব্য-নাটকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিদেশী কাব্য-নাটক চর্চার পাশাপাশি গ্রামীন সংস্কৃতির যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান, হাফ-আখড়াই ইত্যাদি দীর্ঘকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের 'মায়া' কবিতায় সমকালের যাত্রার বর্ণনা আছে। কিন্তু গ্রামীন সংস্কৃতির এই বিভিন্ন রীতিগুলিকে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায় গ্রহণ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী কাব্য-নাটকের সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে তাঁদের রুচিবোধ বিপর্যস্ত হয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষিত নব্য-বঙ্গীয় সম্প্রদায় যে যাত্রা, কবিগান ইত্যাদিকে অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে করেছেন, তার বিবরণ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহে আছে। '.....খেঁউড় ও কবি যে কি পর্যন্ত জঘন্য ছিল তাহা সভ্যতার রক্ষা করিয়া বর্ণনা করাও দুষ্কর; যাহারা তাহাতে প্রমোদিত হন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান করিতে হইলে সহৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই।.........ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে, কবি ও খেঁউড়ের সদৃশ অশ্লীল বিনোদ কদাপি বহুকাল ভদ্র সমাজে সমাদৃত থাকিতে পারে না, কাল সহকারে অবশ্যই তাহার হ্রাস হয়। দেশের কোন অত্যন্ত ধনী ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার খ্যাতি হ্রাস হইলে ও জ্ঞানালোকের কিঞ্চিৎ মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই ব্যবহার দূষ্যবোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। গত চারি বৎসরাবধি কলিকাতা নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন

হইতেছে। তদ্দর্শনে ধনী সম্ভ্রান্ত বিদ্যানুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন ও অভিনয়ের নির্মল রসে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই সরস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয়—প্রতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়, ইহার প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেঁউড় প্রভৃতি দুষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে ইহা কর্তৃক বঙ্গদেশে কুনীতির উচ্ছেদ ও নির্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়। ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং তদর্থে আমরা দেশহিতৈষীদিগকে একান্ত চিত্তে অনুরোধ করিতেছি।১

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমকালে এই প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের প্রথমে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালীদের জন্য ইংরেজী ধরণের একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সম্পর্কে সমাচার চন্দ্রিকার (১৮২২) সম্পাদকীয়তে একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এই মন্তব্যের ইংরেজী অনুবাদ এসিয়াটিক জর্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাসে এই ইংরেজী মন্তব্যের অনুবাদ উদ্ধৃত হয়েছে।২ এই মন্তব্যে অভিনয়, সুললিত কাব্য, ও অঙ্গভঙ্গী সম্পর্কে উল্লেখ আছে এবং এগুলি যে সাধারণের মনোরঞ্জন করতো সে বিষয়েও লেখক সচেতন। বস্তুতঃ সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন ধনবানের গৃহে নাটক মঞ্চস্থ হত এবং তা সংখ্যার দিক থেকে নিতান্ত নগন্য। এই ধনবানদের গৃহে সাধারণের প্রবেশাধিকারও ছিল না। স্বভাবতঃই গ্রাম ও নগর বাংলার অভিনয় তৃষ্ণার নিবৃত্তি হত যাত্রা, কবিগান, খেঁউড় ইত্যাদির সাহায্যে। অনুমান করার স্বপক্ষে যুক্তি আছে যে, ইংরেজী

১। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৭৮০ শক, পৃঃ ২৩৪-৩৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস**, (১৩৫৩) ১৯৪৬, পৃঃ ১৭।

২। এই বিস্তীর্ণ নগরের নগরবাসীদিগের উপকার ও উৎকর্ষের নিমিত্ত নানাবিধ জনহিতকর ও অভিনব প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই, এক ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদপ্রমোদের সাধারণ স্থান নাই। পূর্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের সভায় নটনটী থাকিত, তাহারা অভিনয় প্রদর্শন করিয়া এবং সুললিত সঙ্গীত ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিত। সম্প্রতি আমাদের সমক্ষেও সখের যাত্রা প্রদর্শিত হইয়াছে। এগুলি সর্বাঙ্গ সুন্দর না হইলেও লোকের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিল। কিন্তু সখের যাত্রাও কদাচিৎ হয়। সুতরাং ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মত শেয়ার গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করে এবং তাহাতে একজন কর্মাধ্যক্ষের অধীনে বেতনভোগী যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করিযা এতদর্থে বিরচিত গীতি ও কাব্যের মাসে একবার নূতন অভিনয় করেন, তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। এইরূপে শ্রেণী নির্বিশেষে সকলেরই আনন্দ বৃদ্ধি হইবে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস** (১৩৫৩) ১৯৪৬ পৃঃ ১৭-১৮।

শিক্ষিত সম্প্রদায় এই চিত্তবিনোদনের প্রয়াসকে ভালোভাবে গ্রহণ করেননি আবার নাটক অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা বোধ করেছিলেন। এই শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজদের নাট্যশালায় ইংরেজী নাটকের অভিনয় দেখতে যেতেন এবং এদের অনেকেই ইংরেজী ধরণে বাংলা নাটক অভিনয় করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই বোধ থেকেই প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের সমাচার-দর্পণ থেকে এ বিষয়ে উদ্ধৃত হয়েছে—'ঐ নর্তনশালা ইংলণ্ডীয়দের রীত্যানুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইংলণ্ডীয় ভাষায়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনয় হয়। জুলিয়াস সিজর নাটকের অংশবিশেষও উইলসন কর্তৃক অনূদিত ভবভূতির উদ্ভব রামচরিত। এই অভিনয় সম্পর্কিত মন্তব্য সমাচার দর্শনে প্রকাশিত হয়েছে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রাচীন আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কে যে বিরূপ মন্তব্য করেছেন তারই প্রতিফলন ভিন্ন ভাবে নতুন ধরনের যাত্রায় ও বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করার মধ্যে দেখা গেছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখে-ছেন, "বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাটকের উৎপত্তি ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী দ্বারা বিদেশী আদর্শে, একথাটি ভাল করিয়া স্মরণ রাখা উচিত। পুরাতন যাত্রার সহিত বাংলা নাটকের কোন নাড়ীর যোগ নাই। যাত্রা হইতে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয় নাই, বরং নব্য নাটকের প্রভাবেই যাত্রার রূপান্তর ঘটিয়া-ছিল"।১ নতুন ধরনের যাত্রার দৃষ্টান্ত হিসেবে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কলিরাজার যাত্রা'র উল্লেখ করা যায়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে সমাচার দর্পণে এ বিষয়ে একটি পত্র প্রকাশিত হয়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই তারিখে সমাচার দর্পনে 'নল দময়ন্তী' যাত্রার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এই নতুন ধরনের যাত্রা সম্পর্কে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মন্তব্য করেছেন, 'গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংসৎ বৎসর পূর্ব হইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশু-রাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদেলী গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছে"।২

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **পূর্বোক্ত** পৃঃ ১৮।

২। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাঘ ১৭৮০ শকাব্দ, পৃঃ ২৩৫। **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস**, পৃঃ ১৯।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'নন্দবিদায় যাত্রার' অভিনয় সম্পর্কে এ বছরের ৩০শে মার্চ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রশংসাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এই যাত্রাগুলির পাশাপাশি বাঙ্গালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের অভিনয় হয়েছে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর গৃহে বিদ্যা-সুন্দরের অভিনয় হয়। হিন্দু পাইয়োনিয়ার পত্রিকায় এই অভিনয় সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল এবং আলোচনাটি প্রশংসামূলক হলেও অন্যান্য পত্রিকাতে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালার পর নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর সখের থিয়েটার পরিচালনা করেছিলেন। The National Paper পত্রে এর উল্লেখ আছে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট তারিখের সংবাদ প্রভাকরে সাঁসুসি নাট্যশালায় এক বাঙ্গালীর অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। এই অভিনেতার নাম বৈষ্ণবচরণ আঢ্য। ইনি অভিনয় করেছিলেন Othello চরিত্রে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদ প্রভাকরে বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের অভিনয়ের কথা পুনর্বার প্রকাশিত হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ কলকাতার গবর্ণমেণ্ট হাউসে হিন্দু কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে ছাত্রেরা শেকসপীয়র থেকে অনেক অংশ আবৃত্তি করে এমন সংবাদ পাওয়া যায়। ডেভিড হেয়ার একাডেমীর (৭ই আগষ্ট, ১৮৫১) ছাত্ররা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মার্চেণ্ট অব ভেনিস অভিনয় করে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী সংবাদ প্রভাকরে এ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ডেভিড হেয়ার একাডেমীর প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীও অভিনয় সুরু করে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর এই বিদ্যালয়ের নাট্যমঞ্চে ওথেলো নাটকের অভিনয় হয়। বেঙ্গল হরকরা পত্রে এর পরিচয় আছে। নবীনচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন বসু তাঁর জোড়াসাঁকোর বাসভবনের নাট্যশালায় শেকসপীয়র-এর নাটক অভিনয় করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে জুলিয়াস সীজার অভিনীত হয়। সংবাদ প্রভাকর ও হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রে এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল।

বস্তুত ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আগে বাংলা নাটকের অভিনয়গুলি স্থায়ী হতে পারেনি। অনুমান করা যায় নাটকের প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীরই তৃষ্ণা ছিল এক সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভালো নাটকের সংখ্যা ছিল নিতান্ত কম। প্রচলিত যাত্রা, খেঁউড় কবিগান ইত্যাদির পাশে বাংলা নাটক তার বিকাশের পথকে খুঁজছিল। এই সন্ধানপর্ব বস্তুতঃ সংস্কৃত ও ইংরেজী

নাটকের অনুবাদে নিবদ্ধ ছিল।১ অথচ শিক্ষিত বাঙালীরা অনুভব করেছিলেন একথা, যে বাংলা নাটক না হলে বাংলা রঙ্গমঞ্চ স্থায়ী হতে পারে না। তারই প্রাথমিক স্তর অনুবাদ কর্মে ও পরবর্তী স্তর মৌলিক নাটক রচনায় ফলবতী হয়েছে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের আনুকুল্যে তাঁদেরই রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটক অভিনীত হয়েছে। এই বছরের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে রঙ্গমঞ্চে আশুতোষ দেবের বাড়িতে নন্দকুমার রায়ের অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক ও মার্চ মাসে রামজয় বসাকের গৃহে রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক অভিনীত হয়েছে। একই বছরে কালীপ্রসন্ন সিংহের গৃহে বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হল কালীপ্রসন্ন সিংহের বিক্রমোর্বশী ও রামনারায়ণ তর্করত্নের বেণীসংহার। ১৮৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে পাইকপাড়ার রাজেদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগানবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় রামনারায়ণের রত্নাবলী ও মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা অভিনীত হয়েছে। উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবা বিবাহ নাটকের অভিনয় হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান কলেজ গৃহে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় ও একই বছরের ১৮ই জুলাই তারিখে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটারিক্যাল সোসাইটিতে একেই কি বলে সভ্যতার অভিনয় হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় এই রঙ্গালয়েই হয়েছিল। ঐ বছরেই জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় কৃষ্ণকুমারী ও একেই কি বলে সভ্যতার অভিনয় হয়। এই রঙ্গালয়েই রামনারায়ণের নবনাটক অভিনীত হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বহুবাজার রঙ্গ নাট্যালয়ে মনোমোহন বসুর রামাভিষেক নাটক অভিনীত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয়২ প্রতিষ্ঠিত হল। অবশ্য ইতি-

---

১। বাংলা নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে লং সাহেব (Rev. J. Long) বাংলা সরকারকে যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে তিনি লেখেন, "A taste for Dramatic Exhibition has lately revived among educated Hindus, who find that translations of Ancient Hindu Dramas are more valuable than translations from English plays."

মন্মথমোহন বসু, **বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ**, ১৮৪৮, ৯২।

২। "On the 7th December, 1872 the first public theatre in Calcutta was ushered into existence with the performance of Nil Darpan."

Mitra, Lalit Chandra, *History of Indigo Disturbance, in Bengal with a full Report of the Nil Darpan case*, 1903, 83.

পূর্বে কলকাতা মফঃস্বলে বিভিন্ন নাটক অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। এই সমস্ত নাট্যশালাগুলির অধিকাংশই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। অবশ্য বাগ-বাজার এমেচার থিয়েটারের নাম একথার ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

হেরাসিম লেবেডফের নাটক অভিনয়ের কাল থেকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সাতাত্তর বছরের ইতিহাস বিচিত্র। লেবেডেফের নাটক অভিনয়ের কালে (১৭৯৫-৯৬) অবশ্য বাঙ্গালীর যে নাট্যবোধ ছিল তা পরিবর্তিত হয়েছিল মধুসূদন দীনবন্ধুর কালে। মধুসূদন ও দীনবন্ধুর প্রথম নাটক প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ১৮৫৯ ও ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। মধুসূদন শর্মিষ্ঠা লিখেছেন যে মনোভাব থেকে দীনবন্ধুর মনোভাব তার থেকে ভিন্ন। এই দুটি নাটকের ভূমিকায় সেই মনোভাবের পরিচয় আছে। লক্ষ্য করতে হয়, মধুসূদন-দীনবন্ধু পূর্বকালে যে নাটকগুলি প্রকাশিত হয়েছে তাদের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। (ক) সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ (খ) ইংরাজী নাটকের অনুবাদ (গ) মৌলিক নাটক। এই তিন শ্রেণীর শেষ দুটি ধারা বিশেষ করে পাশ্চাত্য ভাবনা ও রূপের সঙ্গে যুক্ত।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং বলা যেতে পারে বাঙ্গালীর নাট্যচিন্তা এই সময় থেকেই বিবর্তিত হতে সুরু করেছে। লেবেডেফের The Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects. (১৮০১) এর ভূমিকায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহে বাঙ্গালীর নাট্য-রসবোধের যে পরিচয় তা মধুসূদনের শর্মিষ্ঠার ভূমিকাতেও উল্লিখিত। জি, সি, গুপ্তের কীর্তিবিলাস ও তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জুন প্রকাশিত হয়েছে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে। হরচন্দ্র ঘোষ Merchant of Venice ও Romeo and Juliet (ভানুমতী চিত্তবিলাস ও চারুমুখ চিত্তহরা)-এর অনুবাদ প্রকাশ করেছেন যথাক্রমে ১৮৫২ ও ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে শ্যামাচরণ দত্ত Row-এর The Fair Penitent-এর অনুবাদ করেছেন 'অনুতাপিনী নব 'কাহিনী' নাটক নামে। Cymbelin নাটক অবলম্বনে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সত্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের সুশীলা বীরসিংহ নাটক ও ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রকালী ঘোষের কুসুমকুমারী প্রকাশিত হয়েছে। এই বছরেই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Tempest নাটকের অনুবাদ করেছেন, 'নলিনী বসন্ত' নামে। The Comedy of Errors এর অনুবাদ 'ভ্রমকৌতুক' প্রকাশ করেছেন বেণীমাধব ঘোষ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। তারিণীচরণ পালের Othello' নাটকের অনুবাদ 'ভীমসিংহ' প্রকাশিত হল পরের বছর। ঐ বছরেই হরলাল রায়ের Macbeth অবলম্বনে লেখা 'রুদ্রপাল' নাটকের প্রকাশ। ইংরেজী নাটকগুলির অনুবাদের পাশে মৌলিক নাট্যরচনার প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। কীর্তিবিলাস ও ভদ্রার্জুন নাটকের কথা পূর্বেই উল্লিখিত

হয়েছে। এই ধারারই বলিষ্ঠ প্রকাশ রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব, (১৮৫৪), উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবা বিবাহ নাটক (১৮৫৬), তারকচন্দ্র চূড়ামণির সপত্নী নাটক (১৮৫৮), মধুসূদন দত্তের একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), নফরচন্দ্র পালের কন্যা বিক্রয় নাটক (১৮৬৩) ইত্যাদিতে। এই মৌলিক ধারার এক বৃহৎ অংশ পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছে। এদেরই পাশাপাশি দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকগুলি নাটক শক্তির পরিচায়ক।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে বস্তুতঃ অনেক নাটক রচিত ও প্রকাশিত হলেও তাদের সমস্ত নাটকগুলি যেমন অভিনীত হয়নি, তেমনি সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হবার পূর্বে অন্যান্য রঙ্গমঞ্চগুলিও স্থায়ী হতে পারেনি, অথচ সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের অভিনয় হয়েছে যথেষ্ট। মধুসূদন, দীনবন্ধুর নাটকগুলিকে কেন্দ্র করেই যে বাঙ্গালীর নাট্যরস-পিপাসা তৃপ্ত হয়েছে তার পরিচয় বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থে আছে এবং দীনবন্ধুর নাটককে কেন্দ্র করেই যে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে সে সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঐতিহাসিক মন্তব্য করে গেছেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ থেকে বাঙ্গালীর যে রুচি ও নাট্যবোধ পরিবর্তিত হয়েছিল তা সংস্কৃত ও ইংরেজী অনুবাদের আশ্রয় গ্রহণেই ক্ষান্ত হয়নি। সমকালীন জীবন-চিন্তা বেশিদিন অনুবাদ কাজের মধ্যে তৃপ্তি পায়নি—তাকে নিজের নির্দিষ্ট পথটি খুঁজে নিতেই হয়েছে। তারই বিশিষ্ট প্রকাশ মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটকে। প্রকৃতপক্ষে এরা উভয়েই অনুভব করেছিলেন যে, বাংলা নাটকরচনার ভিত্তি দৃঢ় করতে হলে সংস্কৃত বা ইংরেজী নাটক অনুবাদ করা ঠিক নয় বরং তা সম্ভব হতে পারে দেশজ আচার-আচরণ, কাহিনী, চরিত্র ও অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে। শুধু যে এঁরাই অনুভব করেছিলেন এমন নয়, প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন, দীনবন্ধুর সমকালে বহু মানুষই এ সত্য অনুভব করেছিলেন। অবশ্য এঁদের অনেকেরই দৃষ্টিভঙ্গী নাটক রচনা এবং প্রকাশে ভিন্নধর্মী। কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের বিজ্ঞাপনে রামনারায়ণ শর্মা এই নাটক রচনার কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন এই ভাষায়—"পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি-মর্যাদা মধ্যে, স্বকপোল কল্পিত কুল-মর্যাদা প্রচার করিয়া যান, তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থা গ্রস্থ হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম তন্নিমিত্ত 'পতিব্রতোপাখ্যানে' প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গিয়াছে, পরে রঙ্গ-পুরস্থ ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্ধরীণ মহাশয় ভাস্করাদি পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন তাহার মর্ম এই যে, 'বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথা

প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত কুলীনকুলসর্বস্ব নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তিনি তাঁহাকে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দিবেন'। ......এই নাটক ষড়ভাগে বিভক্ত। প্রথমে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়গণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে ঘটকের কপট ব্যবহার-সূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার-ব্যবহার। চতুর্থে, শুক্রবিক্রয়ির দোষাদঘোষন। পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহী পঞ্চাননের বিয়োগ পরিদেবন। ষষ্ঠে, বিবাহ নির্বাহ ও গ্রন্থ সমাপ্তি। এই রীতিক্রমে এই নাটক রচিত হইয়াছে। ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে। কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্য প্রথায় বঙ্গ দেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে"।১ কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে কুলীন কন্যাদের একটি করুণ চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। অনুরূপ পরিচয় তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী' নাটকেও প্রকাশিত। এই নাটকের বিজ্ঞাপনে লেখক সতর্কতার সঙ্গে মন্তব্য করেছেন—"বর্তমানকালে বাংলাদেশে যে সকল কদাচার ও কুব্যবহার চলিতেছে, বিশেষতঃ বহু-বিবাহ সংক্রান্ত যে সকল অত্যাচার ঘটিতেছে, নাট্যচ্ছলে সেই সমস্ত প্রকাশিত করাই এই সপত্নী নাটকের মূলোদ্দেশ্য......"।২

প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের সামাজিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রচুর সংখ্যক সাহিত্য রচনা হয়েছিল। এদের অধিকাংশেরই লক্ষ্য ছিল উদ্দেশ্যমূলক। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ও প্রগতিশীল পাশ্চাত্য ভাবনাশ্রয়ী হিন্দু সমাজ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই দুই সমাজের মধ্যবর্তী সম্প্রদায়ও নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছিলেন। মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিম সমকালে যে অজস্র পুস্তক-পুস্তিকা ও বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাদের অধিকাংশই এই উপরিউক্ত তিন সমাজের প্রতিফলন। ব্যক্তিত্বশালী প্রতিভাবান লেখকেরাও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন রচনার মাধ্যমে। বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একক প্রচেষ্টা বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব 'অতি অল্প হইল' ও 'আবার অতি অল্প হইল' ইত্যাদির পাশে

১। রামনারায়ণ শর্মা, **কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক, বিজ্ঞাপন,** (সম্বৎ ১৯১১ ১৮৫৪।

২। তারকচন্দ্র চূড়ামণি, সপত্নী নাটক, ১ম ভাগ, বিজ্ঞাপন, (সংবৎ ১৯১৪) ১৮৫৭।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ নাটক' ও রাধামাধব মিত্রের 'বিধবা মনোরঞ্জন,' ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে শিমুয়েল পিরবকসের 'বিধবা বিরহ নাটক' ও ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবাদ্বাহ নাটক'. প্রকাশিত হয়েছে। বাল্য-বিবাহ সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের 'বাল্য-বিবাহ নাটক', শ্যামাচরণ শ্রীমানীর চতুরঙ্ক 'বাল্যোদ্বাহ নাটক' প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই বিষয়ে 'কুলীন বৈদিক কুল-কৌলীন্য করবাল ভূতং সম্বন্ধ-সমাধি নাটকম' বা সংক্ষেপে 'সম্বন্ধ-সমাধি নাটক' প্রকাশিত হয়েছে। সামাজিক অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলার প্রকাশকেও এই সময় উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে নাটকে। সুকুমার সেন তাঁর বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে (২য় খণ্ড) ১৮৫২ থেকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের নাটকের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে ঐ সময়ের বাংলা নাটক সম্পর্কে লিখেছেন, —"ইংরেজী শিক্ষার প্রথম সক্রিয় ফল সমাজ সংস্কারে দেখা দিয়াছিল। পূর্ব হইতেই যাত্রাশালায় কবিতায় ও নকশায় সমাজ অথবা শ্রেণী বিশেষের ব্যঙ্গ-চিত্র জনসাধারণের চিত্ত বিনোদনের একটি প্রধান উপকরণ যোগাইয়া আসিয়া-ছিল। সাধুবেশী পাষণ্ডের ভণ্ডামি, মূর্খের ধনগর্ব ও কুলাভিমান, পণ্ডিতের বিদ্যামদ, মাতালের লাঞ্ছনা, ধনীর লাম্পট্য, কুট্টনীর ছলনা, অসতীর বিড়ম্বনা এবং সতীর দুর্দশা ইহাই ছিল সাধারণ যাত্রার সঙের এবং নক্শা-চিত্রের প্রধান বিষয়। বাংলা নাটকের আবির্ভাবের সময়ে কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তির মনে হইয়াছিল নাটকে এইভাবে সপরিণাম সমাজ কলঙ্কচিত্র দেখাইতে পারিলে সাধারণের চোখ সহজে ফুটিতে পারে"।১ বস্তুতঃ মধুসূদন দীনবন্ধু সম-কালের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি সমাজচিত্রণমূলক এবং এই নাটকগুলির প্রত্যক্ষ প্রেরণা সামাজিক জীবনের প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু উপকরণ দেশজ হলেও তার প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণ দেশজ ছিল না। সংস্কৃত নাটকের বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ বা ইংরেজী নাটকের বাংলা অনুবাদ স্থায়ী হতে পারেনি। তার অন্যতম কারণ এর প্রকাশভঙ্গী নয়—সংক্ষেপে জীবন বিমুখতা। আবার ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায় যে নিজস্ব চিন্তাকে নতুন পথে চালিত করেছিল সেই পথই তাকে ইংরেজী শিক্ষা সংস্কারের অনেক কাছে এনে থামিয়ে রাখেনি। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন ঘটেছে এবং গর্বের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী লেখকেরা তাঁদের রচনা-শক্তি ও প্রতিভার সাহায্যে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন বিদেশী ভাবনা

১। সুকুমার সেন, **বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**, ২য় খণ্ড, (১৩৭০) ১৯৬৩, ৫২।

ও আদর্শকে। বলা বাহুল্য ঊনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত বাঙ্গালী প্রতিভাবানদের জীবনে দেশ ও বিদেশের শিক্ষা শুধু একত্রই নয় সাঙ্গীকৃত হতে পেরেছিল। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তাই একালেই প্রথম ট্রাজেডি, কমেডি এবং প্রহসন লেখার চেষ্টা, যেমন কবিতায়, উপন্যাসে তার নতুন প্রয়াস।

লেবেডফের গ্রন্থের ভূমিকায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উক্তিতে ও শর্মিষ্ঠার ভূমিকায় অলীক কুনাট্য রঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত আছে। এই ইঙ্গিত বিভিন্ন নাট্য-কাব্যের রচনায় বিভিন্ন রূপে দেখা গেছে। তারাচরণ শিকদার তাঁর ভদ্রার্জুন নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন, "এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে এবং বঙ্গ ভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে. কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধহয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদি-পর্ব হইতে সুভদ্রাহরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম।" তারাচরণ শিকদারের নাটক শিল্প হিসেবে যত ছোটই হোক না কেন তিনি অন্ততঃ নিজের রচনা সম্পর্কে সচেতন। জি, সি, গুপ্তের কীর্তি-বিলাস নাটকের ভূমিকায় নাট্যকারের সচেতনতা অনেক বেশি স্পষ্ট। ভারতীয় সাহিত্যে tragedy নেই অথচ কীর্তিবিলাস বিষাদান্ত নাটক। নাট্যকার তাই tragedy রসের উল্লেখ করে তার সমর্থন করেছেন। "অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে যে, যে অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভি-লাষী হইবে। অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, একারণ সেক্সপিয়ার নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন—আমার অন্তকরণ শোকা-নলে দহন হইতেছে, তথাপি আমার মন অবিরত ঐ শোক প্রয়াসী।" এই ভূমিকায় যাত্রা সম্পর্কিত মন্তব্যটিও মূল্যবান। তাঁর সমকালে প্রচলিত যাত্রা-গুলির রুচিহীনতার উল্লেখ করেছেন তারাচরণ শিকদার। প্রকৃত পক্ষে মধুসূদন দীনবন্ধু কালে রচিত বিভিন্ন নাটকগুলির ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান, এই ভূমিকাগুলিতে শুধু লেখকের নিজস্ব বক্তব্যই নয় সমকালীন সাহিত্য চিন্তাও প্রকাশ পায়। ইংরেজী সাহিত্যের বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের উৎসর্গপত্র ও ভূমিকাগুলিতে বিশিষ্ট লেখকের সাহিত্য চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। প্রসঙ্গত ইংরেজী Restoration যুগের নাট্যকারদের কথা স্মরণ করা যেতে

পারে। William Congreve-এর Love for Love, The Way of the World, Richard Steel-এর Conscious Lovers, Oliver Goldsmith-এর The Good-Natured Man, She stoops to Conquer or The Mistake of a Night, Richard Brinsley Sheridan-এর The Rivals ইত্যাদি এই যুগের অসংখ্য উল্লেখযোগ্য নাটকের কয়েকটি। এই নাটকগুলির ভূমিকা ও উৎসর্গপত্রে কমেডির চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। আবার এই যুগেরই বিভিন্ন নাটকের ভূমিকায় ও উৎসর্গ পত্রে প্রকাশ ঘটেছে ট্রাজেডি চিন্তার। সাহিত্য চিন্তার ইতিহাসে এই ভূমিকাগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট—কেননা, এই চিন্তাগুলি বিশেষ বিশেষ লেখকের হয়েও এক একটি school বা মতবাদের সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। এই জাতীয় সাহিত্য চিন্তা বাংলা নাটকের ভূমিকা এবং উৎসর্গ পত্রে বিরল। প্রধানতঃ উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রচারধর্মী হওয়ার ফলে মধুসূদন-দীনবন্ধু পূর্বকালে সাহিত্য চিন্তার চেয়ে সমাজ চিন্তাই বেশি দেখা গেছে। অবশ্য তারাচরণ শিকদার, জে, সি, গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এ কথার ব্যতিক্রম। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় কয়েকটি ভূমিকা ও উৎসর্গ পত্র অবলম্বনে কোন তত্ত্ব গঠন দীনবন্ধু মিত্র পূর্বকালের নাটকে করা কঠিন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর রুচিতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল নাট্য রুচিতেও তার প্রভাব যথেষ্ট পড়েছিল। লেবেডফ বাঙালীর ভাঁড়ামী-প্রিয়তার উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে সেখানেও কতকটা লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিল তা দীনবন্ধু পূর্বকালে হাস্যরসাত্মক নাটক এবং অন্যান্য নাটকের হাস্যরসাত্মক উপাদানগুলি আলোচনা করলে এ সম্পর্কে আরো স্থির ধারণায় পৌঁছোনোয় যাবে।

রামনারায়ণ তর্কলঙ্কারের কুলীন কুলসর্বস্ব সামাজিক উদ্দেশ্যে রচিত হলেও এই নাটকেই প্রথম হাস্যরসের অবতারণা হয়েছে। অবশ্য ১৮২২ খৃষ্টাব্দে রচিত হাস্যার্ণব ও ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কৌতুক সর্বস্ব প্রকাশিত হয়। এই দুটি নাটক সম্পর্কে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর বিবিধার্থ সংগ্রহে উল্লেখ করেছেন। "হাস্যার্ণবে" নাটকছলে কাম পরবশ মূর্খ রাজা, লোভী মন্ত্রী, অজ্ঞান চিকিৎসক, ভীরু সেনানী প্রভৃতি অকর্মন্য রাজ কর্মচারিদিগের তিরস্কার করা হইয়াছে। যদিচ তাহা সম্যক হাস্যজনক ও সুতীক্ষ্ন হইয়াছে বটে তথাপি তাহা অশ্লীলতা দোষে দূষিত হওয়াতে অনেকের পক্ষে আদরণীয় নহে। তৎকালজাত কৌতুক সর্বস্ব নাটক তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে।"১

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু' নাটক প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে লিখেছেন—"খুব সম্ভব ইহা একটি ক্ষুদ্র কলেবর প্রহসন ভিন্ন আর কিছুই নয়।" এই বছরেই 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের প্রকাশ। হাস্যার্নব, কৌতুক সর্বস্ব ও বাবু নাটকের পরিচয় এখন প্রায় অজ্ঞাত, নাটক হিসেবেও সম্ভবতঃ এগুলি শক্তিশালী ছিল না। বস্তুত এই নাটকগুলির বিশদ পরিচয় পাওয়া গেলে অনুমান করা সম্ভব হত যে রামনারায়ণ এই নাটকগুলি থেকে আদৌ প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা। কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকের উদ্দেশ্যের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। কৌলীন্যপ্রথার ফলে সামাজিক অব্যবস্থার ও নির্যাতিত কুলীন কন্যাদের চিত্র এখানে আছে। এই নাটকেই প্রথম 'সুশিক্ষিতা কুলীন কন্যা' মাধবী চরিত্রেব আবির্ভাব হয়েছে। পরবর্তী কালে দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' নাটকের লীলাবতী চরিত্র তার দ্বিতীয় নিদর্শন। কুলীন কন্যাদের ও কৌলীন্য প্রথার পরিচয় দিতে গিয়ে প্রধান কুলীন ব্রাহ্মণেরা ও ঘটকেরা এই নাটকে উপস্থিত হয়েছেন। কুলীন ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধি স্থানীয় কুলপালক, কুলধন অধর্মরুচি, বিবাহ বণিক ইত্যাদি চরিত্র দেখা গেছে। সেই সঙ্গে শুভাচার্য, সুধীর ও অনৃতাচার্য প্রভৃতি ঘটকেরা ও বৈদিক ব্রাহ্মণ 'উদর পরায়ণ' চরিত্রগুলির সাহায্যে হাস্যরস প্রকটিত হয়েছে। এই নাটকের কুলপালক ও কুলধন চরিত্রের একটি সংলাপ তুলে দেওয়া যাক—

কুলধন। হাঃ রেখে দেও তুমি দেশের কথা, এদেশে কেবল দ্বেষ বৈ নেই, কেন তোমার মেয়েরা তো বড়, বড় হয় নাই তাদের কতো বয়েস হয়েছে।

কুলপালক। বয়সের কথা কি বলিব ভাই, বয়স কোথা, বড় কন্যার অদ্যাবধি সকল দন্ত পতিত হয় নাই, মধ্যমটির সকল কেশও পক্ক হয় নাই, তৃতীয় কন্যাও প্রায় মধ্যমটির মত, আর আমার যে কনিষ্ঠা কন্যা সে অতি শিশু, বোধ হয় গাত্রে সূতিকা গন্ধও থাকিলে থাকিতে পারে, বাছা এই গত পৌষ মাসে সবে পঁচিশ বৎসরে পড়িয়াছে।

কুলধন। বিলক্ষণ, এত অল্প বয়সে তুমি তাদের বে দিও না, দেশেল্লোকের কথায় কি করে, আমারে অমনি নিন্দে কর্চ্চে, আমার একটি মেয়ে, বে হয়নি বলে কতো কথাই বলচে, বলুক বেটারা কি কর্বে।

কুলপালক। তোমার মেয়ের বয়স কত ভাই।

কুলধন। বয়েস বড় অধিক নয়, সেদিন ঠিকুজি খুলিয়া দেখিলাম বলি দেখি দেখি মেয়েটির বয়েস কত, তা ভাই বুঝিতে পারিলাম না, ঠিকুজিখানা জীর্ণ হয়েছে, আঁকর বোঝা যায় না, তা নাই গেলো, সে এই বড় পিসীর বইসী।

কুলধন ও কুলপালকের কন্যাদের বয়স বর্ণনার যে নির্দোষ ভঙ্গী তা

সমস্ত দর্শক ও পাঠক চিত্তকে হাস্যরসে উচ্ছল করে তোলে এবং এই হাসি ব্যংগ-বিদ্রূপের নয়। সামাজিক এই নীতির ফলে কুলীন কন্যারা যে কত-খানি নির্যাতিত সে পরিচয় অন্তরালেই থেকেছে, কিন্তু তার আভাস এই সংলাপের মধ্যে অশ্রুত নয়। প্রকৃত পক্ষে এই নাটকে কুলীন কন্যাদের যে যন্ত্রণাক্ত পরিচয় তা আরো গভীর মর্যাদায় আসীন হতে পারতো যদি এই নাটকের জাহ্নবী, শাম্ভবী, কামিনী, কিশোরী ও মাধবী এই প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল হয়ে অবক্ষয়িত হত। এ নাটকের মর্মে তাই করুণ যন্ত্রণা থাকায় এর হাসিও বেদনা মিশ্রিত। কুলধন ও কুলপালকের সংলাপে তার পরিচয়।

অন্য ধরনের হাস্যরসও এই নাটকে আছে। ঘটকের কথাবার্তায় এই হাস্যরসের প্রকাশ। কিন্তু এ হাসির সঙ্গে বেদনার সংমিশ্রণ না থাকার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা স্থূল ও কোথাও কোথাও ব্যাঙ্গাত্মক। কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজই এই ব্যঙ্গের লক্ষ্য। নাটকে অনৃতাচার্যের সংলাপে স্থূল হাস্য ও ব্যঙ্গরস দেখা গেছে।

"অনৃতাচার্য। হাঁ বাপুহে পথে আইস, আমার নিকট শুনিবে, শুন।

প্রবঞ্চনা পরায়ণ মুখে প্রিয় আলাপন
ধর্মাধর্মে নাই বিচারন।
না পাইলে বলে কটু, স্বোদর পূরণে পটু,
দৃষ্টি মাত্র করে সম্ভাষণ।
বাচাল আচার ভ্রষ্ট, জাতি কুল করে নষ্ট
দুষ্টমতি, সূর্যের প্রবর।
বিবাদে নারদ সম, মূর্তিমান যেন তম,
হয় নয় বল সুধীবর।

বেল্লিক পুরাণে মাতলামি খণ্ডে ঘটকের এই লক্ষণ লিখিত আছে, তা বাপূহে, এ সকল জানতে হয়, এ সকল শিক্তে হয়, পেটে থেকে পড়িয়াই ঘটক হইলে হয় না। আমি এ সকল শিখিয়া ও এ সকল গুণে ভূষিত হইয়াই 'ঘটক চূড়ামণি' নামে খ্যাত আছি। আমার গুণের কথা কতো কহিব—আমি সাবর্ণ গৃহে কত শত কৈবর্ত কন্যা চালাত্রছি, শুদ্ধ শোত্রিয় বরে ক্ষাত্রিয় কন্যা, বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে বৈষ্ণব কন্যা, শিব চক্রবর্তির সন্তানে পদ্মরাজ দুহিতা ঘটায়েছি, আর কানা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, এ সমস্ত তো আমার শরীরের আভরণ। এই ১৪ই মাঘে খাড়ী বাটীর কচিরাম চক্রবর্তির কন্যাকে এক উন্মাদ দিগম্বর বর প্রদান করিয়া দক্ষিণ হস্তের কিঞ্চিদ্দক্ষিণ পাইয়া মাসাবধি

শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু আমার এরূপ অপরূপ চাতুর্য যে এতাদৃশ ব্যবহারেও আমি কখন কোথায় অপমানিত হই নাই, তুমি আমাকে কি ঘটকালি দেখাও"।

... ...

"শুভঙ্কর—যাঁহার কুল আছে তাঁহাকেই কুলীন কহে, কুলের লক্ষণ শুনুন,

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং॥

অনৃতাচার্য। আঃ কি আপদ, না বাপু, আর তোমার বিদ্যা প্রকাশে কায নাই, বুঝিয়াছি,

বরং এটাও একদিন বলিলে বলিতে পার যথা—

বলদো লাঙ্গলং যোলিঃ কর্দমং মই কর্ষণং।
ছ্যাঁচা ক্ষেত্রং কোদালঞ্চ নবধা কাস্তে লক্ষণং।

এই ব্যঙ্গাত্মক স্থূলহাস্য অন্যত্র কৌতুকরসে পরিণত। উদরসর্বস্ব ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে এই হাস্যরস ফুটে উঠেছে। বৈদিক ব্রাহ্মণ 'উদরপরায়ণ' তার স্ত্রী 'সুমতি' ও এদের পুত্র 'শিশু', চরিত্রকে কেন্দ্র করে রামনারায়ণ একটি কৌতুক মিশ্রিত দৃশ্য সন্নিবেশিত করেছেন—

"শিশু। ওমা, কাকে ডাকব? কে নে যাবে?

সুমতি। সেই মিনসেকে ডাক্—থাকে থাকে নিউদ্দেশ হয়।

শিশু। কোন মিনসেকে মা? যে আমাদের ঘর ছেয়েছিল?

সুমতি। নানা তাকে কেন?

শিশু। তবে আবার কোন মিনসেকে ডাক্‌বো?

সুমতি। সেই কত্তাকে রে কত্তাকে, ছেলেটাও তেম্নি!

শিশু। কোত্তাকে, তাই বলনা কেন? আয় তু তু তু—

সুমতি। (সক্রোধে) না রে পোড়াকপালে ছেলে, কুকুরকে কেন?

শিশু। (সরোদনে) আঁ আ তুই যে বল্যি কোত্তাকে ডাক, তবে আবার কোন কোত্তাকে?

সুমতি। সেই তোদের তাকে।

শিশু। (সাভিলাষে) ওমা আমাদের তাকে কি আছে মা, বল্‌না, মা বল।

... ...

উদর পরায়ণ। (সুমতির প্রতি সক্রোধে) কি! এমন যোগ্যতা একেবারে রাস্তার উপর! লজ্জা নাই! ভাদ্র মাসের তালের মত কীল না পেলে বুঝি হবে না? এই চারি দিকে পুরুষ এখানে আসা, দেক্‌বি একবার"?

"সুমতি। (সভয়ে) ফলারের কথা বলতে এসেছি।

উদরপরায়ণ। (সানন্দে) আঁ, কি বল্যি। নিকটে আয় আয়, এখানে কেহই নাই, এতো লজ্জাই কি ভাল? তুই তো আর নবধূাগমনের বৌ নোস, (সুমতির নিকটে আসিয়া) কি বল দেখি, ফলার জুটেছে, বলিস কি! নিমন্ত্রণ না অনিমন্ত্রণ।"

সুমতির সঙ্গে শিশুর কথোপকথনে কৌতুকরসের সৃষ্টি হয়েছে। সুমতির প্রতি যে উদরপরায়ণ ক্রোধে ভাদ্র মাসের তালের মত কীল বর্ষণে উদ্যত সেই-ই হঠাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করে। বস্তুতঃ রামনারায়ণ হাস্যরসের প্রকৃত কারণ অবহিত ছিলেন। যে অসঙ্গতি আমাদের সামাজিক আচার-আচরণে, বৃত্তিতে বা কথাবার্তার মধ্যে আছে তাকে উপযুক্তভাবে প্রকাশ করলে যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় তাকেই গ্রহণ করেছেন রামনারায়ণ। রামনারায়ণের পরবর্তী লেখায় বিশেষ করে 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' ১ প্রহসন অনেক বেশি সুপরিকল্পিত ও গঠিত।

রামনারায়ণের সমকালে মধুসূদনের নাটক প্রকাশিত হয়েছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এই দুটি প্রহসনের পূর্বে 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশিত হয়েছে। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' উভয় নাটকেই বিদূষক চরিত্র আছে। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্রগুলির২ মত এই দুটি নাটকের বিদূষক চরিত্র রাজার প্রণয় কার্যের অবলম্বনস্বরূপ। এদের চরিত্রে গতানুগতিক হাস্যকরতার প্রকাশ ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের প্রহসন দুটি হাস্যরসের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে নতুন। রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রাচীন হিন্দু-সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর নাটক প্রনয়ণ করেছিলেন। কৌলীন্য প্রথার উচ্ছেদ কামনা তাঁর নাটকের মূল প্রেরণা। কিন্তু 'একেই কি বলে সভ্যতা' বা

১। যেমন কর্ম তেমনি ফল (১৮৭২) প্রহসনের কাহিনীটির সঙ্গে নবীন-তপস্বিনীর জলধর চরিত্রের নিগ্রহ দৃশ্যের ঐক্য আছে।

২। সংস্কৃত নাটকের হাস্যরসের প্রধান পাত্র হইতেছে বিদূষক। এই বিদূষক সর্বত্রই একজন ঔদরিক স্থূল বুদ্ধি ব্রাহ্মণ হইত। সে রাজার বয়স্য হইয়া রাজ-সভায় রাজা ও পরিষদবর্গের হাস্য কৌতুক উদ্রেক করিত। চেটিকা প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সহিত তাহার কলহও খুব উপভোগ্য হইত তাহার অস্বাভাবিক ঔদরিকতা ও স্থূল রসিকতা সকলের মনেই কৌতুক ও প্রীতি উৎপাদন করিত। বিদূষকের আর একটি কাজ ছিল। সে রাজার প্রেম ব্যাপারে সহায়ক ও উপদেষ্টা ছিল। প্রেমাসক্ত রাজা বিদূষকের কাছেই নিজের প্রণয় জ্বালার কথা ব্যক্ত করিতেন। বিদূষক পাশ্চাত্য দেশের প্রাচীন রাজাদের Fool অথবা Jester-এর সহিত সম্পূর্ণ সম-গোত্রীয় ছিল।

অজিতকুমার ঘোষ, বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, ১৯৬০, ৫৪।

'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে মধুসূদনের শিল্প-চিত্ত বিশেষ কোন উদ্দেশ্যমূলক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এমন অণুমান বিতর্কমূলক। একেই কি বলে সভ্যতার পাত্র-পাত্রী মধুসূদন কালেরই প্রতিবিম্বন। ইংরেজী শিক্ষিত বা অর্ধ-ইংরেজী শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের মদ্যপান ও চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতার রূপ এই প্রহসনে দেখা গেছে। বস্তুতঃ 'একেই কি বলে সভ্যতা'তেই বাংলা প্রহসনের রীতি নির্দিষ্ট হল। মধুসূদনই প্রথম ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের নৈতিক অধঃপতন ও আচার আচরণের চিত্র কৌতুককর ব্যঙ্গরসের সাহায্যে উপস্থিত করলেন।১ সমালোচকের ভাষায় "প্রহসন দুখানি, বিশেষ 'একেই কি বলে সভ্যতা' বাংলা প্রহসনের আদর্শ হইয়া আছে, যেমন পরবর্তী শিক্ষিত মদ্যপ চরিত্রের আদর্শ নববাবু। আর ইহার সংলাপের চটক, শ্লেষ প্রভৃতিও আজ পর্যন্ত অনুকরণযোগ্য, কিন্তু অননুকরনীয় হইয়া বিরাজ করিতেছে। মত্ত নববাবুকে দেখিয়া কর্তা গৃহিণীকে বলিতেছেন,—'ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পারনি?' নব। 'হিয়র, হিয়র, হুরে।'

"তখনকার অনেক নববাবুই নিশ্চয় নিজেদের অবস্থা স্মরণ করিয়া মনে মনে কর্তার প্রস্তাব সমর্থন করিত। গিরিশচন্দ্র উদ্ধৃত অংশটুকু পড়িয়া বিস্ময়ে নাকি বলিয়াছিলেন, মধু কি খাইয়া ইহা লিখিয়াছিল? মধু যে কি খাইয়া লিখিয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নয় এবং নববাবু কি খাইয়া ইহা বলিয়াছিল, তাহাতো দেখাই যাইতেছে। কিন্তু ইহার irony অত্যন্ত নিদারুণ। ইহা wit-এর স্তর হইতে humour-এর স্তরে উন্নীত হইয়াছে। আর, নববাবুর বন্ধু কর্তার কাছে নিজের পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে কি বলিবে, তাহা ভাবিতেছে, সে বলিতেছে,—'তোমাদের কর্তাকে কি বলব যে আমি বিত্তরের মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—' এ pun-এর তুলনা বাংলা সাহিত্যে নাই এ বোধ করি, কেবল পানশীল ব্যক্তির কল্পনাতেই আসিতে পারিত।"২

'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে কৌতুকরসের উচ্ছলতা তেমন তীব্র নয় কেননা এখানে ব্যঙ্গের প্রকাশও যথেষ্ট। অবশ্য 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন কৌতুক ও ব্যঙ্গ উভয় রসেই সমৃদ্ধ। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় কোন নির্দিষ্ট কাহিনী নেই অথবা এই প্রহসন কাহিনী অপেক্ষা চরিত্র ও ঘটনাকেই

১। In 1860 came two satirical plays which lashed out with equal vehemence against the vices of Westernised youngmen and orthodox old rogues.

Sen, Amit, *Notes on the Bengal Renaissance*, 1957, 41.

২। প্রমথনাথ বিশী, **বাংলা সাহিত্যের নরনারী** (১৩৬০) ১৯৫৩, ৩৭।
Spingarn.

বেশি আশ্রয় করেছে। কিন্তু 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ', প্রহসনটি একটি সুপরিকল্পিত কাহিনীর সাহায্যে ব্যক্ত হয়েছে। জমিদার ভক্তপ্রসাদের প্রকাশ্য ধার্মিকতা ও গোপন লাম্পট্যের পরিচয় এই প্রহসনে ব্যঙ্গাত্মক ও কৌতুককর শাস্তিতে নিবৃত্ত হয়েছে। "ভক্তপ্রসাদের বয়স, সামাজিক মর্যাদা ও বাহ্য ধর্মনিষ্ঠার সহিত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও মুসলমানী রমণীর প্রতি আসক্তির এমন একটি গুরুতর অসঙ্গতি রহিয়াছে যে তাহাই কৌতুকরসের কারণ হইয়াছে"।১

রামনারায়ণ ও মধুসূদনের নাটক প্রহসনে গ্রাম ও শহর বাংলার রূপ চিত্রিত হয়েছে। রামনারায়ণের নাটকে বাংলাদেশের সামাজিক কুপ্রথার চিত্রণ ও মধুসূদনে ইংরেজী শিক্ষিত নব্যবঙ্গীয়দের রূপায়ণ। 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র 'ভক্তপ্রসাদ' গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু সমাজ গ্রামীণ বা শাহরিক যাই হোক না কেন এই পটভূমিতে রামনারায়ণ মধুসূদন কতকগুলি জীবন্ত চরিত্র এঁকেছেন। ভক্তপ্রসাদের সঙ্গে Shakespeare-এর Falstaff বা Molier-এর Tartufe চরিত্রের সাদৃশ্য আছে—যদিও বৈসাদৃশ্যই বেশি। Falstaff লম্পট, অর্থলোভী ও বীরের ছদ্মবেশে কাপুরুষ। ভক্তপ্রসাদ কামুক, সাধুবেশি লম্পট জমিদার। Tartufe সমালোচকের ভাষায়—"He displays three qualities, and three only—religious hypocrisy, lasciviousness, and the love of power ; and there is not a word that he utters which is not impregnated with one or all of these."২

মধুসূদন দীনবন্ধু সমকালে ও পরবর্তীকালের আলোচকেরা বাংলা প্রহসনের আলোচনা করেছেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের Calcutta Review পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের নামে প্রচলিত বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধে বাংলা কবিতা, নাটক প্রহসন ও উপন্যাস সম্পর্কে সুচিন্তিত মন্তব্য আছে। ঐ প্রবন্ধে রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটকগুলিকে উৎকর্ষ দেওয়া হয়নি। লেখক মন্তব্য করেছেন—"আমাদের বিবেচনায় এই লেখকের যশোমাল্য জনসাধারণ কর্তৃক অপাত্রে অর্পিত হইয়াছে"। মধুসূদনের প্রহসন দুটির 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে একে "বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ" বলে গ্রহণ করা হয়েছে। "একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুকরণে যত পুস্তক রচিত হইয়াছে, তত আর কোন গ্রন্থের আদর্শে রচিত হয় নাই। গ্রন্থখানি একটি বিশেষ

১। অজিতকুমার ঘোষ, **পূর্বোক্ত** ৪৬৪।

২। Strachy, G. L., *Landmarks in French Literature,* 1923, 83.

অভিপ্রায়ে লিখিত প্রহসন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, অতিরিক্ত মদ্যপান ও তদানুষঙ্গিক দোষগুলি ব্যংগ সহকারে প্রকটিত করা। বটতলার ছাপাখানা ও পুস্তকের দোকানগুলিতে মদ্যপানের দোষ সম্বন্ধে এক আনা বা দুই আনা মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকের রীতিমত বন্যা উপস্থিত হইয়াছে। একটু বৃহৎ আকারের প্রহসনও বিস্তর প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'বুঝলে কি না' নামক গ্রন্থখানি জনসাধারণ কর্তৃক যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে এবং অনেকবার ভদ্রমহোদয়গণের বাটীতে অভিনীত হইয়াছে। উক্ত সমুদয় গ্রন্থই 'একেই কি বলে সভ্যতা'র নকল মাত্র। সুতরাং এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি কেবল বাংলা ভাষায় লিখিত সর্বোৎকৃষ্ট দুইখানি প্রহসনের অন্যতম বলিয়াই নহে, উহার অনুকরণে একগুলি পুস্তক রচিত হইয়াছে বলিয়াও, উহার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে"।১ পরবর্তী উল্লেখযোগ্য আলোচনা রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থে করেছেন। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের প্রশংসা করে লিখেছেন, "গ্রন্থকার বড় পরিহাস রসিক,—সে পরিহাস রসিকতা সর্বস্থলেই প্রচুর পরিমাণে বিস্তারিত করা হইয়াছে। বোধ হইতেছে কুলীন কুলসর্বস্ব-এর বাংলা কোন নাটক রচিত হয় নাই; ইহাই সর্বপ্রথম বাংলা নাটক।" এই গ্রন্থেই মধুসূদনের প্রহসন দুটির আলোচনা আছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' সম্পর্কে রামগতি লিখেছেন,—"ইহাদ্বারা কলিকাতাবাসী অনেক নববাবুর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, এবং সেই চিত্রগুলি যে, কিরূপ যথাযথ ও হাস্যরসোদ্দীপক হইয়াছে তাহা পাঠকগণ একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন। সরজন ও বাবাজীর বৃত্তান্ত, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় বক্তৃতা, সুরাপান ও খেমটার নাচ, কুলবালাদিগের তাসখেলা, সুরামত্ত নববাবুর প্রলাপ শ্রবনে জননীর শংকা প্রভৃতি বর্ণিত সমস্ত ঘটনাগুলিই যেন আমাদের চক্ষুর উপর নৃত্য করিতেছে"।২ রামগতি অবশ্য মধুসূদনের অন্য গ্রন্থটি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন,—"মাইকেল মধুসূদন দত্ত এমন সুসামাজিক লোক হইয়াও কি জন্য যে, এরূপ অসংগত ও জঘন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের বোধ আছে, গোঁড়া হিন্দুরা অপরাপর অপকর্মে রত হইলেও জাতিভ্রংশকর যবনী সংসর্গে কখনই ওরূপ ব্যগ্র হননা"। রামগতি ন্যায়রত্নের এই আলোচনার অনেকখানিই নৈতিক বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, **বাঙ্গালা সাহিত্য**, অনুঃ মন্মথনাথ ঘোষ, ১৩৩৫।

২। রামগতি ন্যায়রত্ন, **বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব**, ১৭৯৫ শকাব্দ (১৮৭২) ১৩৪২ পৃঃ ২৬১-৬২।

সামান্য কিছুকাল পরে "বান্ধব" পত্রিকায় বাংলা নাটকের এক দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়। এখানে প্রথমে মধুসূদন ও পরে রামনারায়ণ আলোচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে ভালো নাটক না হবার কারণ নির্দেশ করেছেন, আলোচক "আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বৈগুন্য হেতু।" অবশ্য আমাদের দেশে যে উৎকৃষ্ট প্রহসন রচিত হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি প্রশংসমান। এই আলোচনা উদ্ধার করা যাক—

"কবি মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী, শর্মিষ্ঠা নাটক গণনায় কোথায় স্থান পায় তাহা নির্দেশ করাও কঠিন: কিন্তু দত্তজ কৃত 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ', নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থদ্বয় প্রহসনের আদর্শ। আবেগপূর্ণ মানব-চরিত্রের কিছুই তাহাতে নাই, কিন্তু যেরূপ গৌরাঙ্গের জীবসকল এখন বাংলায় ক্রীড়া করিতেছেন, সেই প্রহসনদ্বয়ে সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।"

"তাহার পর পণ্ডিতবর রামনারায়ণ তর্করত্ন। বিবেচনা করিতে গেলে তিনি পণ্ডিতের পদ্ধতিতে প্রহসনের কবি, নাটকের কেহ নহেন। তাঁহার 'কুলীন কুলসর্বস্ব' পাঠ করিলে, কুলীন কন্যাগণের কথাবার্তা শুনিলে সকলই গড়াপেটা বলিয়া বোধ হয়, মর্মকথা যেরূপ কর্ণে বাজে সেরূপ হয়না। তাঁহার নায়িকার মধ্যে একটি বিবাহের কথা শুনিয়া বলিলেন,—

"জাহ্নবি যাইয়া বুঝি জাহ্নীর ঘাট
পাইবে সুন্দর বর সুন্দরীর কাঠ।"

সুতরাং তর্করত্নের নাটক বিষাদ পরিণাম হইয়াও একরূপ প্রহসন। তর্করত্নের নাপিতিনী ভাল, যখন সে অলক্তক সজ্জা লইয়া—

"বাড়ী মোর বংশীপুরে, দেখা যায় কিছু দূরে
ঘেরা ঘোরা ঘর দুইখানি।"

বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে দিতে রঙ্গাঙ্গনে প্রবেশ করে, তখন আমরা তাহাকে ভারতের হীরার সহচরী করিতে প্রস্তুত হই, আর তাহার উদরপরায়ণ শর্মা যখন— 'ঘিয়ে ভাজা তপ্তলুচি, দুচারি আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই' বলিয়া উত্তম ফলার

বর্ণনা করিতে থাকেন, তখন তর্করত্নের সরস লেখনীর গুণে সত্য সত্যই আমাদের রসনা রসাল হইয়া উঠে, এবং পণ্ডিতবর রামনারায়ণকে বৈদিক কুলচূড়ামণি বলিয়াই বোধ হয়। তর্করত্নের 'নবনাটক'ও সেই নাটক নহে, প্রহসন। 'নবনাটকে'র সকল বলা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু গণেশবাবুকে ভুলি নাই"।১

১। কালীপ্রসন্ন ঘোষ, **বান্ধব** (১২৮৩) ১৮৭৬ প্রা ভা পৃঃ ১১৭।

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর Literature of Bengal গ্রন্থে রামনারায়ণ ও মধুসূদন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কুলীনকুলসর্বস্বকে তিনি "first original dramatic work in Bengali" বলেছেন।১

লক্ষ্য করতে হয় মধুসূদন সমকালের প্রহসন সংক্রান্ত আলোচনায় কেউই প্রহসন এই রূপবন্ধটির নিন্দা করেননি। বিশেষ লেখকের প্রহসন উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট মনে হয়েছে কিন্তু প্রহসন তথা বাংলা লঘু নাটকগুলিকে প্রায় সকলেই আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন। ইংরেজী সাহিত্যের Restoration যুগে, 'face' এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল। এই বিরোধিতা প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারদের লেখায় পুঞ্জিত। 'The theory of Drama in the Restoration Period' গ্রন্থে এর বিশদ উল্লেখ আছে। "Dryden regarded farce as a low and vulgar form of entertainment unworthy of a cultured and rational audience. Farce and the comedy of manners, he thought, had nothing in common. Farce was merely horse-play, wherease the comedy of manners was too subtle to be satisfied with the mere raising of laughter. As high comedy, it in fact provided 'a pleasure that was more noble'. The comedy of humours was, of course, an altogether different affair. It was certainly nearer to farce in various respects. Like farce, it also dealt with low life. Its characters too were 'low charactres of vice and folly,' as Dryden called them in his Defence of Epilogue. This 'lowness' was indeed the crux of the problem. The moment a comedy became too 'low', it sank into farce."২

বস্তুতঃ farce-এর দুষ্ট অধঃপতিত চরিত্র এবং হাসির স্থূলতার বিরুদ্ধেই শুধু এই অভিযোগ নয়—অভিযোগ farce, এই রূপবন্ধের বিরুদ্ধে। Aristotle কথিত 'Ridiculous'ও উচ্ছল হাসিতে পূর্ণ করে কিন্তু Restoration যুগের. 'imitation', 'Low characters of vice and folly', তাদের অট্টহাসির সঙ্গে 'নির্দোষ আনন্দের' যেমন অভাব তেমনি অভাব নৈতিকতার। 'low comedy'র সঙ্গে frace এর মিল দেখানোর চেষ্টা করেছন Dryden তাঁর 'An Evening's Love' এর ভূমিকায়। "Comedy consists' he said, 'though of low

১। Dutta, R. C. *Literature of Bengal*, 1877.

২। Singh, Sarup, *The Theory of Drama in the Restoration Period*, 1963, 265.

persons, yet of natural actions and characters ; I mean such humours, adventures, and designs, as are to be found and met with in the world. Farce, on the other side, consists of forced humours, and unnatural events.' 'Comedy presents us, he added, 'with the imperfections of human nature : Farce entertains us with what monstrous and chimerical', Both caused laughter no doubt, but comedy did so 'by the lively representation of (human) folly and corruption (of manners)' whereas farce did the same 'only by its extravagances'. Dryden made distinction even in the nature of laughter which they raised a point on which he sometimes seems to waver and declared 'there is more of satisfaction' in the........ laughter (of comedy) and in (that of farce) more of scorn."১

Dryden-এর এই বিরোধিতা Restoration যুগের অনেক নাট্যকারের লেখায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। William Congreve farceকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে চেয়েছেন। Concerning Humour in Comedyতে তিনি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন যে, 'Wit', 'Folly', 'External Habit of Body', 'Affectation' ইত্যাদিকে কখনো কখনো humour বলে ভুল করা হয়। Folly সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'When a poet brings a *character* on the Stage committing a thousand Absurdities, and talking Impertinencies, roaring aloud, and Laughing immoderately on every or rather upon no occasion, this is a character of Humour.....

Sometimes Personal Defects are misrepresented for Humours.

I mean, sometimes characters are barbarously exposed on the Stage, ridiculing Natural Deformities, Casual Defects in the senses, and Infirmities of Age. Sure the Poet must both be very Ill-natured himself, and think his Audience so, when he proposes by shewing a Man Deformed, or Deaf or Blind, to give them an agreeable Entertainment, and hopes to raise their Mirth by which

১। Singh, Sarup, *Ibid*, 266.

is truly an object of Compassion."১ Congreve তাঁর Way of the World এর Dedication অনুরূপ কথা বলেছেন।২ এই নাটকের 'Prologue' এ তিনি Farce কে বিসর্জন দিয়েছেন।৩ Restoration যুগের প্রধান লেখকদের মধ্যে মুখ্যত Dryden, Edward Howard এবং Thomas Shadwell, Farce-এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছিলেন। এদের মতগত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সকলে একটি ক্ষেত্রে একমত হয়েছিলেন যে Farce নিতান্তই স্থূল এবং Comedy-র সঙ্গে তার পার্থক্য সব সময়েই স্পষ্ট রাখা দরকার ও এ দুয়ের বিচার কখনই এক মানদণ্ডে সম্ভব নয়।

ইংরেজী সাহিত্যের Restoration যুগে farce-কে যে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসনের ক্ষেত্রে তা হয়নি বরং অধিকাংশ লেখকেরা প্রহসন তথা লঘু নাটকগুলিকে সমর্থন করেছেন। প্রকৃত পক্ষে নতুন নাটক সৃষ্টির সময়ে বাঙ্গালীর রুচি পবিবর্তিত হতে সুরু করেছিল। পূর্বে উল্লেখিত লেবেডফের উক্তিতে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের যাত্রা সম্পর্কিত আলোচনায়, কবিগান, খেঁউড় ইত্যাদিকে মর্যাদা দেওয়া হয়নি বরং এই শতকের প্রথম কয়েকদশকের মধ্যে এগুলির নিন্দে সুরু হয়েছে। প্রচলিত আমোদ-প্রমোদের স্থূলত্বের প্রতিই এই নিন্দাবাদ। কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটক অনুবাদের পাশে মৌলিক নাট্যরচনা ও প্রহসনে সমসাময়িক সমাজচিত্র বিধৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন লোকরঞ্জক কবিগান, হাফ আখড়াই ও যাত্রার প্রসার মন্দীভূত হয়েছে। Comedy of Manners এর বা High Comedy-র

১। Congreve, William, Concerning Humour in Comedy, 1695 Spingran.

J. E., *Critical Essavs of the Seventeenth Century,* 1908 III, 244-245.

২। "The characters which are meant to be ridiculed in most of our comedies, are Fools so gross, that, in my humble opinion, they should rather disturb than divert the well-natured and reflecting part of an audience; they are objects of charity than contempt; and instead of moving our mirth, they ought very often to excite our compassion."

Stevens, David Harrison, *Types of English Drama*, 1923.

৩। "Some plot we think he has, and some new thought ;
Some Humour too, no Farce........"

Stevens, David Harrison, *Ibid.*

শুচিতা রক্ষায় যাঁরা খড়্গহস্ত হয়েছিলেন তাঁদের মত ভাবনায় ভাবিত হয়েছিলেন বাংলা দেশের কেউ কেউ। কিন্তু তা প্রহসনের বিরুদ্ধে নয় বরং প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হাস্য তামাসার বিরুদ্ধে। কবিগান হাফ আখড়াই, যাত্রা পাঁচালীর রঙ্গময় জগৎ থেকে নাট্যজগতে মুক্তি খোঁজায় এই প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে।

Dryden, Edward Howard, Thomas Shadwell, farce-এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া সত্ত্বেও Restoration যুগে farce তার অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ হয়েছিল। অবশ্য farce-এর সমর্থকও ছিলেন কেউ কেউ। "Edward Ravencroft in Prologue to the *Italian Husband* suggested that farce might also be included in the contemporary ideal of a mixed comedy :

To feed the Beaus with Farce is very good,
Those Babes in Wit can't bear substantial food."১

এই কথাটি Farce সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান। যাঁরা Farce-এর বিরোধিতা করেছেন এর স্থূলত্বের জন্যে তাঁরাও অজ্ঞাতে নিজেদের নাটকে অনেক সময় গ্রহণ করেছেন প্রহসনধর্মী স্থূল ঘটনা ও চরিত্র। প্রকৃত পক্ষে High Comedy, Comedy of Humour বা Farce যদি রূপবন্ধের ক্ষেত্রে নিখুঁত হয়, তখন সেখানে স্বাভাবিক জীবনেরই প্রতিফলন ঘটে। প্রকৃত দৃষ্টিতে জীবনের ভালমন্দ, পাপপুণ্য পাশাপাশি অবস্থান করে। Restoration যুগে নীচতা ও স্থূলত্বের প্রতি ঘৃণা Farce-এর বিরুদ্ধে যতই তীব্র হোক না যেখানেই এই যুগের শিল্পী কোন রসোত্তীর্ণ Comedy রচনা করেছেন, সেখানে যুগপৎ ভালমন্দের মিশ্রণ ঘটেছে।

"A genuine 'mixed comedy' grows spontaneously out of a broad and integrated attitude to life which embraces the high and the low and which rejects nothing in the name of superior breeding or refinement."২

বাংলা প্রহসন ও হাস্য রসাত্মক নাটকে এই 'high' ও 'low' এর আশ্চর্য মিশ্রণ হয়েছে এবং এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে মধুসূদন দীনবন্ধু কালের হাস্য-রসাত্মক নাটক অন্তরঙ্গে এই 'Mixed Comedy'-কে গ্রহণ করেছিল।

১। Singh, Sarup, *Ibid,* 264-65.

২। Singh, Sarup, *Ibid.*

দীনবন্ধু ও বিদেশী নাটক

দীনবন্ধু মিত্র সাতটি নাটক লিখেছেন। তাঁর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণং নাম নাটকম' (১৮৬০) অন্যান্য নাটকগুলি থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য বিষয়বস্তুর এবং রসপরিণতির। বস্তুতঃ নীলদুর্পণই তাঁর একমাত্র বিষাদান্তক নাটক এবং অন্যান্য নাটকগুলির সঙ্গে এই নাটকের পার্থক্য শুধু সমকালীন ঘটনা বা রস পরিণতির ক্ষেত্রে নয় বড় পার্থক্য সম্ভবতঃ দীনবন্ধু নাট্যশিল্পের ব্যতিক্রম হিসেবে। নবীনতপস্বিনী (১৮৬৩), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাই বারিক (১৮৭২) ও কমলে কামিনী (১৮৭৩) এই নাটকগুলির উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হলেও আবেদনের ক্ষেত্রে এক। হাস্যরসের প্রাবল্য এই নাটকগুলিকে একটি সূত্রে গ্রথিত করতে পারে। দীনবন্ধুর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম নাটকে যথাক্রমে বৃদ্ধের বিবাহের ইচ্ছা, মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি, কৌলীন্য প্রথা, ধনবানের ঘরজামাই রাখার চিত্র আছে। নবীনতপস্বিনী ও কমলেকামিনীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন সামাজিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রকাশ অন্য নাটকগুলির মত প্রতিবিম্বিত হয়নি। প্রকৃত পক্ষে দীনবন্ধু মিত্রের অধিকাংশ নাটকে সমকালেরই প্রকাশ। সমকালীন জীবনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় তাঁর ছিল। তাঁর বহু দেশদর্শিতা, সামাজিক অভিজ্ঞতা ও তীব্র সহানুভূতির উল্লেখ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে এই বহুদেশদর্শিতা, সামাজিক অভিজ্ঞতা ও তীব্র সহানুভূতির যে প্রকাশ তার আলোচনা বস্ততঃ নাট্যকারের সমকালের আলোচনা। আরো স্পষ্টকরে বললে এই সমকালের আলোচনা নবজাগরণের।

ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায় নতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেশজ সমাজ সংস্কার, ধর্ম, সংস্কৃতিতে অনুভব করেছিল ঊনিশ শতকে। সমাজ সংস্কারের পাশে সাহিত্য সংস্কারও অনিবার্য হয়েছিল। কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের পাশাপাশি নতুন কথাসাহিত্যের প্রকাশ। মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্র যে রীতি গ্রহণ করেছিলেন তা বিদেশী কিন্তু এঁদের উভয়েই উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন দেশের। অবশ্য এই উপকরণ বিদেশী ভাবনা ও রীতির সঙ্গে এমন একাত্ম ভাবে বিজড়িত যে এদের সম্পূর্ণ বাঙালীত্ব চেনা কঠিন। প্রমীলা বা চিত্রাঙ্গদা, সরমা বা সীতা কতখানি রামায়ণ কাব্যের, সে সম্পর্কে সংশয়ী হওয়া স্বাভাবিক। আবার সূর্যমুখী, কুন্দ, ভ্রমর, রোহিণী, শান্তি, শ্রী এদের প্রতিও অনুরূপ সংশয় কাজ করে। প্রকৃত পক্ষে বিদেশী কাব্যনাটক আমাদের সাহিত্য-চিন্তায় গভীর আলোড়ন উপস্থিত করেছিল। তারই প্রতিফলন

এযুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে পড়েছে এবং তাঁরা সেই প্রতিফলনকে আত্মস্থ করে নিজের নিজের ক্ষেত্রে উপস্থিত করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রও একথার ব্যতিক্রম নয়। তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু, কাহিনী, চরিত্র এবং ঘটনা অধিকাংশই দেশজ। সমকালের ইতিহাসেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে তাঁর নাটক পাঠ করলে দেখা যায় বিদেশী নাটকের প্রভাব তাঁর নাটকেও বিরল নয়।

দীনবন্ধুর অধিকাংশ নাটকগুলি হাস্যরসাত্মক। সূক্ষ্মভাবে কোথাও হাস্য-কৌতুক, কোথাও ব্যঙ্গাত্মক প্রহসনের রস, কোথাওবা করুণ ও হাস্যের একত্র সহাবস্থান এগুলিতে আছে। এই হাস্যরসকে সতর্কভাবে মধুসূদন-দীনবন্ধু পূর্বকালে অধিকাংশেরাই গ্রহণ করেননি। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের কয়েকটি চরিত্রে এর সূচনা, মধুসূদনের প্রহসন দুটিতে এর প্রতিষ্ঠা ও দীনবন্ধুর নাটকে এই রসের পূর্ণতা। বস্তুতঃ ইংরেজী কমেডি ও ফার্সের সঙ্গে গভীর পরিচয় একালের সমস্ত ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী লেখকের ছিল। তাই হাস্যরসাত্মক বাংলা নাটক আলোচনায় ইংরেজী কমেডির রূপরীতিকে অস্বীকার করা যায় না। দীনবন্ধু মিত্রের ক্ষেত্রে ইংরেজী নাটকের প্রভাব কতখানি সেই পরিচয় নেওয়া যাক।

'নবীনতপস্বিনী' নাটকের "জলধর জগদম্বা" সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন যে "জলধর জগদম্বা "Merry Wives of Windsor" হইতে নীত।" এই নাটকের রতিকান্ত সদাগরের স্ত্রী মালতীর প্রতি রাজমন্ত্রী জলধর আসক্ত হয়ে মালতীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করতে থাকে। মালতী তার মামাতো বোন মল্লিকার সাহায্যে জলধরকে কৌশলে তার স্ত্রী জগদম্বার কাছে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত করে। কিন্তু জলধর নিরাশ হয় না বরং রাজার অপ্রকৃতিস্থতার সুযোগে রতিকান্তকে নির্দেশ পাঠানোর ব্যবস্থা করে মালতীর সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ করে নেয়। মালতী মল্লিকা রতিকান্তের সঙ্গে পরামর্শ করে জলধরকে শাস্তির ব্যবস্থা করে। নির্দ্দিষ্ট দিনে রতিকান্তের মিথ্যা বিদেশ যাত্রার পর জলধর এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু পূর্ব নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত মত উপস্থিত হয় রতিকান্ত।

"নেপথ্যে। ঘরে কথা কয় কেও, আমি না যেতেই এই, তুমি দোর খোলো, তোমাদের সকলকে কীচক বধ করছি।

মালতী। (গাত্রোত্থান করিয়া) ফিরে এলে যে? যদি কেউ দেখতে পায়, এখনি মন্ত্রীর কাছে বলে দেবে এখন।

জলধর। মালতি,আমার মাথা খাও দোর খুলনা, আমি লুকুই, দোহাই তোমার দোহাই তোমার, জগদম্বারে রাড় করো না।

মল্লিকা। পালঙ্কের নীচে যেতে পার না?

জলধর। দেখি (চিত হইয়া শয়ন করে পালঙ্কের নীচে যাইতে চেষ্টা) না পেট ঢোকে না, ভুঁড়িটে বাধে।

মল্লিকা। মালতী ঐখানটা ছেঁটে দে।

জলধর। এখন রঙ্গের সময় নয়, আজ যদি বাঁচি তবে রঙ্গের অনেক সময় পাওয়া যাবে।

মালতী। মল্লিকে ঐ কোনে ফরমাসে গামলায় কোতরা গুড় আছে তাইতে ডুবয়ে রাখ। মুখ যদি ডুবুতে না পারে, সেখানে একটা মুখোস আছে সেইটে মুখে বেঁধে দে।

রতিকান্ত। কি হলো?

মালতী। গুড় আলকাতরায় অভিষেক হয়েছে, মুখে মুখোস দেওয়া হয়েছে। এইবার তুলো শোন আর আবির দেওয়া হবে, তার পরেই হোদল-কুৎকুতে ধরা পড়বে"।১ এই বিচিত্র বেশে পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় জলধরকে কম কষ্ট পেতে হয়নি। Merry Wives of Windsor থেকে অনুরূপ দৃশ্য গ্রহণ করা থাক। এই নাটকের Falstaff চতুর, কামুক, মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। অর্থলোভে যে কোনধরনের হীনকাজ সে করে। এই নাটকের Mr. Ford-এর মিথ্যা প্ররোচনায় সে বলে—

"Want no Mistress Ford, Master Brook ; you shall want none. I shall be with her, I may tell you, by her own appointment ; even as you came into me her assistant, or go-between, parted from me ; I say I shall be with her between ten and eleven ; for at that time the jealous rascally knave, her husband, will be forth. Come you to me at night, you shall know how I speed."২

নবীনতপস্বিনী নাটকে জলধরকে শাস্তি দেওয়ার কৌশল রতিকান্তের জ্ঞাত সারেই হয়েছে কিন্তু Merry Wives of Windsor নাটকে Mrs. Ford Falstaff-কে বিপর্যস্ত করার কৌশল তাঁর স্বামীকে জানাননি। মালতীর গৃহে উপস্থিত হয়ে জলধর যেমন রসিকতা করার প্রয়াস পায় এই নাটকেও Falstaff অনুরূপ রসিকতা করে। এই নাটকের একটি দৃশ্যে Mrs. Ford Falstaff-এর শাস্তির উপযোগী উপকরণ তৈরী করে রেখেছেন। ভৃত্যেরা একটি বাক্স বহন করে আনার পর—

১। **নবীন তপস্বিনী**, ৪।৩।
২। *Merry Wives of Windsor* I. i.

"Mr. Ford. Marry, as I told you before John and Robert, be ready here and hard by in the brew-house; and when I suddenly call you, come forth, and without any pause or staggering, take this basket on your shoulders. That done, trudge with it in all haste and carry it among the whitsters in Datchet Mead, and there empty it in the in the muddy ditch close by the Thames side.১"একই দৃশ্যে Falstaff-এর আবির্ভাবের পর পূর্ব সংকেত মত এসে উপস্থিত হয়েছেন Mrs. Page.

"Mrs Page. Pray heaven it be not so that you have such a man here; but 'tis most certain your husband's coming, with half Windsor at his heals, to search for such a one. I come before to tell you. If you know yourself clear, why, I am glad of it; but if you have a friend here, convey, convey him out. Be not amazed; call all your senses to you; defend your reputation, or bid farewell to your good life for ever."

"Mrs. Ford. What shall I do? There is a gentlemen, my dear friend; and I fear not mine own shame so much as his peril. I had rather than a thousand pound he were out of the house.

Mrs. Page. For shame, never stand 'you had rather' and 'you had rather'! Your husband's here at hand; bethink you of some conveyance; in the house you cannot hide him. O, how have you deceived me! Look, here is a basket; if he be of any reasonable stature, he may creep in here; and throw foul linen upon him, as it were going to bucking, or—it is whiting time—send by your two man to Datchet Mead.

Mrs. Ford. He is too big to go in there. What shall I do?

Falstaff (coming forward). Let me see 't, let me see 't. O let me see 't! I'll in, I'll in; follow your friend's counsel: I'll in"২. Falstaff এর দুর্ভোগ অবশ্য এখানেই শেষ হয়নি। পরে

১। *Merry Wives of Windsor,* III. iii.

২। *Merry Wives of Windsor,* III. iii.

Mrs. Ford ও Mrs. Page ইতিমধ্যে প্রকৃত ব্যাপার তাঁদের স্বামীদের জানিয়েছে এবং শেষ দৃশ্যে পরীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করে ও পরে স্বাভাবিক বেশে সকলে উপস্থিত হয়ে Falstaffকে অপমানিত করেছে।

Merry Wives of Windsor নাটকের 'Falstaff' চরিত্রের সঙ্গে 'জলধর' চরিত্রের মিল ছাড়াও অন্য নাটকের সঙ্গে 'নবীন তপস্বিনী'র সাদৃশ্য আছে। 'নবীন তপস্বিনী নাটকে'র জলধর জগদম্বা উপকাহিনীটি হাস্যরসাত্মক। মূল কাহিনী রাজা রমনীমোহনের। নাটকের শেষে রাজা রমনীমোহন দীর্ঘকাল পূর্বে পরিত্যক্ত বড় রানীকে তপস্বিনীর বেশে ও পুত্র বিজয়কে ফিরে পেয়েছেন। কাহিনী, পরিস্থিতি ও ঘটনা সংস্থাপনের দিক থেকে ভিন্ন হলেও Shakespeare এর Comedy of Errors নাটকের ভাগ্যবিড়ম্বিত Aegeon এর সঙ্গে তার স্ত্রী Aemilia ও পুত্রদ্বয়ের মিলন নবীনতপস্বিনী নাটকের ওপর ছায়াপাত করেছে বলে মনে হয়। এই মিল অবশ্য Thomas Otway (1652-85) এর 'Venice Preserved ; or A Plot Discovered' নাটকের 'Antonio' চরিত্রের সঙ্গে 'জলধর' চরিত্রের বেশি। 'Falstaff' এর চরিত্রহীনতার সঙ্গে 'জলধরে'র চরিত্রহীনতা সদৃশ। 'Antonio'র লাম্পট্য 'Falstaff' বা 'জলধরের' মত অন্যের স্ত্রীর প্রতি নয়। তার সংসর্গ পতিতা 'Aquilina'র সঙ্গে। 'Antonio' ও 'Aquilina'র কথোপকথন, পরিস্থিতি ও ঘটনা সংস্থানের একটি দৃশ্যের সঙ্গে 'জলধর'-'জগদম্বার' একটি দৃশ্যের অন্তরঙ্গ মিল গভীর। 'Venice Preserved ; Or A Plot Discovered' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাত্রিবেলায় 'Antonio' এসে উপস্থিত হয়েছে 'Aquilina'র গৃহে। 'Aquilina' তাকে বার বার ফিরে যেতে বলে কিন্তু 'Antonio' প্রায় জোর করে সেই ঘরে থাকতে চায়। অর্থ প্রাপ্তির পর 'Aquilina' ও 'Antonio'র কথোপকথনটুকু তুলে ধরা যাক।

"Aquilina. Truly my illustrius senator, I must confess your honour is at present most profoundly eloquent, indeed.

Antonio. Very well; come now, let's sit down and think upon 't a little. Come sit, I say—sit down by me a little, my Nicky Nacky, hah—(sits down) Hurry durry—"good for nothing!"

Aquilina. No, sir; If you please I can know my distance and stand.

Antonio. Stand! How! Nacky up, and I down? Nay, then, let me exclaim with the poet,

Show me a case more pitiful who can,
A standing woman and a falling man.

Hurry durry—not sit down!—See this, ye gods.—you won't sit down?

Aquilina. No, Sir.

Antonio. Then look you now; suppose me a bull—a Bassan-bull, the bull of bulls, or any bull. Thus up I get and with my brows thus bent—I broo, I say I broo, I broo, I broo. You won't sit down, will you?—I brow—(Bellows like a bull, and drives her about)

Aquilina. Well, Sir, I must endure this. (She sits down) Now your honour has been a bull, pray what beast will your worship please to be next?

Antonio. Now I'll be a senator again, and thy lover, little Nicky Nacky! (He sits by her) Ah toad, toad, toad, toad! Spit in my face a little, Nacky—Spit in my face, prithee, spit in my face never so little.... What, you won't spit, will you? Then I'll be a dog.

Aquilina. A dog, my lord!

Antonio. Aye, a dog—and I'll give thee this t'other purse to let me be a dog—and to use me like a dog a little....

Aquilina. Well, with all my heart. But let me beseech your dogship to play your tricks over as fast as you can, that you may be turned out of doors as you deserve.

Antonio. Aye, Aye—matter for that—that (He gets under the table) Shan't move me—now bough, waugh, waugh, bough, wough—(barks like a dog).

Aquilina. Hold, hold, hold, sir, I beseech you; what is't you do? If curs bite, they must be kicked, sir—Do you see, kicked thus?

Antonio. Aye, with all my heart. Do kick, kick on; now I am under the table, kick again—kick harder—harder yet....

Aqilina. Nay, then, I'll go another way to work with you; and I think here's an instrument fit for the purpose. (Fetches a whip and bell)—what, bite your mistress, sirrah! Out, out of doors, you dog, to kennel and be hanged—bite your mistress by the legs, you rough! (She whips him)১

'নবীন তপস্বিনী'র 'জলধর-জগদম্বা'র কথোপকথনটুকু গ্রহণ করা যেতে পারে। 'জলধরে'র কেলি গৃহে মালতীর বেশে জগদম্বা তার স্বামী জলধরের প্রতীক্ষা করছে। তার ভাষায় 'যদি ধত্তে পারি, আজ মালতী মল্লিককে মা বলিয়ে নেবো, তবে ছাড়বো'। এই অবস্থায় জলধর তাকে মালতী ভেবে কথা বলছে—

"জলধর। ...যে জিনিস আনবের অনুমতি হয়েছে সে জিনিসও পাওয়া যাবে না, সদাগরও ফিরে আসবে না। সুতরাং তুমি ঘোমটা খুলে—প্রেমসাগরে ডুব দিতে পারবে। তোমার সদাগর দেশান্তর হলেন, এখন আমার জগদম্বার যা হয়, একটা হলেই নির্ভয়ে তোমার যৌবন নৌকার দাঁড়ী হই। (জগদম্বার কাছে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে)—

মালতী, মালতী, মালতী ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে কুল॥

জগদম্বা। (ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া) জগদম্বা থাকতে আমার কপালে সুখ হবে না।

জলধর। বাবা, এক ধাক্কা গেল। মালতী, আমি তোমার লড়ায়ে ম্যাড়া, যদি—অনুমতি দেও, এক ঢুঁতে জগদম্বারে জলসই করি। আহা! তুমি হস্তগত হয়েছ, আর আমারে কে পায়, জগদম্বাকে বিয়ে করে এনিচি, একেবারে বৈতরণী পার কত্তে পারবোনা কিন্তু তা বেঁচে মরা, তোমার মল সাফ করবের দাসী হয়ে থাকতে হবে।

জগদম্বা। যদি জগদম্বা আমার কথা না শোনে।

জলধর। না শোনেন, সাঁড়াসী দিয়ে একটি একটি কাঁচা মুলো তুলবো।

—আহা! জগদম্বা আবার সেই মুলো দাঁতে মিসি দেন, লোকে জিজ্ঞাসা কল্যে বলেন, দাঁতের শুলুনী হয়েছে।

১। *Venice Preserved; Or A Plot Discovered,* III. iii.

জগদম্বা। (ঘোমটা খুলে) তবে রে আঁটকুড়ীর ব্যাটা, এমনি উন্মত্ত হয়েছে, মাগকে বাছা বলচো, তোমার আদ হাত ছড়ি যোটে না, যে গলায় দাও।

জলধর। ওমা তুমি। ওমা তুমি! সর্বনাশ করিচি। কেউটে সাপের ন্যাজ মাড়িয়ে ধরিচি।......

জগদম্বা। (ঝাঁটা প্রহার করিতে করিতে) গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও, এমন পোড়ার দশা আমার, আমায় কেন নুন খাইয়ে মারেনি।"১

দুটি নাটকের এই অংশ দুটি আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হতে পারে—যেহেতু ঘটনা, পরিস্থিতি ও কাহিনী ভিন্ন। কিন্তু অন্তরঙ্গের দিক থেকেও দুটি অংশকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। দুটি নাটকেই পুরুষ চরিত্র দুটির চরিত্রহীনতার শাস্তি ও প্রহার ব্যবস্থায় একজন পদাঘাত ও চাবুকের অন্যজন প্রথমে ধাক্কা ও পরে সমার্জনীর সাহায্য নিয়েছে। 'Antonio'র প্রথমে বৃষত্বপ্রাপ্তি ও কুকুরত্বের উচ্চকিত প্রকাশ। 'নবীন তপস্বিনী'র 'জলধর' নাটকের অন্য অংশে 'হোঁদলকুৎকুতে' নামক বিচিত্র জীবে পরিণত হয়ে যে বিশেষ অঙ্গভঙ্গী ও শব্দ নির্গত করেছে তা মনুষ্যকণ্ঠ থেকে নির্গত করা সহজ নয়। বস্তুতঃ 'জলধর-জগদম্বা'র কাহিনীকে কেন্দ্র করে 'নবীনতপস্বিনী' নাটকে যে হাস্যরস দেখা দিয়েছে তার উপাদান হিসেবে দীনবন্ধু যে চরিত্র ও কৌশল অবলম্বন করেছেন তা বিদেশী। 'Merry Wives of Windsor' নাটকের 'Falstaff' 'Venice Preserved; or A Plot Discovered' নাটকের 'Antonio' ও 'নবীনতপস্বিনী' নাটকের 'জলধর' যথাক্রমে Knight, Senator ও রাজমন্ত্রী। Shaskepeare বা Thomas Otway যে শাসন-ব্যবস্থার মানুষ তা রাজশক্তির। রাজা, রাজন্যবর্গ ও সামন্তরাজের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ছিল। প্রকৃত পক্ষে Restoration Period এর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নাট্যকারেরা তাঁদের নাটক উৎসর্গ করেছেন বিভিন্ন Lord বা Dukeদের। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে ইংরেজ শাসন ও ইংরেজ ভক্তি থাকলেও Knight, Senator বা রাজমন্ত্রীর রূপ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইংরেজী নাটকে সেই পরিচয় আছে। তারই প্রকাশ 'জলধর' চরিত্রে ঘটেছে। Senator সম্পর্কে Thomas Otway তাঁর 'Venice Preserved; or A Plot Discovered' নাটকের Prologue এ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা দিয়ে বলতে গিয়ে লিখেছেন—

"Next is a senator that keeps a whore,
In Venice none a higher office bore;"

রাজমন্ত্রী জলধরের চরিত্রে প্রায় এই হীনতারই প্রকাশ ঘটেছে। তার বয়স

১। নবীন তপস্বিনী, ২।৩।

পদমর্যাদা ও লাম্পট্যের শাস্তি যে কৌতুককর অসংগতি থেকে সৃষ্টি হয় তা শুধু হোঁদলকুৎকুতের রূপে নয়। প্রকৃত পক্ষে দীনবন্ধু তাঁর নাটকগুলিতে হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে যে যে কৌশল অবলম্বন করেছেন তার মধ্যে পোষাক-পরিচ্ছদ, অংগভংগী, বাচনভংগী ও আকৃতির স্থান অনেকখানি। জলধরের 'হোঁদলকুৎকুত' রূপে পরিণত হওয়ার কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। মালতীর ভাষায় "গুড় আলকাতরায় অভিষেক হয়েছে, মুখে মুখোস দেওয়া হয়েছে, এইবার তুলো, শোন আর আবির দেওয়া হবে, তার পরেই হোঁদল-কুৎকুতে ধরা পড়বে"। কিন্তু জলধরের স্বাভাবিক আকৃতিও হাস্যজনক— যেমন জগদম্বার আকৃতি। জগদম্বা মারা গেলে জলধর কি করে বলায় তারই ভাষায়—"একতাল গোবর এনে, মুখের একটি ছাপ তুলে নিই—অমন কোটর চক্ষু, অমন মণিপুরী নাক, অমন হাবসির অধর, অমন মুলোদন্ত, জগদম্বা মলে আর নয়নগোচর হবে না"। লক্ষ্য করতে হয় Restoration যুগের হাস্য-রসাত্মক নাটকে আকৃতি, পরিচ্ছদ, ভাষা অংগভংগী ইত্যাদি হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। Sheridan এর The Duenna নাটকের Margaret (the Duenna) চরিত্রের একটি প্রসংগ স্মরণ করা যায়। এই নাটকে কৌশল করে Duennaর সংগে Isaac Mendoza বিবাহ হয়েছে। যদিও Isaac বিবাহ করতে এসেছিল Don Jerome কন্যা Louisaকে। কিন্তু Duennaর সাহায্যে Louisa তার প্রণয়ী Antonioর কাছে যায় ও Duenna Louisa সেজে Isaacকে বিবাহ করে। বিবাহের পর নাটকের শেষ অংশে Isaac প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে বিবাহ অস্বীকার করতে চায়। Don Jeromeকে সে বলে—

"Isaac. I don't care—I'll not endure this! Don Jerome, 'tis you have done this—you would be so crused position about the beauty of her you locked up, and all the time I told you she was as old my mother and as ugly as a devil. . . .

Duenna. Dare such a thing as you pretend to talk of beauty? —a walking rouleau! —a body that seems to owe all its consequence to the dropsy!—a pair of eyes like two dead beetless in a wad of brown dough!—a beard like an artichoke, with dry, shrivelled jaws that would disgrace the mummy of a monkey!"১

১। *The Duenna,* III, vii.

জলধর অবশ্য অন্যত্র বলেছে, "যেমন দেবা তেমনি দেবী—যেমন জলধর তেমনি জগদম্বা।"

নবীনতপস্বিনী নাটকের শেষ দৃশ্যটির সঙ্গে Richard Steel-এর The Conscious Lovers নাটকের একটি অংশের গভীর মিল আছে। নবীন-তপস্বিনী নাটকের শেষ অংশে রাজা রমনীমোহন দীর্ঘকাল পরে পুত্র বিজয় ও নিরুদ্দিষ্টা বড় রানীকে ফিরে পেয়েছেন। রাজার সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণের কন্যা কামিনীর সঙ্গে বিজয়ের প্রণয় জন্মেছে। বিজয় কামিনীকে একটি অঙ্গুরীয় দান করেছে। বিদ্যাভূষণের ইচ্ছা কামিনীর সঙ্গে রাজার বিবাহ হয় কিন্তু এদের ভালোবাসার ফলে সে উৎকণ্ঠিত। বিজয়কে রাজার সামনে বিচারের জন্যে উপস্থিত করে বিজয় ও তপস্বিনীর বেশধারিনী বড় রানীকে আনতে পাঠানো হয়েছে। তারা এলে—,

"বিদ্যাভূষণ। মহারাজ, ঐ দেখুন কামিনী সেই আংটি হাতে দিয়ে রেখেছে।

রাজা। দেখি মা কামিনী, তোমার আংটি দেখি, (কামিনীর নিকট হইতে—অঙ্গুরী গ্রহণ) তোমায় এ আংটি কে দিয়েছে।

কামিনী। বিজয়—তপস্বি দিয়েছেন।

রাজা। (তপস্বিনীর চরণ অবলোকন পূর্বক অঙ্গুরীয় চুম্বন করিয়া) এ আমার অঙ্গুরী, প্রেয়সি। অপরাধ ক্ষমা কর।

বিজয়। (রাজার চরণ ধরিয়া) পিতঃ রোদন সম্বরণ করুন, বাবা আর আর কাঁদবেন না, গাত্রোত্থান করুন, রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন ; আমি পরমানন্দে মনের সুখে আপনার চরণ সেবা করি।

রাজা। (বিজয়কে আলিঙ্গন পূর্বক মুখচুম্বন করিয়া) আহা! যার পুত্র আছে সেই জানে পুত্রমুখ চুম্বন করিলে কি লোকাতীত পরম প্রীতি জন্মায় (বিজয়ের মুখচুম্বন)"।১

The conscious Lovers নাটকের Mr. Sealand-ও দীর্ঘকাল পরে ফিরে পেয়েছেন তাঁর প্রথম পক্ষের কন্যা Indiana ও বোন Isabella-কে। Indiana-র সঙ্গে Bevil Junior-এর ভালোবাসা অথচ Mr. Sealand চান তাঁর অন্য কন্যা Lucinda-র সঙ্গে Bevil-এর বিবাহ হোক। Indiana-র সঙ্গে Bevil-এর সম্পর্কের কথা মনে রেখে Mr. Sealand এসেছেন Indiana-র কাছে। তিনি জানেন না Indiana তাঁরই মেয়ে।

Mr. Sealand. Do not think so. Pray answer me : Does Bevil know your name and family?

১। নবীন তপস্বিনী ৫।২।

Indiana. Alas, too well! oh, could I be any other thing than what I am—I'll tear away all traces of my former self, my little ornaments, the remains of my first state, the hints of what I ought to have been—

(In her disorder she throws away a bracelet, which Sealand takes up, and looks earnestly on it)

Mr. Sealand. Ha! What's this? My eyes are not deceived! —it is, it is the same! the very bracelet which bequeathed to my wife at our last mournful parting!

Indiana. What said you, Sir? Your wife! Whither does my fancy carry me? What means this unfelt motion at my heart? —And yet, again my fortune but deludes me; for if I err not, Sir, your name is Sealand; but my lost father's name was.

Mr. Sealand. Danvers—was it not?

Indiana. What new amazement! That is, indeed, my family.

Mr. Sealand. Know, then, when my misfortune drove me to the Indies, for reasons too tedious now to mention, I changed my name of Danvers into Sealand. (Enters Isabella)

Isabella. If yet there wants an explanation of your wonder, examine well this face (Yours, Sir, I well remember); gaze on and read in me your sister, Isabella.

Mr Sealand. My sister!

Isabella. But here's a claim more tender yet—your Indianna, Sir, your long-lost daughter.

Mr. Sealand. Oh, my child! my child!

Indiana. All-gracious Heaven! Is it possible? Do I embrace my father?

Mr. Sealand. And do I hold thee? —These passions are too strong for utterance. 'Rise, rise, my child, and give my tears their way—O my sister! (Embracing her)১

১। *The Conscious Lovers* V. iii.

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি বিজয় ও Indiana তাদের মনোনীত পাত্রী ও পাত্রকেই বিবাহ করেছিল।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নাটকের ঘটনা ও বিষয়বস্তু দীনবন্ধু সমকালের ও দেশজ। স্বভাবতঃই এ নাটকের সঙ্গে বিদেশী নাটকের কাহিনী ও ঘটনা গত সাদৃশ্য নেই। কিন্তু এই নাটকেরও একটি অংশের সঙ্গে Macbeth নাটকের একটি দৃশ্যের সাদৃশ্য চোখে পড়ে। দুটি নাটক সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তা ঘটনা কাহিনী, চরিত্র-নির্মাণ ও রসপরিণতির ক্ষেত্রে। কিন্তু বিসম জাতীয় হওয়া স্বত্ত্বেও আঙ্গিকগত এই মিলটুকু সতর্ক পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। বিয়ে পাগলা বুড়ো নাটকের এই দৃশ্যে বৃদ্ধ রাজীবলোচনের দরজায় বারবার আঘাত শোনা যাচ্ছে। রাজীবলোচন বিবাহের চিন্তায় বিভোর।

"রাজীবলোচন............. কনকরায় তেমন লোক নায়, একটি মেয়ে স্থির করবেই, ক্ষমতা কত, মান কেমন, কনকের প্রতাপে বাঘ গোরুতে একঘাটে জল খায়। (দরজায় আঘাত) ঠক্, ঠক্, ঠক্, রাত্রিদিনই ঠক্, ঠক্ (দরজায় আঘাত) আবার ঠক্, ঠক্, কচ্চিই ঠক্, ঠক্ (দরজায় আঘাত) কে-ও, কথা কয় না কেবল ঠক্. ঠক্ (দরজায় আঘাত) দরজাটা ভেঙ্গে ফেল্যে, কেও রামমনিকে ডাকবো নাকি?"১

এই অংশটির পাশাপাশি Macbeth নাটকের দৃশ্যাংশটি তুলে ধরা যাক।

"Porter. Here's a knocking indeed! If a man were porter of hell-gate he should have old turning the key (knocking within) knock, knock, knock! Who's there, i, the name of Beelzebab? Here's a farmer that hanged himself on the expectation of plenty : Come in time ; have napkins enow about you ; here you will sweat for't (knocking within) knock, knock! Who's there in the other devils name?....O, come in, equivicator. (knocking within) knock, knock, knock! Who's there? Faith, here's an English tailor come hither, for stealing out a French hose ; come in, tailor, here you may roast your goose. (Knocking within) knock, knock, knock ; never at quiet! what are you?২"

সধবার একাদশী নাটকের ওপর বিদেশী নাটকের প্রভাব গভীর। বস্তুতঃ ইংরেজী কমেডির অন্তরঙ্গ পরিচয় এই নাটকে আছে। সমকালের মদ্যপান ও

১। বিয়ে পাগলা বুড়ো, ১।২।
২। Macbeth, II. iii.

পতিতাগমনের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ এই নাটকে প্রকাশিত। সামাজিক আচার আচরনেরই প্রকাশ নয় সেই সঙ্গে সাহিত্য, ভাষা সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়াও এখানে ধরা পড়েছে। ইংরেজী নাটকে বিশেষকরে Restoration যুগের নাটকে সমকালের জীবন চিত্রিত হয়েছে। অন্য নাটকের মত ইংরেজী নাটকের সঙ্গে কোন ঘটনা বা কাহিনীর আংশিক মিল সধবার একাদশীতে নেই কিন্তু ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের যে নানা উদ্ধৃতি দীনবন্ধু এখানে ব্যবহার করেছেন তা বিস্ময়কর। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কবি ও ঔপন্যাসিকের মতই দীনবন্ধু যে ইংরেজী সাহিত্যের ও সাহিত্য ভাবনার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন সধবার একাদশীতে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কোথাও Sheakespeare কোথাও Dryden, Pope কোথাও Philip Sidney কোথাও Thomas Otway কোথাও বা Milton, Bacon থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন দীনবন্ধু। এই উদ্ধৃতি-গুলি যথাযথ স্থানে প্রযুক্ত হয়ে আশ্চর্য নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতপক্ষে সধবার একাদশী নাটকের অন্তরঙ্গ পরিচয়ে বিদেশী ভাবনা গভীর। দীনবন্ধুর এই নাটকেই উচ্চস্তরের হাস্যরস সন্নিবেশিত হয়েছে।

'লীলাবতী' নাটকে জমিদার হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রকন্যা প্রাপ্তির ঘটনাটিতে Comedy of Errors ও Conscious Lovers নাটকের ছায়া আছে বলে মনে হয়। এই নাটকের হাস্যরস নদেরচাঁদ-হেমচাঁদকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে। এই চরিত্রগুলির আচার-আচরণের সঙ্গে বিদেশী নাটকের মিল লক্ষ্য করা যায়। Bury Fair নাটকের Sir Humphrey চরিত্রের সঙ্গে লীলাবতী নাটকের 'শ্রীনাথ' চরিত্রের মিল আছে। Sir Humphrey চরিত্রটি Restoration যুগের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। অন্যকে প্রহার করে সে আনন্দ পায় এবং কখনো কখনো স্থূল আচরণের সাহায্যে উল্লাসের সৃষ্টি করে। লীলাবতী নাটকের শ্রীনাথও স্থূল উপায়ে হাসির সৃষ্টি করেছে। কখনো অংগভঙ্গীর সাহায্যে কখনো 'নদের চাঁদের' অজ্ঞাতসারে 'নদের চাঁদের চেয়ারখানি স্থানান্তরিত' করণে কখনো নদের চাঁদের অজ্ঞাতে 'সিন্দুর মাখা হস্তে নদের চাঁদের চক্ষু আবরণে' কখনো নদের চাঁদকে প্রহারে দীনবন্ধু শ্রীনাথ চরিত্রের রূপটি তুলে ধরেছেন। Sir Humphrey চরিত্রে ও অনুরূপ আচরণের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের বিভিন্ন নির্দেশিকা থেকে একটু উদ্ধার করা যাক—

"Sir Humphrey. (Aside) Now, now this regue's my rival! I shall tease him ere I have done with him.

(He plucks the chair from under Trim and gives him a devilish fall. Oldwit and he laughs immoderately)"

"(Sir Humphrey sneaks behind and pins him (Oldwit and Wildish together)"

অবশ্য এই উদাহরণগুলি যে কোন দেশের নাটকেই ব্যবহৃত হতে পারে। Sheridanও তাঁর বিভিন্ন নাটকে হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টিতে এই জাতীয় স্থূল উপকরণের সাহায্য নিয়েছেন। The Rivals নাটকের Mrs. Malaprop চরিত্রের সংলাপ ব্যবহারের অশুদ্ধ প্রয়োগ রীতিকে দীনবন্ধু নদের চাঁদের ভাষায় প্রয়োগ করেছেন।

দীনবন্ধুর পরবর্তী নাটক জামাই বারিক সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'জামাই বারিকের দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত।' জামাই বারিক নাটকের জামাইদের একত্রে থাকার চিত্রে এবং পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী বগলা ও বিন্দুবাসিনীকে কেন্দ্র করে প্রবল কৌতুক ও উচ্ছল হাস্যরস বিকীর্ণ হয়েছে। অবশ্য এই নাটকের মূল কাহিনীটি অভয়কুমার ও তার স্ত্রী কামিনীর। অভয়কুমার ও কামিনীর কাহিনীর সঙ্গে Love's Last Shift নাটকের আন্তরিক মিল আছে। জামাই বারিক নাটকে জমিদার-কন্যা কামিনী অভয়কুমারকে পদাঘাত করে শয়ন মন্দির থেকে বিতাড়িত করে। জমিদার-কন্যার ধনগর্ব সৌখিনতা ও রূপের অহঙ্কার স্বামীকে বিতাড়িত করে নিজের চরিত্রকেও পরিবর্তিত করলো। তখন কামিনী সন্ধানে বেরোলো তার স্বামীর। ইতিমধ্যে অভয়কুমার ও পদ্মলোচন উভয়েই সংসার বিরাগী হয়ে বৃন্দাবনবাসী হয়েছে। কামিনীর মৃত্যু সংবাদও এসে পৌঁচেছে অভয়ের কাছে। সেই সময় নাটকের অন্যতম চরিত্র মাধব বৈরাগীর সাহায্যে বৈষ্ণবীর বেশে কামিনী এসে উপস্থিত হল সেখানে। বৈষ্ণবীকে দেখে প্রথমে অনুরাগ পরে তার সঙ্গে কণ্ঠি বদল হল অভয়ের। তারপর অভয় পরিচয় পেল বৈষ্ণবীর। এই অংশটি উদ্ধৃত করা যাক—

"অভয়। বৈষ্ণবী, তুমি আহার করগে, পদসেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয়নি।

বৈষ্ণবী। আমাদের আশ্রমের পুস্তকে পড়িছি, নারায়ণ ভোজন করে শয়ন কল্যে লক্ষ্মী পদসেবা কত্তেন।

অভয়। বৈষ্ণবী, আমি তোমার মধুর বচনে মোহিত হলেম, তুমি মুখ তুলে আমার সঙ্গে কথা কও।

বৈষ্ণবী। (দীর্ঘ নিশ্বাস) মা। (অভয়কুমারের চরণযুগল বক্ষে ধারণপূর্বক চুম্বন—বৈষ্ণবীর চক্ষের জল চরণে পতন)

অভয়। বৈষ্ণবী তুমি কাঁদচো!

বৈষ্ণবী। (মুখ তুলিয়া) আমার দুটি বাসনা ছিল।

অভয়। বল, আমি প্রাণ দিয়ে সম্পাদন করবো।"

"বৈষ্ণবী। এক বাসনা তোমার পা দুখানি বুকে করে চুম্বন করবো, আর এক বাসনা স্বহস্তে তামাক সেজে এই ফরাসিতে তোমাকে খাওয়াব।

অভয়। (একদৃষ্টে বৈষ্ণবীর মুখ নিরীক্ষণ) কেন?

বৈষ্ণবী। নাথ! আমি তোমার পাতকিনী কামিনী। (মূর্ছিতা হইয়া পতন)

অভয়। আমার কামিনী, কামিনীর এই দুরবস্থা। (কামিনীর মস্তক উরুতে ধারণ করিয়া জলপ্রদান) কামিনী! কামিনী! আমার সেই কামিনী এমন হয়েছে, চেনা যায় না—কামিনী! কামিনী! কথা কও।

বৈষ্ণবী। নাথ, অম্যাকে পাপীয়সী বলে যদি গ্রহণ না কর আমার আর আক্ষেপ নাই, আমার যা বাসনা ছিল তা আজ সফল করিছি।

অভয়। কামিনী তুমি আর কেঁদ না—আমি তোমারি, আমি অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যবহার করিছি।

বৈষ্ণবী। নাথ! আমি তার মূল।

অভয়। কামিনী তুমি আমার জন্যে এত কষ্ট করবে জানলে আমি কখন বৃন্দাবনে আসতেম না।"১

জামাই বারিকের অভয়-কামিনী কাহিনীর সঙ্গে Love's Last Shift নাটকের কাহিনীর মিল আছে। সংক্ষেপে সে কাহিনীটি এই। নাটকেব নায়িকা Amanda অত্যন্ত নীতিপরায়ণা মহিলা। তার স্বামী তাকে পরিত্যাগ করে চলে যান। স্বামী Loveless পরে নিঃস্ব অবস্থায় ইংলণ্ডে ফেরেন। এক বন্ধু ইচ্ছে করেই বলেন যে, Amanda মারা গেছেন এবং তিনি Amandaর কাছে গিয়ে বলেন যে Lovelessকে তার কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত অথবা তোমার প্রতি অনুরক্ত করার জন্যে কৌশল অবলম্বন করতে হবে। Amanda প্রথমে দ্বিধা প্রকাশ করলেও পরে এই পথই গ্রহণ করলেন। বহুদিনের অদর্শনের ফলে Loveless তাকে চিনতে পারলেন না এবং সৌন্দর্য ও নম্রতায় তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। Amanda এই তীব্র অনুভূতির মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত Lovelessকে বশীভূত করলেন এবং উভয়ে পুনর্বার মিলিত হলেন। কাহিনীর সঙ্গে জামাই বারিকের অভয়-কামিনী কাহিনীটির মিল আছে। জামাই বারিক থেকে উদ্ধৃত অংশের অনুরূপ পরিচয় এই নাটক থেকে উদ্ধার করা যাক।

"Loveless. I am all pity, all faith, expectation, and confused amazement; be kind, be quick, and ease my wonder.

১। **জামাই বারিক**, ৪।৩।

Amanda. Look on me well; revive your dead remembrance; and oh, for pity's sake (kneels) hate me not for loving long and faithfully! Forgive this innocent attempt of a despairing passion, and I shall die in quiet.

Loveless. (Amazed) Hah! Speak on!

Amanda. It will not be—the word's too weighty for my faltering tongue, and my soul sinks beneath the fatal burden. (Falls to the ground).

Loveless. Ha! She faints! Look up fair creature; behold a heart that bleeds for your distress, and fain would share the weight of your oppressive sorrows. Oh! thou hast raised a thought within me that shocks my soul.

Amanda. (Rising) 'T is done—the conflict's past, and Heaven bids me speak undaunted. Know then, even all the boasted raptures of your last night's love you found in your Ananda's arms!—I am your wife..for ever blessed or miserable as your next breath shall sentence me.

Loveless. Oh, I am confounded with my guilt, and tremble to behold thee..I have wronged you..basely wronged you.

Amanda. One kind, one pitying look, cancells those wrongs forever.

Loveless. Oh, seal my pardon with thy trembling lips, while with this tender grasp of fond reviving love I seize my bliss and stifle all thy wrongs forever. (embraces her)

Amanda. No more; I'll wash away their memory in tears of flowing joy."১

দীনবন্ধু মিত্রের শেষ নাটক কমলেকামিনী নাটকের সঙ্গে Macbeth নাটকের একটি দৃশ্যের গভীর মিল আছে। কমলেকামিনী নাটকের মণিপুর রাজমহিষী 'গান্ধারীর' সঙ্গে Lady Macbeth চরিত্রের মিল আছে। রানী গান্ধারী স্বপত্নী বিদ্বেষে বড় রানীর পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণের পর ধুনী দাইয়ের সাহায্যে রাজপুত্রকে বিসর্জন দেয়। সঙ্গে রাজার দেওয়া গজদন্ত নির্মিত

১। *Love's Last Shift.* V. ii.

একটি অপূর্ব কৌটাও বিসর্জিত হয়। দীর্ঘকাল পরে আপন পুত্র মকর-কেতনের কথায় তীব্র আঘাত পেয়ে তিনি অনুতপ্ত হন। কিন্তু নিজের এই কৃতকর্ম তাকে গভীর মানসিক অসুস্থতায় নিমজ্জিত করে। নিদ্রিত অবস্থায় ঘুরে ঘুরে তিনি নিজের অপরাধের বর্ণনা করতে থাকেন। একটু উদ্ধার করা যাক—

"গান্ধারী (গাত্রোত্থান এবং ভ্রমণ) পাপীয়সী—পাপের তাপ কি ভয়ংকর, প্রাণ পুড়ে গেল—পুড়ে ভস্ম হল না। পাপের আগুন পাঁজার আগুনের মত গোমে গোমে জ্বলে। জল দাও, এক কলসী জল দাও, সহস্র কলসী জল দাও আরো জ্বলে, গোমুখী হতে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত গঙ্গার যত জল আছে একেবারে ঢেলে দাও।১

ওমা! ও পরমেশ্বর! পাপানল নির্বাণ হয় না আরো জ্বলে, একটা প্রাণ পোড়াতে এত আগুন, খাণ্ডব দাহনে এত আগুন হয়নি। পাপের প্রাণ পোড়ে না কেবল পরিতপ্ত হয়। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, প্রাণ একেবারে জ্বলে গেল। জল দাও, জল দাও—অনন্ত সীমা, সমুদয় শীতল সাগর শুষ্ক করে জল দাও, পাপের আগুন নেবে না। হে সুশীতল নীলাম্বুনিধি! পাপীয়সীর পাপানলে তোমার নির্বাপিকাশক্তি তিরোহিত হল। (পর্যঙ্কে উপবেশন এবং রোদন"২।

Macbeth নাটকে অনুরূপ দৃশ্য আছে। বৃদ্ধ রাজা Duncanকে হত্যায় প্ররোচিত করেছিলেন Lady Macbeth তার স্বামীকে। তারই প্ররোচনা ও সাহসে নির্ভর করে Macbeth Duncanকে হত্যা করে। Banquo এবং আরো অনেককে হত্যা করে Macbeth তাঁর উচ্চাশার শিখরে উঠেছিলেন। Macbeth ও Lady Macbeth উভয় চরিত্রেই গভীর অনুতাপ ও জীবন সম্পর্কে শূন্যতার বোধ জন্মায়। Lady Macbeth চরিত্রের মানসিক বিপর্যয়ের একটি দৃশ্যই যে দীনবন্ধুকে প্রভাবিত করেছে সে সম্পর্কে সংশয় থাকে না।

"Lady Macbeth. Yet here's a spot.

Doct. Hark she speaks. I will set down what comes from her, to satisfy my rememberance more strongly.

Lady Macbeth. Out, damned spot! Out I say! One, two; why then 'tis time to do't. Hell is murkey. Fie my lord, fie! A

১। তুলনীয়, "Will all great Neptune's Ocean wash this blood clean from my hand?" *Macbeth,* II. ii.

২। **কমলে কামিনী,** ৪।১।

soldier, and afeared? What need we fear who knows it, when none can tell our power to account? Yet who would have thought the old man to have had so much blood in him?

Doct. Do you mark that?

Lady Macbeth. The Thane of Fife had a wife; where is she now? What will these hands ne'er be clean? No more o'that, my lord, no more o'that; you mar all with this starting.

....

Lady Macbeth. Here's the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Oh, oh. oh .১"

দীনবন্ধু মিত্র ও বিভিন্ন ইংরেজী নাট্যকারদের নাটকগুলির উদ্ধৃত অংশের সাদৃশ্য গভীর। ইংরেজী নাটকের ঘটনা-পরিস্থিতি ও চরিত্রের সঙ্গে দীনবন্ধুর নাটকগুলির ঘটনা, পরিস্থিতি ও চরিত্রের মিল লক্ষ্য করা যায়। তার একটি বড় কারণ ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিবিড় পরিচয় ছিল। মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্রে সেই প্রভাব ব্যক্ত করেছে। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অনেকখানিই বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব সঞ্জাত। ইংরেজী সাহিত্যরসে বাঙ্গালী সাহিত্যিকেরা সে সময় এত বেশী আবিষ্ট ছিলেন যে, অনেক সময়েই তাঁরা বিদেশী ভাবনা ও প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন নি। অবশ্য সত্যকারের প্রতিভাবানেরা বিদেশী ভাবনা ও ভঙ্গীকে একান্ত আপন করতে পেরেছিলেন। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে এই প্রতিভারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। কিন্তু লক্ষ্য করতে হয় মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে যে কাব্যরস প্রাধান্য পেয়েছে তার উপকরণ দেশের। অথচ এই উপকরণগুলি দেশজ হলেও তাকে নতুনদৃষ্টিতে দেখা ও নতুন ভঙ্গিতে সাজিয়ে দেওয়ার রীতিটি দেশীয় নয়। এই নতুন রীতিকে তাঁরা আত্মস্থ করলেও এবং আধুনিক কালে তা আমাদের ঐতিহ্য হয়ে উঠলেও মধুসূদন-দীনবন্ধু-বঙ্কিমচন্দ্রের কালে তা হয়নি। প্রকৃত পক্ষে কয়েকজন শক্তিমান লেখকের সাধনায় তা সম্ভব হয়েছে এবং এই লেখকদের মানসগঠন ঈশ্বর গুপ্তের সমকালে গঠিত হলেও প্রাচীন বাঙ্গালীর মানসগঠনের অনুরূপ নয়। ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য দীনবন্ধু মিত্রও গুরুর মানসিকতা ও সংস্কারকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি।

১। Macbeth, V. i.

দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলির সঙ্গে ইংরেজী নাটকের যে গভীর সাদৃশ্য তার থেকে স্পষ্ট প্রতীত হয় দীনবন্ধু এই নাটকগুলির সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁর হাস্যরসাত্মক নাটকের উপকরণগুলির প্রয়োগ কৌশলেও বিদেশী নাটকের ভঙ্গীটি স্পষ্ট। সুতরাং একথা বলার বিশেষ যুক্তি আছে যে দীনবন্ধু তাঁর সমকালের অন্যান্য কবি সাহিত্যিকের মতই বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব যুক্ত।

দীনবন্ধু নাটকে বিদেশী প্রভাব গভীর হওয়া সত্ত্বেও তা অধিকাংশ আলোচকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি তার কারণ দীনবন্ধুর বিশিষ্ট মানসিকতা। যে মানুষ পল্লীবাংলার তোরাপ, ক্ষেত্রমনির ছবি আঁকেন তিনিই আবার বৃদ্ধ রাজীবলোচন, বিন্দু-বগলা, নিমচাঁদ, হেমচাঁদ, নদেরচাঁদের চিত্র উপস্থিত করেন। বস্তুতঃ বহুদেশদর্শী দীনবন্ধু যাদেরই উপস্থিত করেছেন নাটকে, তাদেব অধিকাংশই বাংলাদেশের ও বাঙ্গালীর। দেশজ উপকরণের প্রাচুর্য, গ্রাম ও সহরের জীবন সমকালের জীবন্ত অনুভবে যুক্ত হয়েছে বলেই তাঁর নাটকের বিদেশী প্রভাবকে অন্তরালবর্তী বলে মনে হয়। এই বোধ থেকেই অনেকে তাঁর নাটককে খাঁটি বাঙ্গালীর সাহিত্য বলেছেন। প্রকৃত পক্ষে খাঁটি বাঙ্গালী ও খাঁটি বাংলা সাহিত্য একটি সংস্কার ছাড়া অন্য কিছু নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ঈশ্বরগুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালী আবার বঙ্কিমসমকালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বা দীনবন্ধু খাঁটি বাঙ্গালী। এমন কি রুচি ও সংস্কারের দিক থেকে এ দুজনের মধ্যেও পার্থক্য যথেষ্ট আছে। তাই খাঁটি বাঙ্গালীত্ব ও খাঁটি বাংলা সাহিত্য কোন বিশেষ অকৃত্রিমতার ওপর নির্ভরশীল তা নির্ণয় করা শক্ত। কেননা ঈশ্বর গুপ্ত যে অর্থে খাঁটি বাঙ্গালী, দীনয়ন্ধু বা বঙ্কিমচন্দ্র সে অর্থে খাঁটি বাঙ্গালী নন। অথচ এরাও বাংলাদেশের ভাবনাকে, সমাজ ও ব্যক্তিকে গ্রহণ করেছেন কাব্যে সাহিত্যে। ঈশ্বর গুপ্তের কাল থেকে এগিয়ে এসে বুদ্ধি ও হৃদয়ের সমাহারে জীবনের বিচিত্র রূপকে তুলে ধরেছেন সাহিত্যে। ঈশ্বর গুপ্তের নিষ্ঠা, ভক্তি, সাধনা, সংস্কারের সঙ্গে বঙ্কিম দীনবন্ধুর নিষ্ঠা ভক্তি সাধনা সংস্কারের পার্থক্য আছে। ঈশ্বর গুপ্ত যে বাংলা দেশ নিয়ে কাব্য লিখেছেন দীনবন্ধু সেই বিষয় নিয়ে লেখেন নি এবং এই কারণেই বাঙ্গালীত্ব সম্পর্কে খাঁটির প্রশ্ন ওঠে না। বস্তুতঃ খাঁটি বাঙ্গালীত্ব ও খাঁটি বাঙ্গলা সাহিত্য কথাটি আপেক্ষিক। প্রাচীন বাংলা দেশের আচার আচরণ ও সংস্কার যে সাহিত্য ও যে মানুষের জীবনে যত বেশি, তাঁর পরিমানের ওপর এই খাঁটিত্ব নির্ভর করে। এই অর্থে দীনবন্ধু তাঁর সমকালে খাঁটি না হলেও আধুনিক দৃষ্টিতে খাঁটি বাঙ্গালীর সম্মান পান।

লক্ষ্য করতে হয় দীনবন্ধুর নাটকগুলির ভাব, ভাষা, চরিত্র ও বিভিন্ন

উপকরণগুলি দেশজ হলেও বিদেশী প্রভাব তাঁর নাটকে অদৃষ্ট নয়। এই প্রভাবগত সাদৃশ্যে দীনবন্ধুর মর্যাদা ক্ষীণ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে ট্রাজিক রস যে চরিত্র, ঘটনা ও কাহিনীগুলিকে কেন্দ্র করে প্রকাশমান তার পরিমণ্ডল বিদেশী অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সে জন্যে নিন্দিত নয়। প্রকৃত পক্ষে দেশ ও বিদেশের সাহিত্যরীতির এমন একান্ত আত্মীকরণ মধুসূদন-বঙ্কিম পূর্বকালে হয় নি। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকেও এই মিশ্র সাহিত্য ভাবনার রূপ। সমকালের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে গ্রাম ও সহর বাংলার উপকরণগুলি বিদেশী ভাবনা ও রূপরীতির আশ্রয়ে এক নতুন বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। দীনবন্ধুর কৃতিত্ব এখানে যে, তাঁর নাটকে এই বিদেশী প্রভাব শুধুই অন্তরালবর্তী নয়—কখনো কখনো যবনিকার অন্তরাল থেকে দেশজ পরিচ্ছদে তার প্রকাশও ঘটেছে।

দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের ভাষা

নাট্যশিল্পের একটি প্রধান অংগ ভাষা। বস্তুতঃ সংলাপের ভাষা বিশেষ রীতির অনুসারী। ঔপন্যাসিকের ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা নাট্যকারের চেয়ে বেশি কেন না উপন্যাসে লেখকের নিজের কথা বলার সুযোগ সাধারণত থাকে। কিন্তু নাট্যকার এদিক থেকে শিল্পাদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর যেহেতু নাটকীয় চরিত্রগুলি স্বতন্ত্র সেইহেতু এই চরিত্রগুলির প্রকৃতির বিচিত্র অনুভূতির, সমস্যা ও দ্বন্দের একমাত্র বাহন ভাষা। প্রকৃত পক্ষে নাটকে কথোপকথনই পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আবার এক চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের সংলাপের ফলে নাটকের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এই অর্থে নাটকের চরিত্রগুলি সংলাপের সাহায্যেই পরিস্ফুট হয়। লক্ষ্য করতে হয় নাটকের সাধারণ কথাবার্তা চরিত্রকে অনেকটা আচরণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বর্ণনা করে এবং নাটকীয় ঘটনা, প্রবৃত্তি ও দ্বন্দ্বের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে নাটক অনুযায়ী ভিন্ন। প্রকৃত পক্ষে নাট্য শিল্প অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত বলেই তার পাত্র পাত্রীর ভাষাও লৌকিক ভাষার সঙ্গে যুক্ত। নাটকের ভাষা তাই মানুষের মুখের ভাষা। আমাদের জীবনের গভীরতর দুঃখের কিংবা আনন্দের অভিব্যক্তি যে ভাষাতে ব্যক্ত হয়, অথবা লঘু রসিকতা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা ভাঁড়ামীর যে ভাষা তারই একটি নিখুঁত প্রতিরূপ আমরা নাটকে আকাঙ্ক্ষা করি। আর নাটকের একটি বিশিষ্ট রীতি থাকায় তার ভাষাকেও সেই রীতির অন্তর্গত হতে হয়। সমস্ত সুন্দর প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত ভাব আছে যা অর্থকে প্রকাশ করে অথচ সত্যকে খর্ব করে না।১ নাটক এইকথাটির ব্যতিক্রম নয়।

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক ছাড়া অন্য নাটকগুলির পরিণতি করুণ নয়। তাঁর অন্য নাটকগুলি হাস্যরসাত্মক। বিদেশের নাট্যকারেরা যেমন

১। "The soul of good expression is an unexpectedness which, still, keeps to the mark of meaning, and does not betray truth!"

Galsworthy, John, 'On Expression', *New and Old Essays, Jepson*, R. W., 1938.

সমকালের নাটক সম্পর্কে বৈচিত্র্যহীনতার কথা তুলেছেন।১ দীনবন্ধুর নাটক সম্পর্কে সেই বৈচিত্র্যহীনতার কথা ওঠে না; বরং তাঁর কালের বিচিত্র সমাজ ব্যবস্থা থেকে সুরু করে অজস্র ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের সৃষ্টিতে দীনবন্ধু বিশিষ্টতার অধিকারী। লক্ষ্য করতে হয় গ্রামীন সমাজের কৃষক, কৃষক-পত্নী, কৃষক কন্যা, গোমস্তা, নায়েব, জমিদার বা সহরজীবনের শিক্ষিতদের ভাষা তিনি তাঁর নাটকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর সমকালের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষদের মুখের কথাও তিনি তুলে ধরেছেন।

এমন কি ভাষার নিতান্ত আঞ্চলিক প্রয়োগেও তার শক্তির পরিচয় আছে।২ বস্তুতঃ দীনবন্ধু মিত্র জানতেন নাটকের চরিত্রগুলি যখন প্রাকৃত বা দেশজ ভাষায় কথা বলে তখনই জীবন্ত হয়ে ওঠে। নীলদর্পণ নাটকের চাষি রায়ত সম্প্রদায় ছাড়া অন্য চরিত্রগুলির ভাষা ব্যবহারে যে দুর্বলতা আছে তা সম্ভবতঃ দীনবন্ধু মিত্রের নাটকীয় ভাষা সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের ফল। দীনবন্ধু-পূর্বকালে রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুল সর্বস্ব অথবা মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটক প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এরা কেউই শিক্ষিত বা উচ্চ বর্ণের স্ত্রী পুরুষের ভাষা সম্পর্কে কোন আদর্শ স্থাপন করতে পারেন নি। স্বভাবতঃই দীনবন্ধুর সামনে সংস্কৃত নাটক, বাংলা যাত্রা ও ইংরেজী নাটকের আদর্শ ছিল। সংস্কৃত নাটকের রাজা, রাজন্যবর্গের ভাষার সঙ্গে স্ত্রী চরিত্র ও প্রাকৃত মানুষের ভাষার পার্থক্য, কিংবা বাংলা দেশের যাত্রার সাধুভাষার গভীর উচ্ছ্বাস এবং ইংরেজী নাটকের ভব্য ইংরেজীর সঙ্গে কথ্য ইংরেজীর পার্থককে দীনবন্ধু লক্ষ্য করেছিলেন এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। প্রকৃত পক্ষে তাঁর নাটকে দেশজ

১। George Farquhar, *The Beaux Stratagem* নাটকের Scrub চরিত্রের উক্তি : Aye, Sir, a plot, a horrid plot. First, it must be a plot because there's a woman in't; secondly, it must be a plot because these's a priest in't; thirdly, it must be a plot because there's French gold in't; and fourthly, it must be a plot because I don't know what to make on't. IV. i.

শুধু plot নয় অন্যান্য বিষয়েও এই ধরনের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। *The Rehearsal* নাটকের রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে কথা বা *The Man of Mode* নাটকে "complete gentlemen"এর বর্ণনা স্মরণীয়।

২। "Dinabandhu Mitra fiirst attempted to draw out the picture and to preserve the exact language and pronounciation of different classes of people in Bengal."

Dutta, Mohendra Nath. *Appreciation of Michael Madhusudan and Dinabandhu Mitra,* 1956, 35-36.

যাত্রা সংস্কৃত নাটক ও ইংরেজী নাটকের প্রভাব গভীর। অবশ্য নীলদর্পণ নাটকের প্রেরণায় কোন ভাষাদ্বন্দ্ব না থাকারই কথা, তার স্পষ্ট প্রমাণ তোরাপ ও অন্যান্য রাইতদের কথায় আছে। তবু এই নাটকটিতে উচ্চ শ্রেণীর মানুষগুলির ভাষায় ভাষাদ্বন্দ্বের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাটকের ভাষায় গদ্য ও পদ্য উভয়ই ব্যবহার করেছেন। এই গদ্য ও পদ্যের ভাষায় ছড়া, প্রবাদ প্রবচন যুক্ত হয়ে বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। নীলদর্পণ নাটক ছাড়া তাঁর অন্য সমস্ত নাটকগুলির মৌল রস হাস্যরস। যদিও সেই হাস্যরসের সূক্ষ্মতা ভিন্ন শ্রেণীর ও উপকরণও ভিন্ন। এমন কি নীলদর্পণ নাটকের রায়তদের ভাষায় হাস্যরসের উপাদান আছে। স্বভাবতই দীনবন্ধুর নাটকের ভাষার আলোচনা তার হাস্যরসাত্মক উপকরণেরও। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার দিক থেকে এই বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যেতে পারে।

নীলদর্পণ নাটকের পাত্র-পাত্রীর ভাষাকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। এক, সাহেবের ভাষা। এ ভাষার বৈশিষ্ট্য (১) Vocabulary : হিন্দী শব্দ এবং হিন্দীশব্দগুচ্ছের ব্যবহার। যেমন, নালায়েক, শ্যামচাঁদ বেগার তোম দোরস্ত হোগা নেই, ১।৩ (২) বাক্যগঠন ঃ wrong personal inflection : যেমন, তুমি শালা বড় না লায়েক আছে, আমি না জানিলে কেমন করে শাসন করিতে পারে, ১।৩। হিন্দী শব্দ, শব্দগুচ্ছ, বাংলা slangs এবং ইংরেজী শব্দ ব্যবহার এ ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে দীনবন্ধু 'সাহেবের' বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত দেন নি। পরবর্তীকালে "সধবার একাদশী" এবং বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" ও 'আনন্দমঠ'এ 'সাহেবের' ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দন্তধ্বনি (Dental) গুলিকে মূর্ধন্য ধ্বনিতে পরিণত কর। যেমন 'তুমি' ইংরেজীতে 'Tumi' (টুমি)। পরবর্তীকালের নাটকে বিদেশীর বাংলা উচ্চারণে এই রীতিটি প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন। অনুমান করা যায় নীলদর্পণ অভিনয়কালে এই রীতি অবলম্বন করা হয়েছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ না পাওয়ায় নিশ্চিন্ত মন্তব্য করা যায় না।

দুই, বাঙ্গালীর ভাষা। এই শ্রেণীকে দুভাগে ভাগ করা যায় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ভাষা। স্ত্রীলোকের ভাষার Vocabulary, শব্দ ব্যবহারের পার্থক্য বিভিন্ন স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে ভিন্ন। কতকগুলি বিশেষ শব্দ বিশেষতঃ গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন, ভাতারী, আটকুড়ি, বুন, ভাইভাতারী ইত্যাদি। অনেক শব্দের রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয় যেমন, মহাপ্রাণ। (aspirate) অল্পপ্রাণে (non-aspirate) পরিণত। চিঠি>চিটি, মাথা>

মাতা। 'ল' ধ্বনিটির রূপান্তর 'ন' ধ্বনি, যেমন, লোক>নোক, "উ" "ও" তে পরিণত ঃ উটলো>ওটলো। মেয়েলি শব্দের প্রয়োগ, যেমন মাইরি।

পুরুষদের ভাষাতে লক্ষ্য করা যায় ভদ্রলোক শ্রেণীর ভাষায় দুটি স্পষ্ট ভেদ আছে! গোলক ও নবীনমাধব পুরোপুরি সাধুভাষায় কথা বলে— "হইয়াছে", "করিয়াছে" ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে। অপর পক্ষে অন্যান্য চরিত্র চলিত ভাষায় কথা বলে। সাধুচরণ চলিত ভাষায় কথা বললেও প্রায়শই তার কথায় সাধু ক্রিয়াপদ যুক্ত হয়। শব্দের দিক থেকে বিচার করলে তৎসম শব্দের প্রয়োগ গোলক ও নবীন মাধবের বা বিন্দুমাধবের ভাষায় অনেক বেশি। যেমন, "বিন্দু। বিপিন আমার বিপদ সাগরে ধ্রুব নক্ষত্র!) বিনশ্বর অবনী মণ্ডলে মানবলীলা, প্রবল প্রবাহ সমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অতুচ্চকুলতুল্য ক্ষণ-ভঙ্গুর। তটের কি অপূর্ব শোভা! লোচনানন্দপ্রদ নবীন দূর্বাদলাকৃত ক্ষেত্র, অভিনব পল্লব সুশোভিত মহীরূহ, কোথাও সন্তোষ সঙ্কুলিত ধীবরের পর্ণকুটীর বিরাজমান, কোথাও নবদূর্বাদল লোলুপা সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা, আহা! তথায় ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গমদলের সুললিত ললিত তানে এবং প্রস্ফুটিত বনপ্রসূন সৌরভামোদিত মন্দ মন্দ পূর্ণানন্দ আনন্দময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে।" (এখানে শুধুই যে সংস্কৃত শব্দের এবং দীর্ঘ সমাসের বাহুল্য তা নয় ভাষা অত্যন্ত আলঙ্কারিক। অনুপ্রাস এবং রূপক ব্যবহারের ফলে ভাষার স্বাচ্ছন্দ বিশেষ ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু এই ভাষার ব্যবহার স্বল্প। সম্ভবতঃ নাট্যকার গভীর আবেগ প্রকাশের জন্যে গুরুগম্ভীর ভাষার চিন্তা করেছিলেন। অন্যান্য স্থানে বিশেষ করে বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনে ভাষা অনেক বেশি স্বাভাবিক।) যেমন, "গোলক। বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা। আমার এখানে সাত পুরুষ বাস।...ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাচ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়"? ১।১ (এখানকার শব্দগুলি বাঙ্গালীর মুখের ভাষা। বাক্যগুলি ছোট। জটিল বাক্য কম অর্থাৎ মুখের ভাষার স্বাভাবিক গুণ এখানে সম্পূর্ণভাবেই প্রকাশিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষায় মিশ্রক্রিয়া পদ্ধতি সম্ভবত দীনবন্ধু নাটকে ভাষাদ্বন্দ্বের বড় পরিচয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই শ্রেণীর চরিত্রগুলি চলিত ভাষায় কথা বলে—"সাধু। ঐ ক বিঘা জমির ভরসাতেই থাকা, তাই যদি গ্যালো, তবে আর এখানে থেকে কর্‌বো কি। আর যে দুই এক বিঘা নোনা ফেনা আছে, তাতে তো ফলন নাই, আর নীলের জমিতে লাঙ্গল থাকবে, তা কারকিতা বা কখন করবো। তুই কাঁদিস নে, কাল হাল গরু বেচে গাঁর মুখে ঝ্যাঁটা মেরে বসন্তবাবুর জমি-দারিতে পাল্‌য়ে যাব।" ১।২ মধ্যে মধ্যে সাধু ক্রিয়াপদের প্রয়োগ তাদের

ভাষাকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল করেছে। রায়তদের ভাষায় কথার স্বাভাবিক গুণ সবচেয়ে স্পষ্ট। সাধু চলিতের মিশ্রণ বা ভাষা ব্যবহারে দ্বন্দ্বে নাট্যকার এখানে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের উপভাষাকে ভিত্তি করে এই চরিত্রগুলির সংলাপ রচনা করেছেন।) এই ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্মণীয়।

(ক) সাধু বাংলার 'এ' ধ্বনিগুলি এখানে 'এ্যা'তে পরিণত ঃ মেরে>ম্যারে, পেট>প্যাট।

(খ) করতে, খেতে, যেতে ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি এই ভাষায় কর্ত্তি, খেতি, যাতি-তে পরিণত, অর্থাৎ ধাতু মূলের (verb-root) সঙ্গে 'তি' বিভক্তির যোগ এগুলির বৈশিষ্ট্য।

(গ) মহাপ্রাণ (aspirate) অল্পপ্রাণ (non-aspirate) পরিণত ঃ লেগেছি >লেগেচি।

(ঘ) 'ল' ধ্বনির 'ন' ধ্বনিতে পরিণত হওয়া—লোক>নোক।

(ঙ) 'ট' ধ্বনির 'ড' ধ্বনিতে পরিণতি—গাটা, গাডা; জমিটে, জমিডে।

(চ) অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণে পরিণত—যে বড়বাবুর জন্যে জাত বেঁচেছে>ঝে বড় বাবুর জন্যি জাত বাঁচেছে।

(ছ) অধিকরণ কারকের (locative case) 'এ' বিভক্তির 'ই'তে পরিণতি—মুখে>মুখি, চোখে>চকি, তিলের>তিলির।

(জ) সর্বনাম মুই. মোকে ইত্যাদির প্রয়োগ।

(ঝ) 'র' ধ্বনির 'ন'তে পরিণতি। নিতে আতাই একটা নচচে শুনিস্ নি। 'র' ধ্বনির 'অ' পরিণত হওয়া—রক্ত>অক্ত।

✓(ঞ) মধ্যে মধ্যে সাধু শব্দের (সংস্কৃত শব্দের) গ্রাম্য উচ্চারণ অপরূপ> অরপুরুব, বিভ্রম>ব্যাভ্রম। নীলচাষের সঙ্গে যুক্ত দু-একটি ইংরেজী শব্দও চাষিদের ভাষার বিকৃত উচ্চারণে রক্ষিত হয়েছে। যেমন মার্গ শব্দটি, ইংরেজী mark শব্দের অপভ্রংশ।

(মহিলাদের ভাষাতেও পুরুষদের মত দুই শ্রেণীর বাকরীতি আছে। একটি সাধু ও অন্যটি লৌকিক রীতি।) সাধু রীতির ভাষার উদাহরণ—"সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ. অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে তুমি যে জন্য দিবা নিশি ভ্রমণ করে বেড়াইতেছ, যে জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ। যে জন্যে তোমার চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে। যে জন্যে তোমার প্রফুল্ল বদন বিষণ্ন হইয়াছে. যে জন্য তোমার শিরঃপীড়া জন্মিয়াছে, হে নাথ আমি সেই জন্যে কি অকিঞ্চিৎকর আভরণগুলি দিতে পারি নে?" ৩।২ (এই ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য, সংস্কৃত নাটকের রীতিতে সম্বোধন ও দীর্ঘ বাক্য প্রয়োগ-

রীতি লক্ষ্য করা যায়। অন্যপক্ষে, আদুরী, সরলতা, রেবতী, ক্ষেত্রমণির ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ নেই। এমন কি সৈরিন্ধ্রীর ভাষাও কোন কোন অংশে আশ্চর্য স্বাভাবিক। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে একথা স্পষ্ট করা যেতে পারে। "সৈরিন্ধ্রী। আমার হাতে এমন দড়ি একগাছিও হয়নি। ছোট বউ বড় পয়মন্ত। ছোট বয়ের নাম করে যা করি তাই ভাল হয়।) এক পন ছুট করেছি কিন্তু মুটোর ভিতর থাকবে। যেমন একঢাল চুল তেমনি দড়ি হয়েছে।

সরলতা। দিদি, দ্যাখ দেখি, আমি সিকের তলাটি বুনতে পেরেছি কিনা! হয় নি?

আদুরী। তবে খামাস্তে মোইখান আনি, তা নলি চালে ওটবো ক্যামন করো্য।

রেবতী। এ কথা কি আজো দিদি পরকাশ করিছি। মোর যে ভাঙ্গা কপাল সত্যি কি মিথ্যে তাই বা কেমন করে জানবো। তোমরা আপনার জন তাই বলি—এই মাসের কড়া দিন গেলি চার মাসে পড়বে।

ক্ষেত্রমণি। মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর বড় খাপা হয়েলো, ঠাকরুন-নিরি বল্লে ঝাপটা কাটা কস্‌বিদের আর বড় নোকের মেয়েগার সাজে—মুই শুনে নজ্জায় মর্য়ো গ্যালাম, সেই দিনি ঝাপটা তুলে ফ্যাল্‌লাম।"

উদ্ধৃত অংশগুলি ইতঃস্ততঃ গ্রহণ করা হয়েছে। লক্ষ্য করতে হয় এদের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ নেই। রায়তদের ভাষা আলোচনায় যে বৈশিষ্ট্য-গুলি লক্ষিত হয়েছে এদের ভাষাতেও সেই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত। মুখের ভাষা, ছোট বাক্য এবং ছোট সংলাপ এই ভাষার বৈশিষ্ট্য। পূর্বে উল্লেখিত সৌরিন্ধ্রীর ভাষার সঙ্গে এখানে উল্লেখিত সৈরেন্ধ্রীর ভাষার পার্থক্য এত বেশি যে মনে হয় এরা ভিন্ন চরিত্র। বস্তুতঃ অন্য নারী-চরিত্রগুলির মাঝখানে তার যে প্রকাশ তা নবীনমাধবের সামনে ভিন্নরূপে দেখা গেছে।

এই আলোচনায় মূলতঃ প্রধান পাত্র পাত্রীর ভাষা সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কিন্তু এরা ছাড়াও আরো কয়েকটি ছোট চরিত্র আছে। যেমন, 'পণ্ডিত' এদের ভাষা মূলতঃ সাধুশ্রেণীর ভাষা। 'ডাক্তার সাহেবের' ভাষা সাহেবের ভাষার মধ্যে পড়ে, তবে রোগ বা উডের মত অশ্লীল শব্দ এবং হিন্দী শব্দের প্রয়োগ এদের ভাষায় নেই।

চরিত্রগুলির ভাষা প্রয়োগে বা সংলাপ রচনায় দীনবন্ধু যে অত্যন্ত দ্বিধা-গ্রস্ত হয়েছিলেন তা স্পষ্ট। সৈরিন্ধ্রীর ভাষায় যে স্পষ্ট দুটি স্তর দেখা যায় অথবা গোপীর বা সাধুচরণের ভাষায় কখনো ভদ্রজনের ভাষা কখনো রায়তদের

ভাষার কাছাকাছি সংলাপ দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে প্রমাণ করে যে দীনবন্ধু সংলাপ রচনায় ভাষা সম্পর্কে এখনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেননি। স্বভাবতঃই সংলাপের ভাষা সম্বন্ধে এই দ্বিধা নীলদর্পণ নাটকের আড়ষ্টতার একটি বড় কারণ। সেই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে লৌকিক বাক্‌ভঙ্গীর নিখুঁত প্রতিফলনের ফলে তাঁর নাটকের অনেক অংশ জীবন্ত এবং এই অংশগুলির সার্থকতা থেকে দীনবন্ধু পরবর্তী নাটকে কি ধরনের ভাষা প্রয়োগ করা উচিত তার শিক্ষা নিয়েছিলেন সন্দেহ নেই।

নবীন তপস্বিনীতে নীলদর্পণের মতই গদ্য এবং পদ্য উভয় ধরণের সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। পদ্য সংলাপ (২/২) মূলতঃ স্বগতোক্তি, তবে কয়েকটি স্থানে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যে ব্যবহৃত। নবীন তপস্বিনীর ভাষাকে মূলতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। রাজা, বিজয় এবং তপস্বিনীর ভাষা সাধুগদ্য; অন্যান্য চরিত্রগুলি স্বাভাবিক লৌকিক গদ্যে কথা বলে। রাজা, তপস্বিনী প্রভৃতির গদ্যে সাধু রীতির সঙ্গে চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও তা মূলতঃ কৃত্রিম। সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার, অতিরিক্ত আলঙ্কারিক ভাষা প্রয়োগ, দীর্ঘ সংলাপ সংস্কৃত নাটকের মত সম্বোধন ব্যবহার এই ভাষার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষা বৈশিষ্ট্যই এই নাটকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়। মেয়েদের ভাষায় গো, আহা, মাইরি, পোড়ার মুখ, ভাই ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার যেমন আছে সেই সঙ্গে লক্ষণীয় যে নীলদর্পণের নারী চরিত্রের ভাষায় যে পরিমাণে গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ হয়েছে তা এখানে হয়নি। 'জগদম্বার' সংলাপে আমরা নীলদর্পণেব নারী চরিত্রগুলির মতই ভাষা প্রয়োগ দেখতে পাই এবং গৌরবের বিষয় এই যে দীর্ঘ সংলাপেও জগদম্বার ভাষা স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ। বাক্যগুলি ছোট এবং শব্দগুচ্ছ লৌকিক। উদাহরণ হিসেবে একটি উদ্ধৃতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

"জগদম্বা। আজ তোমারি একদিন, আর আমারি একদিন, এই মুড়ো ঝাঁটা মুখে মারবো, তবে ছাড়বো। পোড়া কপালীর ব্যাটা, এত বিশ্বাস করে, এই আশ্চর্য। তাদের হলো সোমত্ত বয়েস, ভরা যৌবন, তারা ওঁয়ার রসিকতায় ভুলে, দড়োদাড়ি ওঁয়ার বৈটকখানায় আস্‌তে যাচ্চে? পোড়ারমুখ। এই ছলনা বুঝতে পারে না, মন্ত্রীর কর্ম করে কেমন করে? সে বার গুনী গয়লানীকে খামকা একটা কথা বলে কি ঢলানডাই ঢলালে, কত মিনতি করে, পায় হাতে ধরে, চুপচাপ করিয়ে দিলেম। তা তো লজ্জা নাই, বিঁচ উলে গেলে আর তো মনে থাকে না, রাগের মাতায় যা বলি টলি, মালতীকে আমার ভয় হয় না, ও খুব ধীর শান্ত। আমার ভয় করে ঐ মল্লিকে ছুঁড়িকে, ছুঁড়ি যেন

আগুনের ফুলকি, যার চালে পড়বে তার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। এত বয়স হয়েছে, তবু ভাল শাড়িখানি পরিচি, কেমন দেখাচ্চে, তা তোর যদিই ভাল লাগে আমারে বল্লিই তো হয়, আমি আবার কাল পেড়ে ধুতি পরি, সিঁতেয় সিঁথি দিই. ঝাপটা কাটি মিনসে তো করবে না। কেবল পাড়ায় পাড়ায় পাক দিয়ে বেড়াবে। আমি ঘোমটা দিয়ে চুপ করে বসি. যদি ধত্তে পারি. আজ মালতী মল্লিককে মা বলিয়ে নেবো, তবে ছাড়বো।" ২/১

পুরুষ চরিত্রদের মধ্যে বিশেষকরে জলধরের ভাষা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সংস্কৃত শব্দ, তদ্ভব এবং গ্রাম্য সমস্ত শব্দেরই সঙ্গতি তার ভাষায় রক্ষিত হয়েছে। যেমন, "জলধর।...আমার যেমন রূপ, আমার জগদম্বারও ততোধিক —কোকিল গঞ্জিনী, স্বরে? না বর্ণে; বয়সে গাছ পাতর নাই, কিন্তু আজো কেউ পদ্ম চক্ষু দেখতে পেলে না, কেন তিনি কি অতি লজ্জাশীলা? তা নয়, চোয়াল দুখানি এমনি উঁচু নয়নযুগল নয়নগোচর হয়না. যদি চিত্ হয়ে শুয়ে কাঁদেন, বাছার চক্ষের জল চক্ষে থাকে. গড়াতে পায় না এমনি খোল, আহা! যখন হাসেন, যেন মুলোর দোকান খুলে বসেন নাক দেখলে সূর্পনখা লজ্জা পায়, আর কাজে কাজেই গজেন্দ্রগামিনী. কারণ দুই পায়েতেই গোদ আছে, কথা কন আব অমৃত বর্ষণ হোতে থাকে, অর্থাৎ যে কাছে থাকে তার সকল গায়ে থুতু লাগে।" ১/২

অপরপক্ষে মাধবের ভাষায় নাট্যকার বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। একই-রকম প্রয়োগবৈশিষ্ট্য ঘটকদের ভাষায় আছে। ঘটকদের সংলাপের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের আধিক্য থাকা সত্ত্বেও এই সংলাপ বিশেষ আকর্ষণীয়। কারণ, এখানে সংলাপের দ্বারা হাস্যসৃষ্টির প্রয়াস আছে। সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে নিতান্ত লৌকিক শব্দের সহাবস্থানের দ্বারা রসসৃষ্টির সচেতন চেষ্টাই প্রধান। যেমন—

"প্রথম ঘটক। গঙ্গার পশ্চিম তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে অনেক পাত্রী দেখলেম....এক প্রমদার যেমন গজেন্দ্র গমন তেমনি মধুর বচন, রূপের ত কথাই নাই, সুমধুর যোলোয় আর থাকেন না. কিন্তু তাঁর চাওনিটে কেমন কেমন...আদরিনী সগৌরবে সুধার সতেরোয় সাঁতার দিচ্ছেন. সুধাংশুবদনীর এক দোষ আছে. সেই দোষে সকল সৌন্দর্য বিফল হয়েছে—হাসলে দাঁতের মাড়ি বেরিয়ে পড়ে।" ১।৪

"দ্বিতীয় ঘটক। সত্যবান রাজার বাড়ীর অনতিদূরে আমি এক পরমা সুন্দরী রমণী দর্শন করলেম...তিনি ষোড়শী যুবতী. অদ্যাপিও নাকের মধ্য-স্থলে একটি নোলক দোদুল্যমান রহিয়াছে...আমার হাসি আপনিই এলো. মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হলো, আমাকে মারবের উদ্‌যোগ কল্যো—কেহ বলে

হাস্ দিলা ক্যান, কেহ বলে...হালা পো হালারে অ্যাড্ডা চরে বৈকুণ্ঠে পাডায়ে দেই।” ১।৪

দ্বিতীয় ঘটকের ভাষায় পূর্ববঙ্গের উপভাষার ব্যবহার হয়েছে। দীনবন্ধুর রচনায় হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে পূর্ববঙ্গের উপভাষা ব্যবহাব এই প্রথম।১ পরে সধবার একাদশী ও জামাই বারিকে এই ভাষারীতি সংলাপ-বৈচিত্র্যের একটি প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, কোন উপভাষাই হাস্যরস সৃষ্টির পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী এমন ধারণা করা ভুল। হাস্যরস সৃষ্টি মূলতঃ অনেকগুলি সংস্কারের ওপর নির্ভর করে। এক অঞ্চলের মানুষের অন্য অঞ্চলের ভাষার সম্পর্কে নানা সংস্কার থাকতে পাবে। এই সংস্কারকে অবলম্বন কবেই লেখকরা বিভিন্ন প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করতে পাবেন। দীনবন্ধু একটি বিশেষ অঞ্চলের ভাষাকে হাস্যরস সৃষ্টির উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন তার অর্থ এই নয় যে, সেই ভাষা হাস্যকর। কারণ, যশোহর-নদীয়া অঞ্চলের উপভাষার দ্বারাই তিনি মানুষের ক্রোধ, সহানুভূতি ও তীব্র দুঃখ কে জাগিযে তুলেছেন। পরবর্তীকালে কলকাতা অঞ্চলেব নাট্যকারেরা পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলেব ভাষাকে শুধুই হাস্যবসের জন্য ব্যবহার কবেছেন। সেই হাস্যরস বলাই বাহুল্য শুধু ভাষার দ্বাবাই সৃষ্ট হয়নি। সেই ভাষাব সংগে হাসিব অন্য উপাদান ছিল বলেই হযেছে। পূর্ববঙ্গীয় বিচিত্র অনুভূতিব প্রকাশ কিভাবে হয় তার পরিচয়ও আধুনিক বাঙ্গালী সাহিত্যিক দিয়েছেন।

নবীনতপস্বিনীতে দেখা যায় ভাষাদ্বন্দ্ব অনেক পরিমাণে সরল হয়ে এসেছে। পরবর্তী নাটকে দীনবন্ধু এই ভাষাদ্বন্দ্বকে সম্পূর্ণ সমাধান করেছেন বলে মনে হয়। দীনবন্ধু অনুভব করেছেন যে, নাটকের ভাষা সাধুগদ্যের ভাষা হতে পারে না—তা মুখের ভাষা। বিয়ে পাগলা বুড়ো প্রহসনেই দেখি তিনি প্রত্যেকটি সংলাপে চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য নাটক সম্পর্কে সমালোচকেরা যে আড়ষ্টতার অভিযোগ করেছেন বিয়ে পাগলা বুডোর, সংলাপ তার ব্যতিক্রম। রাজীব মুখোপাধ্যায়ের যে কোন সংলাপ আলোচনা করলে এই কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হবে। এই নাটকেও চবিত্র অনুসাবে ভাষা ব্যবহারেব পার্থক্য আছে। পুরুষদের ভাষা এবং নারীদের ভাষাব পার্থক্য রক্ষায় দীনবন্ধু আগের মত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর প্রথম নাটক

১। পূর্ববঙ্গের উপভাষার বৈশিষ্ট্যের জন্য দ্রষ্টব্যঃ

Chatterjee, S. K. *The Origin and Development of the Bengali Language*. Vol I. 1926. 138-39.

থেকে কবিতায় সংলাপ রচনায় যে চেষ্টা দেখা যায় তা বিয়ে পাগলা বুড়োতেও কিছু মাত্রায় কমেনি বরং তার বৈশিষ্ট্য আছে। এখানকার কবিতা সংলাপগুলি শুধুমাত্র পয়ারে রচিত নয় কিন্তু কিছ কিছু ছন্দবৈচিত্র্যও আছে। এই-রকম সংলাপ আধুনিক দর্শক বা পাঠকের কাছে আদরনীয় না হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু কবিতাগুলির ভাষা, বিষয়বস্তু এবং গঠনভঙ্গী অনেকটা প্রবাদ ধরণের এবং তারই ফলে ছোট ছোট কবিতাংশ পাঠের সময় তা মূল কাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। দীনবন্ধু তাঁর ভাষা সমাধান যদিও খুঁজে পেয়েছেন কিন্তু একটি ক্ষেত্রে নিজের ব্যর্থতা এখনও স্পষ্ট অনুভব করেন নি তা হল কবিতায় সংলাপ রচনায় চেষ্টা। এই দ্বন্দ্ব থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারলেন তাঁর পরবর্তী নাটক সধবার একাদশীতে।

সধবার একাদশী তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক শুধু চরিত্র সৃষ্টির জন্যে নয়, নাট্য-পরিকল্পনার জন্যেও নয়, ভাষা ব্যবহারে সিদ্ধিলাভ এখানে হয়েছে বলেই। এই নাটকে যে দু-তিনটি কবিতা সংলাপ আছে তার উপস্থাপনা সার্থক। কাঞ্চনের প্রতি নিমচাঁদের স্তব১ নাটকের গতিকে যে শুধু বাড়িয়েছে তাই নয়—নিমেদত্তর চরিত্র, বৈদগ্ধও এতে প্রকাশিত। এই অংশটি মূল সংলাপের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত। এ ছাড়া কখনো কখনো যে কবিতার চরণগুলি এখানে আছে, তা প্রবাদধর্মী এবং নাটকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। নাটকের শেষ সংলাপটি কবিতায় রচিত। এখানে দীনবন্ধু মাত্র চারটি ছত্রের মধ্যে এই

১। নিম। পূন্য পুঞ্জ পশু দেবি স্বৈরিনি!
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বৈরিনি!
নব্য বঙ্গ বৃন্দ ধ্বংস ডায়িনি।
সাধ্বি পুঞ্জ চিত্ত দুঃখ দায়িনি।
নাস্তি ধর্ম নাস্তি কর্ম পাপিনি!
কৃষ্ণ জিহ্ব দুষ্ট কাল সাপিনি!
বার বার লক্ষ জার নাশিনি।
নৃত্য গীত হাবভাব শালিনি!
পাপতাপ পুষ্পমাল মালিনি।
ফেটনাখ্য গাড়ি যোড়ি হাঁকিনি!
উলসনের ভোগরাগ চাকিনি!
ফ্রান্স দেশজাত মদ্য লোভিনি!
পেশয়াজ সাজ অঙ্গ শোভিনি!
পাপদত্ত বিত্তমত্ত রাঙ্গিনি।
লালমুণ্ড হাড্ডিসার অঙ্গিনি। সধবার একাদশী ১।১

সংলাপ শেষ করেছেন এবং নিমেদত্তের এই শেষ চারটি ছত্র এ নাটকের একটি উৎকৃষ্ট সংলাপ।১ সধবার একাদশীর সংলাপের ভাষাবৈচিত্র্য যথেষ্ট।

(ক) এখানে প্রথম হিন্দীভাষী চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে। যেমন, অযোধ্যা সিং এবং রঘুবীর রায়-এর সংলাপ (২।৩) ইতিপূর্বে নীলদর্পণ নাটকে সাহেবের সংলাপে হিন্দী বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু এই প্রথম বাংলা সাহিত্যে বিশেষতঃ বাংলা নাটকে হিন্দী সংলাপের আবির্ভাব।

(খ) এই নাটকে পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল যে, তারা ইংরেজী এবং বাংলা শব্দ মেশানো বাক্‌রীতিতে অভ্যস্ত। এই রীতি সম্ভবতঃ বাংলা দেশে বিশেষ করে কলকাতায় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ব্যবহৃত হয়। সেকাল আর একাল গ্রন্থে এর পরিচয় আছে।২ এই সময় থেকে শিক্ষিত বাঙ্গালী স্বাভাবিকভাবে বললে ইংরেজী না মিশিয়ে বলতে পারে না। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় প্রথম এই মিশ্র বাক্‌রীতিটির সাহিত্যে স্থান হল। ঐ নাটকে নবকুমারের মুখে 'সভাটা দেখচি এবলিশ কত্তে হল (১।১) বাক্যের 'abolish' শব্দটি এই মিশ্ররীতির সূচনা। দীনবন্ধু এই ভাষারীতিকে সধবার একাদশী নাটকে প্রতিষ্ঠা দিলেন এবং পরবর্তীকালের বহু শ্রেষ্ঠ অভিনেতার কণ্ঠে এই ভাষা উচ্চারিত হয়ে এই বাক্‌রীতিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে। এই বাক্‌রীতি আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর মুখের কথার এত কাছাকাছি যে, এ ভাষা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই বললেই হয়। কখনো ইংরেজী শব্দ কখনো দীর্ঘ ইংরাজী বাক্য, কখনো বা ইংরেজী এবং বাংলা শব্দের মিশ্রণ

১। নিম। কি বোল বলিলে বাবা বলো আর বার—
মৃত দেহে হলো মম জীবন সঞ্চার।
মাতালেব মান তুমি, গনিকার গতি—
সধবার একাদশী তুমি যার পতি। ৩।৩

২। রাজনারায়ণ বসু অবশ্য এই মিশ্ররীতির কথোপকথনকে সমর্থন করেননি—তুলনীয় 'সেকালের লোক কৌতুকের জন্য ইংরাজী বাঙ্গালা শব্দ মিশাইয়া ছড়া প্রস্তুত করিতেন, যথাঃ শ্যাম going মথুরায়, গোপীগণ পশ্চাৎ ধায়, বলে Your Akroor Uncle is a great rascal ; আমরা কৌতুকের জন্য নহে, গম্ভীরভাবে ঐরূপ ভাষায় কথা কহি। কিন্তু আমরা নিজে বুঝিতে পারি না যে তাহা কত হাস্যাস্পদ। আমার father yesterday কিছু unwell হওয়াতে doctor-কে call করা গেল। তিনি একটি physic দিলেন। Physic বেস্‌ operate করেছিল, four five times motion হলো অদ্য কিছু better বোধ কচ্চেন।'

রাজনারায়ণ বসু, সেকাল আর একাল ১৮৭৪, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৬ (১৩৬৩) পৃঃ ৬২-৬৩।

অর্থাৎ আধুনিক বাঙালীর প্রাত্যহিক কথাবার্তার যা বৈশিষ্ট্য তাই এ ভাষার বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত বাঙালীর মুখের কথাকে এত নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা বাংলা সাহিত্যে বেশি হয়নি। কিন্তু দীনবন্ধুর সংলাপ রচনার যে সার্থকতা একদিকে এই ভাষারীতি গ্রহণের মধ্যে তেমনি আর একদিকে এই নাটকেই তিনি নিমেদত্তের মুখে প্রথম অঙ্কেই দীর্ঘ পদবন্ধ সাধুভাষায় যে সংলাপ রচনা করেছেন তাতে তাঁর দুর্বলতাও প্রকাশিত। এই নাটকের সংলাপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রামমাণিক্যের ভাষায়।১ তার ভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্প প্রাণে পরিণত হওয়া, ভাল > বাল, ধেনো > দেনো। তালব্য বর্ণ 'শ' এর Glottal 'হ' এ পরিণতি, শোধন > হোদন, শুকনা > হুকনা, শা > হা। কলকাতায় উচ্চারিত 'এ' ধ্বনি পরিণত হয়েছে 'এ্যা'তে যেমন, কেবল > ক্যাবল; পেট > প্যাট। তার 'বাঙ্গাল কইবার পারেন', বাক্যের participle কইবার + পারা এটি লক্ষণীয়; যেমন লক্ষণীয় ভাগ্যধরীর বাগ্যদরীতে পরিণত হওয়া কিংবা বাড়ির পরিণতি বারিতে।

এই নাটকে Sergeant এর ভাষায় বাংলা শব্দ একটিও নেই এবং নীলদর্পণের সাহেবের ভাষায় যে বৈশিষ্ট্যের অভাব লক্ষ্য করা গেছে অর্থাৎ দন্তধ্বনির মূর্ধণ্য উচ্চারণ তা এইখানে প্রথম পাওয়া গেল। যেমন, আবি টোমারা, টোম কোন হ্যায়।

বিভিন্ন ভাষার প্রতি দীনবন্ধুর যে আকর্ষণ ছিল তার প্রকাশ লীলাবতীতে আরো স্পষ্ট। উৎকলবাসী রঘুয়ার সমস্ত কথোপকথন মূল ওড়িয়াতেই ব্যবহার করা হয়েছে। কোন বাংলা নাটকে ইতিপূর্বে এইরকম ওড়িয়া সংলাপ ব্যবহার করা হয়নি। বহু ভাষাভাষী কলকাতার জীবনকে তুলে ধরতে গেলে বিচিত্র ভাষা প্রয়োগ নাটকেরও প্রয়োজন একথা দীনবন্ধু গভীরভাবে বুঝেছিলেন, তাই তাঁর নাটকে বিভিন্ন ভাষা প্রয়োগ দেখা গেছে। এদের মধ্যে ওড়িয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, ওড়িয়া সংলাপ, ওড়িয়া গান

২। রাম। পুঙ্গির বাই বাঙ্গাল কর্য়া মস্তক গুরাইদিচে বাঙ্গাল কউস ক্যান এতো অকাদ্য কাইচি তবু কলকত্তার মত হবার পারচি না, কলকাত্তার মত না করচি কি? মাগুরি চিকোন দুতি পরাইচি, গোরার বারীর বিস্‌কাট বক্‌কোন করচি, বাণ্ডিল খাইচি, এতো কর্য়াও কলকাত্তার মত হবার পারলাম না, তবে আর এ পাপ দেহতে আর কাজ কি, আমি জলে জাপ দিই, আমারে হাঙ্গোরে কুমিরে বক্কোন করুক—২। ২ পৃঃ ৩১ এর সঙ্গে তুলনীয়—"there was a time when a Scot who wished to advance his career and came to England was anxious to be rid of his Scottish accent;. . . .

Brown, Ivor, *Mind Your Language, Dialect* 1962, p. 70.

ও কবিতা ব্যবহার করে দীনবন্ধু নাট্য-জগতে এই ভাষারীতিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। পরবর্তী বাংলা নাটকে ওড়িয়া এবং হিন্দীর বহুল প্রয়োগ দেখা গেছে। পূর্ববঙ্গী উপভাষা ব্যবহারের মতই এক্ষেত্রে দীনবন্ধু ভবিষ্যত নাট্যকারদের পথ দেখিয়েছেন।

লীলাবতীতে দীনবন্ধু কবিতায় সর্বাপেক্ষা বেশি সংলাপ ব্যবহার করেছেন। তা কখনো স্বগতোক্তি, কখনো গদ্য-পদ্য মিশ্রিত ভাষা, কখনো কবিতায় কথাবার্তা। সেদিক থেকে বলা যায় যে, এই নাটকে পদ্য সংলাপ অন্য সমস্ত নাটকের চেয়ে বিশিষ্টতার অধিকারী। পদ্যগুলি কখনো মিত্রাক্ষর কখনো অমিত্রাক্ষর। কোন কোন সময় ত্রিপদী ছাঁদ কখনো বা প্রবহমান পয়ার। এই কথোপকথনগুলি অত্যন্ত কৃত্রিম। বহু ব্যবহৃত প্রাচীন উপমা এবং কবি-প্রসিদ্ধির নিতান্তই দুর্বল অনুকরণ, কখনো কখনো সংস্কৃত প্রবাদবাক্যের অনুবাদ, অনুপ্রাস বাহুল্য কবিতার গতিকে সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করেছে। ফলে নাটকীয় সংলাপের যে স্বাচ্ছন্দ তা দীনবন্ধুর কবিতা সংলাপের ভাষা অর্জন করতে পারেনি। আড়ষ্ট কবিত্বময় ভাষার ব্যবহারে নাটকের গতি ব্যাহত হওয়াই স্বাভাবিক। নাটকে সংলাপের ভাষা হিসেবে কবিতা দীর্ঘকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক ইউরোপে এলিয়টের নেতৃত্বে কাব্যনাট্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। কাজেই কবিতা ব্যবহার মাত্রেই সংলাপ আড়ষ্ট হয়না—কিন্তু সে কবিতা গীতি কবিতা, আখ্যান কবিতা নয়, তা নাটকীয় কবিতা। মধুসূদন নাটকে কবিতা সংলাপ ব্যবহারের কথা ভেবেছিলেন এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দেই নাটকীয় ভাষা সৃষ্টি হতে পারে এই মত পোষণ করতেন।১ দীনবন্ধু তাঁর নাটকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিল পয়ার ব্যবহার করলেও লীলাবতীতে অমিল পয়ারই গ্রহণ করেছেন। প্রবহমান পয়ার এত সামান্য এবং অমিল পয়ার এত বেশি যে পদ্য সংলাপগুলি নাটকীয় সংলাপের যোগ্য হতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ দীনবন্ধুর কবিতায় ভাষা প্রয়োগের একটি বড় ত্রুটি ছিল শব্দ ও ধ্বনি সম্পর্কে

১। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর গৌরদাস বসাককে একটি চিঠিতে লেখেন—

"....It was a rehearsal night, and the amateure were coming in one by one ; the conversation gradually turned upon the subject of drama in general and of Bengali drama in particular. Micheal said that no real improvement in the Bengali drama could be expected until blank verse was introduced into it."

মধুসূদন গ্রন্থাবলী (কাব্য) **তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ভূমিকা**, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

সামঞ্জস্যহীনতা। সংস্কৃত শব্দের পাশে অত্যন্ত লৌকিক শব্দ ব্যবহার, সাধু বাক্‌রীতির পাশে লৌকিক বাক্‌রীতির ব্যবহার তাঁর কবিতার serious high toneকে সম্পূর্ণ নষ্ট করেছে। যেমন—

যে চারুহাসিনী কিশোর বয়স কালে,
হারায়ে বিজলিছটা চঞ্চল চরণে
বেড়াইত কত সুখে সরোবর তীরে,
হাত ধরাধরি করি, বলিতে বলিতে,
মধুমাখা ছাইপাঁশ সুমধুর তানে।
আগ্‌ডোম বাগ্‌ডোম ঘোড়াডোম সাজে,
ওপারে রে জন্তি গাছ জন্তি বড় ফলে। ৩।৪

অবশ্য এই প্রসঙ্গে একথাও বলা প্রয়োজন যে, একই কৌশল দীনবন্ধুর হাস্য-রস সৃষ্টির পন্থা ছিল। কিন্তু গদ্যে যা তাঁর গুণ পদ্য সংলাপে তাই তাঁর ব্যর্থতার নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে যেখানে গদ্য এবং পদ্য উভয় রীতি ব্যবহৃত হয়, সেখানে উভয়ের প্রয়োজন স্বভাবতঃই ভিন্ন হওয়া দরকার। দীনবন্ধুর নাটকে সেরকম কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে বলে মনে করা কঠিন। বোধ হয় একথা বলা চলে যে, দীর্ঘ বর্ণনা, বা স্বগতোক্তি গদ্যে বৈচিত্র্যহীন শোনাতে পারে এই ভেবে দীনবন্ধু পদ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। এই নাটকের গদ্য অত্যন্ত স্বাভাবিক ও কথ্যরীতির এবং কবিতা প্রাচীন আখ্যান কাব্যরীতির। ফলে সংলাপের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন জগতের সৃষ্টি হয়েছে।

অন্য নাটকের মত এখানেও নারী-পুরুষের সংলাপে পার্থক্য রক্ষিত হয়েছে। পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিদের ভাষার সঙ্গে অসৎ চরিত্র, অশিক্ষিত চরিত্রগুলির ভাষার গুণগত তারতম্য আছে। শেষোক্ত শ্রেণীর ভাষার বাস্তবগুণ বাংলা সাহিত্যে বিস্ময়কর। নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদ যে ভাষায় কথা বলে তা অনেক সময় বাংলা Slang১ বা অশ্লীল ভাষা। এই ভাষার সঙ্গে নীলদর্পণের রায়ত চরিত্রের সংলাপের বিশেষ পার্থক্যকে মনে রাখতে হবে। রায়ত চরিত্রগুলির সংলাপে অনেক গ্রাম্য শব্দ আছে এবং ক্রোধ প্রকাশের সময় অশ্লীল শব্দ আছে কিন্তু নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদের ভাষা তাদের চরিত্রের উপযোগী এবং স্বাভাবিক। রায়তদের ভাষার অনেক শব্দকে অশ্লীল মনে হতে পারে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই সব শব্দ তাদের কাছে একমাত্র

১। "Slang, applied to speech, means words slung or thrown about."

Brown, Ivor, *ibid*, 59.

শব্দ। সামাজিক বা সাংস্কৃতিক tabooর দ্বারা বহু শব্দের যে সুভাষিত প্রয়োগ (Euphemistic use) আধুনিক ভদ্রসমাজে দেখা যায় সে ধরণের taboo রায়ত সমাজে না থাকাই স্বাভাবিক। অতএব তাদের ভাষাকে অশ্লীল আখ্যা দেওয়া অন্যায় এবং এই কারণে নীলদর্পণের ভাষা আদিম এবং বর্বর এবং তাদের ভদ্রতার সংস্কারমুক্ত অনাবৃত প্রকাশ। কিন্তু শিক্ষিত সমাজে প্রতিপালিত নদেরচাঁদ-হেমচাঁদ শিষ্ট সমাজের রীতি লঙ্ঘন করে যে ভাষায় কথা বলে তা অনেক সময়ই অশ্লীল।১ হেমচাঁদ-নদেরচাঁদের মুখে দীনবন্ধু আর একরকম ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা তাদের বক্তৃতার ভাষা।২ এখানে অবশ্য হাস্যরস সৃষ্টির জন্যেই বিভিন্ন রকম বৈপরীত্য সৃষ্টি করা হয়েছে। শব্দের সঙ্গে শব্দের, শব্দের সঙ্গে অর্থের, অর্থের সঙ্গে অর্থের বৈপরীত্য

১। নদের চাঁদ। বড় চালাকি কচ্চো—আমি দম্ভ করে বলতে পারি শ্রীরামপুরে আমার কাছে এক ব্যাটাও বামন নয়। আমাদের বাঁদা ঘর, আমরা আসল কুলীনের ছেলে।

শ্রীনাথ। ষ্টড্‌ব্রেড্‌।

নদের। আজো পেচ্ছাব কল্যে বামন বেরোয়। ১।১

শারদা। তুমি রাগ কর না, আমি ঘোমটা খুলে কথা কবো, কিন্তু কেবল তোমার সাক্ষাতে।

হেমচাঁদ। তা না ত কি তুমি তার সঙ্গে বাগানে যাবে। ১।২

২। নদের চাঁদ। প্রিয় বন্ধুগণ এবং প্রিয় বন্ধুগণ ও প্রেয়সী মেয়েমানুষ। অতএব এত বিদ্যাবিষয়ের হ্রদ পণ্ডিত পাটালির নিকটে—নিকটে—পাটালির নিকটে আমার বক্তৃতা করা কেবল হাঁসিভাজা হওয়া—হাস্য ভাজন। মৎসদৃশ ব্যক্তিগণের বক্তৃতা বিষম ব্যাপার, লণ্ডভণ্ড কাণ্ড উপস্থিত। বিষয় মনে থাকে যদি, কথা জোটে না, কথা জোটে যদি বিষয় মনে থাকে না। সুতরাং কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিয়া বক্তৃতা করিতে বাধ্য না হওয়া কাপুরুষের কাজ। আপনারা যথাসাধ্য অধৈর্য সম্বল করে শুনুন। বিবাহ হয় এক কল্পবট তার তলায় বসে যা চাও তাই পাওয়া যায়। বিবাহের অনুগ্রহে বংশরূপ শামাদানে ছেলেরূপ বাতি দিয়ে ঘর আলোক করে ফেলা যায়। আরো দেখুন যদি আমি হতে পারি স্বাধীনতাতে বল্‌তে এমন দানেন ন ক্ষয়ং যাতি স্ত্রীরত্নং মহাধনং—যেহেতু রামছাগলের গলদেশের স্তনের ন্যায় বিফল। ......আরো দেখুন সকলি দুই, চন্দ্র সূর্য, রাতদিন, পথঘাট, হুঁকো কলকে, ঢাক ঢোল, ঘর দোর, হাতা বেড়ী, শ্যাল শকুন, স্ত্রী পুরুষ। সুতরাং স্ত্রীর সকলকে বাঁচাইবার জন্য স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে আপনা আপনিই নিতম্বে দুদ এসে পড়ে। ২।২

এখানে আছে। এখানে নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদের ভাষা অশ্লীল নয়, হাস্যকর১ এবং এই ভাষাই প্রমাণ করে যে, তারা অশ্লীল ভাষায় স্বাভাবিকভাবে কথা বলে আর তার ফলেই আমরা জীবন্ত নদেরচাঁদ, হেমচাঁদকে নাটকে পাই।

'জামাই বারিক'-এ কবিতা সংলাপ অত্যন্ত কম। দীনবন্ধুর সৃষ্ট ঘটকেরা পদ্য আবৃত্তি করতে ভালোবাসে বিয়ে পাগলা বুড়োতে তা ইতিপূর্বে লক্ষিত হয়েছে। জামাই বারিকের 'ঘটকের' বরের বর্ণনাটি (১।১) সুকুমার রায়ের 'গঙ্গারামকে পাত্র পেলে' ছড়াটির পূর্বসূরী সন্দেহ নেই। কবিতাটি হাস্যরস সৃষ্টির জন্যেই ব্যবহৃত এবং তার সার্থকতাও কিছুটা আছে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে 'কামিনী'র স্বগতোক্তি (৩।২) দীনবন্ধুর পদ্য সংলাপ রচনার একটি ব্যর্থ নিদর্শন। এখানে এই ব্যর্থতার সৃষ্টি হয়েছে কবিতার ছন্দ পরিবর্তনে। প্রথম পাঁচ চরণ ছড়ার ছন্দে লিখিত এবং তার পরই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কামিনীর উপবেশন ও দীর্ঘ ত্রিপদীতে বিলাপ। কবিতায় হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা হাস্যকরতায় পরিণত। এই নাটকে সংলাপ রচনার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় আছে নারীর ভাষায়। দীনবন্ধু নারী সংলাপে ইতিপূর্বে সিদ্ধ কিন্তু জামাই বারিকের বিন্দু, বগলা, হাবা, কামিনী, ভবি ইত্যাদি এতগুলি চরিত্রের সংলাপ রচনায় দীনবন্ধু তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এখানে নারীর ভাষায় দুটি ভাগ। স্বাভাবিক কথাবার্তা এবং কলহ। স্বাভাবিক কথাবার্তায় দীনবন্ধু তাঁর পূর্ব ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কিন্তু হাস্যরস সৃষ্টি এবং বাস্তব গুণের দিক থেকে কলহের সংলাপে ক্ষমতার

১। Moliere এর নাটকগুলির অসৎ চরিত্রগুলির ভাষা সম্পর্কে যে কথাগুলি উক্ত হয়েছে তা দীনবন্ধুর নদের চাঁদ হেমচাঁদ সম্পর্কেও সত্য—Language is as comic when designedly misused as when it unintentionally betrays. The source of comedy lies in the fact of interference with the normal process of communication; in the one case the man's nature or passion interferes with his intention; in the other his intention deliberately obscures or twists or abandons normal speech in order to attain a particular end. The clearest example of this procedure is professional argon. Words are used for an effect other than conveyed by their meaning. They convey perhaps no actual sense, at all but an aura of authority. One can watch the gap widen between their meaninglessness and their effect. This makes nonsense into an effective form of language: what is without meaning can impress fools।

Moor, W. G. *Moliere A New Criticism,* 1949, 62.

চরম পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে একটু উদ্ধৃত করা যায়। "বগলা। ওরে আমার শ্যালকাঁটা ফুলের কলিরে। ওরে আমার ডাব নারকেলের ন্যাওয়া পাতি, ওরে আমার মড়ি পোড়ানীর কম্‌লে বাচুর, বাছার বুঝি দাঁত ওঠেনি, বাছা বুঝি মাড়ি দিয়ে কামড়াচ্ছে, ও আবাগি মরে যা, ও পোড়াকপালী বুড়ো ভাতারের কাছ থেকে সরে দাঁড়া, কেমন কেমন দেখায়, বাপ ঝি বলে ভুল হয়" (২।১) এই অংশে কণ্ঠস্বরের ক্রমশঃ গ্রাম থেকে উচ্চতর গ্রামে ওঠা যেন স্পষ্ট শোনা যায়। সেই সঙ্গে অত্যন্ত তীব্র গালাগালিগুলি সমস্ত পরিবেশকে জীবন্ত করে তোলে। ভাষার অসাধারণ মৌখিক গুণ, শব্দের কথ্যরূপ, বাক্যরীতির confused গঠন ও উদ্ভট ছড়া১ আবৃত্তি সমস্ত অংশটিকে অপ্রত্যাশিত নাটকীয়তা দান করেছে। যদিও লেখক বিন্দু ও বগলার উচ্চারণ-ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে নির্দেশ দেননি কিন্তু এই রকম পরিস্থিতিতে যেভাবে সুর করে ঝগড়া করা হয় তা বাক্যের গঠন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। যেমন, "বিন্দু। ওরে আমার কুশীলকুমারী গ্যাদায় মরি, তবু বেটীর বাপ ভিখারি—খুব করেছে বুড়ো বলেছে, আরো বলবে। আর দশবার বলবে, বুড়োরে বুড়ো বলবে না তো কি খুকী বলবে না কি? তিনকাল গেছে এককাল আছে। এখন এয়েচেন সতীনের ঝক্‌ড়া কত্তে। বৃন্দাবনে যাও, কালামুখি বৃন্দাবনে যাও, দোরে দোরে ভিক্ষা করে বেড়াও,

ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী রাধাকৃষ্ণ বলমন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচিকি বৃন্দাবন।

"বগলা। ও সর্বনাশি, বিন্দি রাঁড়ি হতোচ্ছাড়ি, শতেক খোয়ারি নয় দুয়ারি, মড়িপোড়ানীর মেয়ে, তোর বড় বৃদ্ধি হয়েছে, এত বৃদ্ধি ভাল নয়, তোর মরণ বাড় বেড়েছে, আর দেরী নাই। পড়্‌লি পড়্‌লি পড়্‌লি, ছোট মুখে বড় কথা জেয়াদা দিন থাকে না। আমি বুড়ো হলে তোর ভাতার বুড়ো হত না, না তোর ভাতার দিদি বিয়ে করেছিল"? এই রকম কলহের ভাষা ইতিপূর্বে

১। 'প্রায় প্রত্যেক ছড়ার টুকরায়, প্রত্যেক তুচ্ছ কথায়, বাঙ্গালী ঘরের বহু বিচিত্র বিস্মৃত সুখ দুঃখ ও হাস্য কৌতুকের কণা শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে বাংলা দেশের প্রাত্যহিক গৃহস্থালীর দ্বন্দ্ব কলহ, দ্বেষ, হিংসা, উত্তেজনা, অবসাদ, দৈন্য সঙ্কীর্ণতা, অক্ষমা অসহিষ্ণুতা, পানাপুকুরের ঘাট হইতে পিছনের আঁস্তাকুড় পর্যন্ত, কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই, এখানে মানুষ দেবতা নয়, ভাল ও মন্দ লইয়া রক্তমাংসে গড়া নিতান্ত ক্ষুদ্র দুর্বল মানুষ; তাই বাঙ্গালীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের এমন নিখুঁত ঘরোয়া চিত্র অন্যত্র পাওয়া জায় না।'

সুশীলকুমার দে, **বাংলা প্রবাদ**, ১৯৫২ (১৩৫৯) **ভূমিকা** পৃঃ ২৯। ছড়া ও চলতি কথা।

আমরা কেরির কথোপকথনে সংকলিত হতে দেখেছি এবং বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার দিক থেকে এই অংশকে এখনো কেউ অতিক্রম করে যেতে পেরেছেন বলে মনে হয়না। এই নাটকটি দীনবন্ধুর সর্বশেষ সামাজিক নাটক। এ পর্যন্ত তিনি যত নারী-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে শিক্ষিত নারী-চরিত্রের সংলাপ প্রায়শই আড়ষ্ট, অথচ স্বল্পশিক্ষিত বধূ, চাকরানী এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মহিলারা অসাধারণ জীবন্ত ভাষায় কথা বলে। শিক্ষিত মহিলার সংলাপে দীনবন্ধুর দ্বিধা দেখা গেছে। তারা কখনো কখনো স্বাভাবিক সুন্দর বাংলায় কথা বলে কিন্তু বহু সময়েই তাদের ভাষা আল্কারিক অর্থাৎ আড়ষ্ট। লীলাবতী নাটকেই আমরা সর্বপ্রথম এক শিক্ষিতা মহিলাকে পেয়েছি যিনি এই ধরণের আড়ষ্ট বা আলঙ্কারিক ভাষায় কথা বলেন নি। নীলদর্পণে সরলতা ও বিন্দুমাধবের মধ্যে কথোপকথনের যে আড়ষ্টতা দেখা গেছে বোধ হয় তা অনুভব করে লীলাবতী নাটকে নায়ক-নায়িকার মিলনের সময় নায়িকার মুখে গদ্য সংলাপ ব্যবহার না করে পদ্য সংলাপ ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। সম্ভবতঃ তিনি মনে করে ছিলেন যে, এই ধরণের কথাবার্তা গদ্যে জীবন্ত হয় না বরং কবিতায় তা মানানসই। যেমন,

'দাসী হয়ে পদতলে রব অবিরত,
যথা যাবে তথা যাব জানকীর মত'।

ইত্যাদি বাক্য কবিতায় গ্রহণ করা সহজ কেননা, এই ধরণের কবিতা-ভাবনার সঙ্গে শ্রোতা এবং দর্শক পরিচিত। কিন্তু গদ্যে এ ধরণের বাক্য এবং কথোপকথনের রীতি শ্রোতাকে অভিভূত করে না। জামাই বারিকে লীলাবতীর মত শিক্ষিতা মহিলার পরিচয় নেই বলেই সম্ভবতঃ অথবা রোম্যাণ্টিক দৃশ্যের অবতারণা নেই বলেই হয়তো দীনবন্ধুকে ভাষা প্রয়োগে চিন্তিত হতে হয়নি। সেখানে তাই সহজ সাধারণ প্রাত্যহিক গদ্যের প্রকাশ এত স্পষ্ট।

পুরুষ চরিত্রের ভাষায় দীনবন্ধু ক্যারিকেচারের ভাষা গ্রহণ করেছেন। তারা অর্থাৎ বিশেষ করে জামাইরা ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করে। যেমন,

"প্রথম জামাই। আমি ভাই আজ এক মাস বাড়ীর ভিতর যাইনি, প্রেয়সী আমাকে ডাইভোর্স কল্যেন না কি। ৩।১

প্রথম জামাই।...আমরা যেন ভাই কুক সাহেবের আড়গড়ার মেল গ্যাণ্ডার ফিমেল গুস্।

দ্বিতীয় জামাই। সাবাস দাদা বেশ বলেছ, কি বল্‌বো, গাঁজা টিপ্‌চি তা নইলে শেক্‌হ্যাণ্ড কত্তেম—নেভার মাইন, কৌন দাও। ৩।১

পঞ্চম জামাই-এর রামায়ণী কাহিনী বর্ণনার ভাষা নদেরচাঁদের বক্তৃতার ভাষার মতই বিচিত্র ধরণের বৈপরীত্যের সমন্বয়। —"পঞ্চম জামাই। এক

নিশ্বাসে সাত কাণ্ড রামায়ণ বলা সাধারণ বিদ্যার কর্ম নয় বাবা। তবে শোন, ঐ যে রোজ সকালবেলা অর্থাৎ যামিনী বিগতা হলে পূর্ব দিকে, পরমরূণয়া পশ্যাতি দৃশাং, ভারি লাল রক্তবর্ণ হিংগুলের মত, কাঁচা সোনার ন্যায় একখান চকমকে থাল উদয় হয়, ওটা সূর্য—তোমরা ভাবও ব্যাটা কেবল সকালে উদয় হয়ে সমস্ত দিন আপিসের কাজ চালিয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ী যায়, এমন নয়, ওর একটা বংশ আছে, তার নাম সূর্যবংশ। বংশটা ভারি বংশ, এখন নির্বংশ। এই সূর্যবংশে, দশরথ নামে এক রাজা ছিল, মহাবলা পরাক্রম ভূধর মহীধর ধরাধর সাগর নাগর ডাগর রাজা; অন্দর মহলে রানীর পাল। পালঝাড়া রানী অর্থাৎ সকলেই বন্ধ্যা, একটিরও গর্ভ হয় না। বাড়ীতে ছেলের ভাঁজ নাই।...

..."রাজা কিংকর্তব্যঅনূঢ়া হয়ে খুব গ্যাটাগোঁটা অকালকুষ্মাণ্ড গোচ একজন ঋষিকে আনালেন, তার নাম রসশৃংগ...।" এই সংগে অনুপ্রাস ব্যবহার করে শব্দের এবং বাক্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সাধু এবং চলিত, সংস্কৃত এবং লৌকিক, ইংরেজী এবং বাংলা ইত্যাদি শব্দের বৈপরীত্য, শব্দবিকৃতি (কৌন, রসশৃংগ) ভুল অর্থে শব্দের ব্যবহার (পদ্ম পলাশলোচনবৎ ফুলে উঠলো) ইত্যাদির দ্বারা এই কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া এই নাটকের গদ্য সংলাপে তিনি পূর্ববর্তী নাটক থেকে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। এই আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে ভাষার cockney প্রয়োগ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বিশেষ অধিকার ছিল। পরবর্তীকালের গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল এদিক থেকে তাঁর উত্তর সাধক।

কমলেকামিনী নাটকের রাজা ও রাজন্যবর্গের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ, সমাস, দীর্ঘ সমাস, অনুসর্গ এবং বিভক্তির ব্যবহার কম। বাক্যগুলি দীর্ঘ এবং মূল বক্তব্যকে অন্তরালে রেখে Period রচনার চেষ্টা আছে। যেমন, "রাজা। মহারাজ গোবিন্দ সিংহের বংশ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রমাবৎ ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হলে কাছাড়ের সিংহাসন আমাকেই অর্শে, কিন্তু বিরোধ উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আশঙ্কায়, আমার নিজ বংশের, কাহাকেও কাছাড় রাজ্যের রাজা হতে দিলাম না, রাজা মনোনীত করবের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রজাদিগের প্রতি অর্পণ করলেম।" ১।১ জটিলবাক্য ব্যবহার করে climax অলঙ্কার তৈরী করেছেন কোথাও কোথাও। যেমন, "শশাঙ্ক। ভীম পরাক্রম ভীমের ন্যায় বিক্রম, ধনঞ্জয়ের ন্যায় রণপাণ্ডিত্য, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্য পরায়নতা, নারায়ণের ন্যায় বুদ্ধি" ১।১ সমস্ত বিশেষ্য পদ ব্যবহার করে বাক্য গঠন করেছেন। যেমন, "রাজা। সহস্র সহস্র সৈনিকের তরবারি ঝঙ্কার, অশ্ববৃন্দের নাসিকাধ্বনি, রণোমত্ত কুঞ্জর নিকরের বৃহিংত শব্দ, প্রজ্জ্বলিত পটমণ্ডপ, উৎসাহিত সৈনিকের মারমার, ত্রাসিত সৈনিকের হাহাকার পিপাসান্বিত সৈনিকের দে জল, বিনাশিত সৈনিকের দেহরাশি, শোনিত স্রোত,

কুক্কুর শৃগালের কোলাহল, ধূলাধূমে গগনাচ্ছাদিত তিনি যদি একবার আলোচনা করে দেখতেন।" বিশেষণ ব্যবহারের আধিক্য, অনুপ্রাস ও রূপক অলঙ্কার প্রয়োগের প্রাচুর্য এদের ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কারও কারুর কারুর ভাষায় আছে। দীনবন্ধু এই নাটকে গদ্য ও পদ্য উভয় ভাষারীতি গ্রহণ করেছেন এবং তা সংস্কৃত নাটকের বাক্‌রীতিকে স্মরণ করায়। পুরুষ চরিত্রগুলির সকলের ভাষা অবশ্য এই রকম আলঙ্কারিক নয়। বিশেষতঃ 'বক্কেশ্বর' চরিত্রের ভাষা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তার ভাষায় দীনবন্ধু আমাদের পরিচিত নদের চাঁদ এবং পঞ্চম জামাইয়ের ভাষা-রীতির কিছুটা অনুসরণ করেছেন। যেমন, বক্কেশ্বর ঃ

" তখন আমার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া গগন মার্গে উড্ডীয়মান হইতে লাগল এবং ইচ্ছা হইল এই দণ্ডে একটা ভাইওয়ালা যুবতীর পানি গ্রহণ করে শালা বাবাজির মস্তকটা হস্তদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলি।" ১।২ এখানেও অর্থহীন অনুপ্রাস ব্যবহৃত হয়েছে "নির্দয় নিষ্ঠুর নীচ, ভ্যাড়াকান্ত, ভ্রান্ত কান্ত বন্যা বরাহবৎ বন বিচরণে ক্ষান্ত হলেন না।" বক্কেশ্বরের সঙ্গে মকরকেতনের কথোপকথনের ভাষায় দীনবন্ধু Nonsense শব্দ প্রয়োগ করে হাস্যরসের সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন।

ভাষার এই হাসির উপাদান নাটকের স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্যেও আছে। বিশেষ করে 'বউ' চরিত্রটির 'ন' স্থানে 'ল' উচ্চারণের ফলে হাসির সৃষ্টি হয়েছে।১ প্রভাত মুখোপাধ্যায় অনুরূপ উপকরনের সাহায্যে তাঁর পোষ্ট মাষ্টার 'গল্পে 'শ' স্থানে 'ছ' বসিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। আধুনিককালের বহু লেখকই শুধুমাত্র স' ব্যবহারের 'সাহায্যে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাটকে পদ্য সংলাপ, ছড়া, হাস্যরসাত্মক কবিতা প্রবাদ-প্রবচন ও কোথাও কোথাও হেঁয়ালী বা ধাঁধা ব্যবহার করেছেন। এদের মধ্যে পদ্য সংলাপ ও কবিতাগুলির বিশিষ্টতা নেই। তাঁর নাটকে পদ্যের ব্যবহার

১। বউ। সাজায়ে লৌকা দুলি
বাখরগঞ্জে চাল ভরলি—
করব মহাজলি
আলব গজ মুক্তা কিলি দিব লাকে কর্‌বে ঝলমল
প্লাল আর দুটো মাস থাক। ৪।২

অথবা, বউ। বস্‌লত প্রশাল্‌ত প্লাল কাল্‌ত
একাল্‌ত প্লালাল্‌ত লিতাল্‌ত মরি
বিরহ সলিল বসলতে বাড়িল
ডুবিল ডুবিল যৌবল তরি। ৪।২

যথেষ্ট এবং এগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও নাটকীয় সংলাপের ধর্মও প্রকাশিত। অবশ্য কথোপকথনধর্মী পদ্য হলেই তা নাটকীয় সংলাপ হয় না। কেননা নাটকীয় সংলাপ চরিত্র প্রকাশের একটি বড় উপায়। স্বভাবতঃই কথোপকথনের মাধ্যমে নাটকের স্বভাবটিকে ধরার লক্ষ্য যতটা তার চেয়ে বেশি চরিত্রের ধর্মকে তুলে ধরায়। লক্ষ্য করতে হয় লৌকিক সমাজে ও তার সাহিত্যরূপে মানুষ তার আবেগকে পদ্যে প্রকাশ করতে চায়। ঘটনার গুরুত্ব ও গভীরতার ফলে ব্যক্তির চিন্তায় আন্দোলন ও প্রতিক্রিয়া জাগে। এই প্রতিক্রিয়া ও মানসিক আন্দোলনের গভীরতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিন্তার চেয়ে কল্পনাকে আশ্রয় করে। কবিতায় সেই জন্যে আবেগের প্রাধান্য। কমিক অথবা ট্রাজিক ঘটনা গুরুত্ব ও গভীরতা অনুযায়ী যে ভাষা ও রীতিকে গ্রহণ করে তা পদ্যের ভাষা হতে পারে অর্থাৎ আবেগের স্বরূপ অনুযায়ী ভাষা emotional হতে পারে। দীনবন্ধু তাঁর নাটকগুলিতে যেখানেই পদ্য সংলাপ ব্যবহার করেছেন তার সর্বত্রই যে আবেগ কাজ করেছে এমন নয়। কোথাও বিলাপ বা দুঃখের কারুণ্য, কোথাও স্বগতোক্তির ছলে সামাজিক আচার আচরনের অস্বীকৃতি, কোথাও ধর্মাধর্মের বোধ কোথাও বা হাস্যকর উপকরণের সমাহার। নীলদর্পণ নাটকে কবিতা বা পদ্যের ব্যবহার একটি উদ্দেশ্য নিয়োজিত। তা বিলাপের ভাষা। এই নাটকের পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে আহত ও সংজ্ঞাহীন নবীন মাধবকে কেন্দ্র করে সৈরিন্ধ্রীর বিলাপকে এই অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে।

আহা, আহা মরি মরি একি সর্বনাশ!
সীতা ছেড়ে রাম বুঝি যায় বনবাস॥
কি করিব কোথা যাব কিসে বাঁচে প্রাণ
বিপদ বান্ধব কর বিপদে বিধান॥

এই বিলাপ নবীনমাধব, সরলতা ও সাবিত্রীর মৃত্যুতে আরো করুণ হয়ে ওঠে। পঞ্চম অংকের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে বিন্দুমাধবের পদ্য সংলাপ ব্যবহারে সেই আবেগ ও কারুণ্যকে রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে। এই অংশটি নাটকের পরিনতিতে ইংরেজী নাটকের epilogue কে স্মরণ করায়। নীলদর্পণ নাটকে পদ্য বা কবিতার ব্যবহার অত্যন্ত স্বল্প। কিন্তু অন্য নাটকগুলি একথার ব্যতিক্রম। নবীন তপস্বিনী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী ও লীলাবতীর মধ্যে লীলাবতীতেই পদ্যের ব্যবহার সর্বাধিক। অধিকাংশ নাটকগুলিতে পদ্য ব্যবহারের একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নাটকগুলি চরিত্র, ঘটনা ও সামাজিক সমস্যার দিক থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একটি সামাজিক স্বভাব-ভিত্তিক। লক্ষ্য করা যায় সামাজিক আচার আচরণের যে প্রকাশ ছড়া প্রবাদ প্রবচনে

প্রকাশিত, তাই যেন এই নাটকগুলির পদ্যে বা সংলাপধর্মী পদ্যের পরিচ্ছদে নতুন রূপ নিয়েছে। পতি ও সতীর আদর্শ, ধর্মাধর্মের বোধ, স্বামীর ব্যবহার, ইত্যাদি লৌকিক অভিজ্ঞতা, সংলাপের আবরণে নবীনতপস্বিনী নাটকে দেখা গেছে। এই নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কামিনীর পাঠশালায় বিজয়ের আবির্ভাবের পর তার জিজ্ঞাসায় ১মা, ২য়া, ৩য়া, ৪র্থা ও ৫মা বালিকা কবিতায় তাদের যে শিক্ষাকে তুলে ধরেছে তা সংলাপধর্মী পদ্যের আবরনে ছড়া, প্রবাদ-প্রবচনেরই প্রকাশ। উদ্ধৃতি দিলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমাঃ কামিনীর কথা শোনে তারে বলি পতি
পতি পায় থাকে মন, তারে বলি সতী
দ্বিতীয়াঃ ধর্ম করি পরিণামে পাবে নারায়ণ
নিরয়ে বসতি হবে পাপে দিলে মন।
তৃতীয়া ঃ চিনে দিও মন ,চিনে দিও মন, পুরুষে চিনে দিও মন
আগেতে আমার, আমার, শেষে অযতন।
চতুর্থা ঃ নবীন যৌবনে গভীর যাতনা সই
গাছে তুলে দিয়ে বঁধু কেড়ে নিলে মই। ৩।২

এই নাটকের শ্যামা চরিত্রের পদ্য ব্যবহারেও অনুরূপ সত্য প্রকাশিত। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে শ্যামার দুঃখের গভীরতা বোঝাতে গিয়ে কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার ভাবনা অনেকখানি প্রবাদধর্মী। সামাজিক আচার-আচরন ও অভিজ্ঞতা, সতীত্ব, পাত্র-পাত্রীর বর্ণনা, বিবাহ বাসরের উৎপীড়ন, বিবাহ বাসরে স্বামী-স্ত্রীর কথা-বার্তা ইত্যাদি প্রকাশের জন্য কবিতা ও পদ্য সংলাপকে গ্রহণ করা হয়েছে। বিয়ে পাগলা বুড়োর রাজীব, ভূষণ ও রতা প্রকৃত পক্ষে পদ্যে সংলাপের স্বভাবটিকে রক্ষা করেছে। বিশেষ করে বিবাহ বাসরে বরবেশে রাজীবলোচন ও বধূবেশে রতা নাপিতের পদ্য ব্যবহার একথার প্রমাণ। সধবার একাদশীর নিমচাঁদও পদ্য ব্যবহার করেছে। সমকালেব সমালোচনা সেই পদ্যগুলির লক্ষ্য। কোথাও কোথাও বিভিন্ন কবিতার উদ্ধৃতি ও তার সংগত প্রয়োগ নিমেদত্তের সংলাপকে মর্যাদা দিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে দীনবন্ধুর নাটকে একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন চরিত্র কবিতায় কথা খুবই কম সময়ে বলেছে। ললিত লীলাবতী অবশ্য একথার ব্যতিক্রম। বস্তুত পদ্য সংলাপ-গুলি প্রায়শই এক ব্যক্তির হওয়ার ফলে কথোপকথনের সূত্রটি তেমন গুরুত্বের অধিকারী হতে পারে নি। বিয়ে পাগলা বুড়োর রতা নাপিতের অধিকাংশ পদ্য ব্যবহারে তাই একই সঙ্গে সংলাপ ও লঘু পদ্যের সুর ও ভাষা আছে। সধবার একাদশীতে কাঞ্চনের প্রতি নিমচাঁদের করজোড়ে 'স্তুতির' ভাষা এর এক দৃষ্টান্ত। রতার পদ্য ব্যবহারে dramatic monologue এর লক্ষণ আছে।

কমলে কামিনীতে যেমন পদ্যের ব্যবহার সামান্য তেমনি লীলাবতীতে তার সর্বাধিক প্রাচুর্য। এই নাটকের তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে ললিত লীলাবতী সর্বাধিক পদ্য ব্যবহার করেছে। কথোপকথন ধর্ম বা বাস্তবের যে প্রতিফলন নাটকীয় সংলাপের বৈশিষ্ট্য তা এখানে নেই। নবীন তপস্বিনীতেও অনুরূপ সংলাপ, বিজয়, রাজা ও তপস্বিনীর মুখে ব্যবহৃত হয়েছে যদিও সেগুলি ললিত লীলাবতীর মত দীর্ঘ নয়। এই সংলাপধর্মী পদ্য বা কবিতাগুলি সম্পর্কে একটি বিশেষ কথা হল যে, নাটকে গ্রথিত কবিতাগুলির মধ্যে দুটি কবিতা দীনবন্ধু তাঁর দ্বাদশ কবিতা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর কবিতা ও নাটকের যোগসূত্র হিসেবে এগুলির তথ্যগত মূল্য আছে। পদ্য সংলাপ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই তাঁর নাটকে ব্যবহার করেছে এবং এগুলি নিতান্তই আবেগ প্রধান, ঘটনা প্রধান নয়। নাটকীয় উক্তির যে আকস্মিকতা, অপ্রত্যাশিত ভাব ও সংক্ষিপ্ত কবিতা সংলাপকে শোভন ও যথাযথ করতে পারতো তা দীনবন্ধুর নাটকে অনুপস্থিত। কিন্তু তার ব্যবহৃত ছড়া, প্রবাদ প্রবচন হেঁয়ালী১ হাস্যরসাত্মক কবিতা, বিভিন্ন কাব্যের সংগত উদ্ধৃতিগুলি একথার ব্যতিক্রম। নাটকীয় জীবনের সংগে এদের গভীর যোগ আছে বলেই দীনবন্ধু এত সহজে এদের গ্রহণ করতে পেরেছেন। বিশেষ করে ছড়া ও প্রবাদ বচনের সংগে তার নাটকের সম্পর্ক গভীর এবং তার নাটকের ভাষার আলোচনায় এদের স্থান স্বল্প নয়।

ছড়া এবং প্রবাদ প্রবচনের জন্ম সুপ্রাচীন লোক সমাজে। এই প্রাচীন লোক সমাজ ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার-আচরণের দিক থেকে নিজস্বতার অধিকারী। বস্তুতঃ বাংলা ছড়া, প্রবাদ প্রবচনের প্রসংগে বাংলা দেশের ব্রাহ্মণ্য শাসিত আচার নিষ্ঠার যোগসূত্র যতখানি প্রতিফলিত তার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিফলিত

১। "The riddle, like the myth, has an ancient form and tradition and yet unlike the myth the riddle is still in vogue. Every day new riddles are being formed and the ancient tradition goes on ceaselessly. The riddle, unlike the myth, is not only restricted to religious and cultural fields alike; it is an important literary form as well. The literary riddle has no bearing whatsoever on the religious tradition. It aims chiefly at knowledge and entertainment; it is especially for the grown up and the educated ones, while the traditional riddle seems to entertain children and to some extent women."

Bhagwat, Durga, *An Outline of Indian folklore,* 1958, P. 42

দেশজ আচার, ধর্ম, সংস্কৃতি ও নিষ্ঠার। তাই এগুলির আলোচনার সূত্রে যে সংস্কার কাজ করে তা অপরিচিত হলেও মৌল ধর্মের দিক থেকে তাকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। লক্ষ্য করতে হয় সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে এই ছড়া, প্রবাদ, প্রবচনগুলি যুক্ত। আরো লক্ষ্য করতে হয় সমাজ ও ধর্মকে কাব্যের ছন্দে গ্রথিত করে কখনো রাজনৈতিক বেদনা, কখনো মানুষের ভাগ্যচক্রে জ্যোতিষের প্রভাব, কখনোবা অভিজ্ঞতার একটি রূপ এই ছড়া, প্রবচনে প্রাণ পেয়েছে। লোক সমাজের কোন্ সুপ্রাচীন স্তরে এগুলির উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু ছড়াগুলির ভাবনায়, বিচিত্র উপমায় এমন কি পরিবর্তিত রূপে ও ভাষাতেও প্রাচীন লোক সমাজকে চেনা যায়। ডাক ও খনার বচন,১ শুভঙ্করের মানসাঙ্ক আমাদের সামাজিক চৈতন্য থেকেই উদ্ভুত। এদের জীবনের তথ্য পরিচয় হয়তো পাওয়া সম্ভব এবং কাল নিরূপণের প্রয়াসও সার্থক হতে পারে কিন্তু বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিপুল সংখ্যক ছড়া প্রবাদ প্রচলিত আছে তাদের পরিচয় উদ্ধার করলে এক বিশেষ সমাজ ও সংস্কৃতিকে জানা সম্ভব হবে।

নিতান্ত আধুনিক কালেও প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া যাঁরা বলেন তাঁদের অধিকাংশই গ্রামীন সংস্কৃতির মানুষ এবং ছড়া, প্রবাদ ব্যবহারে সংখ্যার দিক থেকে পুরুষের চেয়ে নারীই বেশি। ঘুম পাড়ানি গান, ছেলে ভুলানো গান এই লোক সংস্কৃতির আর একটি বিস্তৃত দিগন্ত। লোক সমাজের সংস্কৃতিতে, অভিজ্ঞতার গভীরে সামাজিক চৈতন্য যে সাহিত্যিক চৈতন্যকে বিস্তৃত করেছিল সন্দেহ নেই। ধর্ম, সমাজ সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে সেই চৈতন্য অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছে কয়েকটি চরণে, বাক্যে—যা ছড়া প্রবাদ-প্রবচন ও আপ্ত বাক্যের মর্যাদা পেয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন সিদ্ধ করেও যে লোকসমাজের আকাঙ্ক্ষায় একটি শিল্প চেতনা ছিল তা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। ব্যক্তির অভিজ্ঞতা কেমন করে সমাজের অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে, ছড়ায় সেই পবিচয় আছে। ব্যক্তির পরিচয়কে সম্পূর্ণ আবৃত করেও সামাজিক চৈতন্যকে ছড়া প্রকাশ করতে পারে এখানেই তার সার্থকতা।

১। ডাকের বা খনার বচন বলিয়া সেসব বাক্য বা ছড়া প্রচলিত আছে, তাহা প্রবাদের অনুরূপ, কিন্তু সবগুলি প্রবাদ বলিয়া গণ্য হয় নাই। ইহাদের অধিকাংশেরই বিষয়বস্তু হইতেছে চাষবাস, জল-হাওয়া, শুভক্ষণ বা তিথি গণনা, যাত্রার শুভাশুভ লক্ষণ প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রসঙ্গ। যথেষ্ট মূল্য থাকিলেও এগুলির সম্পূর্ণ বা প্রামাণিক সংগ্রহ প্রকাশ হয় নাই।

সুশীলকুমার দে, **বাংলা প্রবাদ ১৯৫২ (১৩৫৯), নিবেদন** ॥৶০

বাংলা ছড়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে ভাবনার বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাকে কতগুলি ভাগে বিভক্ত করা চলে। এক ধরনের ছড়ায় নিতান্ত এলো-মেলো আপাত অসংগত সমাজ জীবনের ছবি এবং জটিলতাহীন বা সরল। দ্বিতীয়ধরণে সামাজিক জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে এবং সেই প্রতিফলনে সামাজিক অসঙ্গতি, নির্যাতন ইত্যাদির প্রকাশ। তৃতীয় ধরণে সামাজিক অভিজ্ঞতার রূপ তির্যক চাতুর্য ও কোথাও ব্যঙ্গের শানিত ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রকাশ। এই ছড়াগুলির মধ্যে ঘুমপাড়ানী গান, ছেলেভুলানো ছড়াগুলিও যুক্ত। প্রাচীন সমাজের জীবনচর্যার সঙ্গে সঙ্গে এই ছড়াগুলি মুখে মুখে কীর্তিত হয়ে একের অভিজ্ঞতা এখন বহুর অভিজ্ঞতায় যুক্ত হয়ে বিস্তৃত হয়েছে। নাগরিক জীবনের বহুল জটিলতা ও ঘাত প্রতিঘাতের পাশে অলক্ষ্যে প্রায় অগোচরে লোক সমাজের সাহিত্যিক চৈতন্য বিবর্তিত হয়েছে। ছড়া প্রবাদ প্রবচন তারই বিশিষ্ট প্রকাশ।১

কিন্তু এই ধরণের ছড়া ছাড়াও আর এক ধরণের ছড়া বাংলা দেশে প্রচলিত দেখা যায়। বহুকাল ধরে বহুমানুষের কণ্ঠে তারা উচ্চারিত হয়নি অথবা প্রচলিত ছড়াগুলির প্রাণশক্তির যে গভীরতা আছে তা এগুলির মধ্যে নেই। তবু এই কৃত্রিম সাহিত্যিক ছড়াগুলি মৌল আবেদনের দিক থেকে একই শক্তির অধিকারী। এমন কি ছড়া না লিখেও কিছু কিছু কবিতার অংশবিশেষ প্রবাদ প্রবচনের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। "দেখিল প্যাকিল বেল গাছের উপরে, আরতিল কাক তাঁক ভঁখিতে না পারে" বড়ুচণ্ডী দাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যের রাধিকার উক্তি। চণ্ডীদাসের সময়ে এ প্রবাদ নিশ্চিত প্রচলিত ছিল এসম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা যেত যদিনা বাংলায় "বেল পাকলে কাকের কি" এ প্রবাদটি প্রচলিত থাক্‌তো। কোথাও কোথাও এই প্রবাদ প্রবচন বিশেষ চরিত্রকে কেন্দ্র করে তৈরী হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডলের ভাড়ু দত্ত ও মুরারী শীল, মনসা মঙ্গল কাব্যের স্বয়ং মনসা ও অন্নদা মঙ্গলের হীরা মালিনী একথার উদাহরণ হতে পারে। বস্তুতঃ ঠক চাচার বঞ্চনা, চৌর্যবৃত্তি ও খলতার

১। "...বাস্তবপরায়ণতার জন্য বাংলা প্রবাদের পরিহাস ও ব্যংগ নিরতিশয় কটু ও তিক্ত, এবং ভাষাও সেইরূপ স্পষ্ট ও তীক্ষ্ম। মানুষের ভালদিকের প্রতি যে দৃষ্টি নাই তাহা নয়, কিন্তু অধিকাংশ বাংলা প্রবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা ঘোরতর cynical। মনুষ্য-বিদ্বেষ নয়, মনুষ্য-বিদ্রূপ হইতেছে ইহার মূল কথা। অতি-জাগ্রত বাস্তব চেতনা হইতে, প্রতিদিনের সংকীর্ণ জীবনের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতার সংস্পর্শ হইতে যে তীক্ষ্ম সাংসারিক জ্ঞান, তাহাই ইহার তীব্র রসিকতার উৎসারিত হইয়াছে।"

সুশীলকুমার দে, **বাংলা প্রবাদ** ১৯৫৯ (১৩৫৯) **ভূমিকা** পৃঃ ২৯-৩০।

পূর্বসূরীত্ব ভাড়ু দত্ত ও মুরারী শীলের যেমন, তেমনি অধিকার অর্জন করেছে হীরা মালিনী শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের 'বড়াই' চরিত্র থেকে। চারিত্রিক খলতা ও নীচতার সঙ্গে কুট্টিনী বৃত্তির সমস্ত পরিচয় হীরা মালিনী—"কথায় হীরার ধার হীরা নাম তার" অথবা 'এবে বুড়া তবু গুড়া আছে কিছু শেষে' এগুলি ছড়া প্রবাদ-প্রবচনের আন্তর সত্যকেই তুলে ধরে। চৈতন্য জীবনী প্রসঙ্গে 'আগে কহ আর'ও একই অর্থে আপ্ত বাক্যের মর্যাদা পেয়েছে। ভিন্ন অর্থে হলেও একই শক্তির অধিকারী ভারতচন্দ্রের 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ ক্ষনে হাতে দড়ি ক্ষনেকে চাঁদ', অথবা রামপ্রসাদের "কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।" এই ধরনের কাব্যাংশ অনেক ক্ষেত্রেই প্রবাদ প্রবচন ও ছড়ার মর্যাদা পেয়ে লোকমুখে বহুল প্রচলিত হয়েছে। এদেরই পাশাপাশি এক ধবনের ছড়াব সৃষ্টি হয়েছে যেগুলি সম্পর্কে লেখকেরা সচেতন। অর্থাৎ ছড়া, প্রবাদ প্রবচনের অসঙ্গতি এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে, সচেতন ব্যক্তির চিন্তা কাজকরেছে। কবিওয়ালাদের পদে এর উদাহরণ আছে।১ আসরের স্থূল উত্তেজনার উপকরণ জোগাতে গিয়ে কবিওয়ালারা অনেক সময়েই এমন কিছু পদের সৃষ্টি করেছেন যেগুলি ছড়ার ধর্মকে স্মরণ করায়। এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলীতেও এর উদাহরণ পাওয়া যায়২। আধুনিক কালের কথা-সাহিত্য ও নাট্য-সাহিত্যে চরিত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে গিয়ে শক্তিশালী শিল্পীরাও আশ্রয় নিয়েছেন প্রবাদ-প্রবচন ও ছড়ার। চরিত্রের বাস্তবতা প্রকাশে এগুলির মূল্য যথেষ্ট। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে এই ছড়া প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার বিস্ময়কর।

দীনবন্ধু নাটকে ছড়ার ব্যবহার প্রচুর।৩ এই ছড়াগুলিকে বিষয় বস্তুর দিক থেকে কতগুলি ভাগে বিভক্ত করা যায়। সমকালের প্রকাশ ঘটেছে এখানে। বস্তুত সব ছড়াই উপযুক্ত স্থানকালে পরিবেশিত হলে তাকে বিস্তৃত অর্থে সমকালের মর্যাদা দেওয়া যায়। কিন্তু সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছড়াগুলির পাশে সমকালের ঘটনা নির্ভর অভিজ্ঞতাও ছড়ার রূপে প্রকাশিত হতে পারে। প্রাচীন ছড়াগুলির জীর্ণ দেহেও কখনো নতুন পোযাক পরিয়ে লোক সমাজ নিজেদের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করে। দীনবন্ধুর ক্ষেত্রে তার

১। যথা, 'যেমন মেগের কাছে পেগের বড়াই ঘরে করে ড্যাক' (রামবসু)
পীরিতি নাহি গোপনে থাকে......
প্রতিপদের চাঁদো হরিষে বিষাদো (হরুঠাকুর)

২। যথা, এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশে তবু রঙ্গে ভরা (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

৩। সুশীলকুমার দে তাঁর **বাংলা প্রবাদ ছড়া ও চলতি কথা** গ্রন্থে দীনবন্ধুর রচনাবলী থেকে ৩২০টি ছড়া প্রবাদ ইত্যাদি সঙ্কলন করেছেন।

ব্যতিক্রম নেইএমন নয় অথচ, বহু বিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, নীলকরদের অত্যাচার ও বিবিধ সামাজিক অসঙ্গতি দীনবন্ধুর কালে বিদ্যমান ছিল। দীনবন্ধুর দৃষ্টিতে সেগুলি যেমন এড়ায়নি তেমনি সমকালের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার লঘু ছড়াগুলিও তিনি শুনেছিলেন। নীলকরদের ভয়াবহ অত্যাচার কৃষক জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করেছে সমকালেব সমাজে দেখা দিয়েছে নীল চাযের দুঃখ। তরই প্রকাশ—

বাড়া ভাতে ছাই তার বাড়া ভাতে ছাই
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই। ১।৩ নী

অর্থনৈতিক সমস্ত দুঃখ বেদনার মধ্যেও দেখা দিয়েছে ব্যঙ্গ, এ টুকি করার মনোবৃত্তির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে ভীতি।

ব্যাবাল চোকো হাঁদা হেমদো
নীলকুটির নীল মেমদো। ২।৩ নী

নীলকুঠি ও কুঠিয়ালদের দুষ্কর্মের সহকারিনী পদী ময়রানীও এই ব্যঙ্গের হাত থেকে রক্ষা পায নি। তার আঘাত বালকদের কাছ থেকে এসেছে বলেই সম্ভবতঃ দুঃসহ।

ময়রানী লো সই নীল গেঁজেছো কই

নীলকরদের অত্যাচার যাদের কেন্দ্র করে মূলত প্রকাশ পেয়েছিল তাবা কৃষক সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় ছাড়াও বাংলা দেশের উচ্চবর্ণ সম্প্রদায়ের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেব বিভিন্ন আচার ব্যবহারকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল ছড়া। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের জোরে ধর্মরক্ষার অছিলায বহু বিবাহ কি কৌলীন্যেব ব্যাভিচার সেই সময দেখা গেছে। "বিবাহ তৃতীয পক্ষে সে কেবল পিত্তি রক্ষে" এই ছড়ায় তারই নিদর্শন। লক্ষ্য করতে হয় একটু জ্বালা মিশ্রিত তির্যক্ ব্যঙ্গও যেন এখানে সন্নিবেশিত। আবার,

'দোজবরে ভাতারের মাগ
চতুর্দশীর চৌদ্দ শাগ, ১।২ জাঃ বাঃ

এই ছড়ায় বেদনার প্রকাশ। এই ব্যঙ্গ বেদনা ঘরজামাই রাখার বড়মানুষী ভাবকে কেন্দ্র করেও দেখা দিয়েছে—

ঘর জামায়ে ভাতার যার
কানের সোনা নিন্দে তার ১।২ জাঃ বাঃ

বা ঘর জামায়ে পোড়ার মুখ
মরা বাঁচা সমান সুখ। ১।২ জাঃ বাঃ

আবার অন্যত্র সপত্নীত্বের একই যন্ত্রণা—

সতীনের ঘা সওয়া যায়
সতীন কাটা চিবিয়ে খায়

নিতান্ত বৃদ্ধবয়সের অসংগত বিবাহের প্রয়াসকে লক্ষ্য করেও প্রতিফলিত হয় বিদ্রূপ—

বুড়ো বামনা বোকা বর
পেচোর মাকে বিয়ে কর। ১।১ বি, পা, বু

দ্বিতীয় ধরণের ছড়াগুলিতে প্রবাদ প্রবচনের ধর্ম কাজ করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ছড়াগুলি জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা শোনায়। ভাবনার দিক থেকে এই ছড়াগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। এক শ্রেণীতে আপ্ত বা সিদ্ধবাক্যের প্রয়োগ।

এই ছড়াগুলি যেন তাদের সমস্ত লঘুতা সত্ত্বেও মানব-জীবনের এক একটি অভিজ্ঞতাকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। উপযুক্ত সময় বা প্রয়োগের অভাবে অনেক অভিজ্ঞতা মানুষের হয়ে থাকে।

সময় গুণে আপ্ত পর
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর। ৩।১ নী

বহুল প্রচলিত "মরদ কি বাত হাতি কি দাঁত", একটি অনুরূপ প্রবাদ বাক্য। পৌরুষ ও সত্যনিষ্ঠার অভিজ্ঞতা লঘুভংগীতে ব্যক্ত হলেও এতে যে আন্তরিক আদর্শ আছে তাকে আমরা অস্বীকার করি না। কিংবা—

আনাড়ির ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে
ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে। ৩।৩ স. এ

সময়ের উপযুক্ত প্রয়োগের অভাবে অসংগতি আছে কিন্তু লব্ধ অভিজ্ঞতাটিও কম নয়। এই অভিজ্ঞতা কখনো ধর্ম, কখনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে দেখা গেছে। এই দিতাগেরই দ্বিতীয় দিক পারিবারিক ও বৃহৎ অর্থে সামাজিক জীবনের আপ্তবাক্য রচনায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক, সমস্যা ও লৌকিক আচার-আচরণে অভিজ্ঞতার লঘু প্রকাশটি ঘটেছে।

সোনা দানা দুধের বাটি
দুও মেগের ওঁচলা মাটী ১।১ ন, ত

রূপকথার দুও রানী এখানে সপত্নীত্বের জ্বালায় জর্জরিত। এরই তীব্র রূপ

ছোট মাগ পাটরানী
বড় মাগ ধানভানানী ২।১ জাঃ বাঃ

বা, সুয়ো মেগের ষোল আনা দুয়ের নামে নাই
একচোখো ভাতারের মুখে বাসি আকার ছাই। ২।৩ ভাঃ বাঃ

একটু ভিন্ন হলেও কষ্ট এখানে আছে—

খোঁড়া ভাতার বুড়ো ব্যাই
কোন দিকে সুখ নাই।

এই ছড়ারই বিপরীত প্রকাশ—

বেরয়ে এলেম বেশ্যা হলেম কুলকল্যেম ক্ষয়
এখন কিনা ভাতার শালা ধমকে কথা কয় ১।২ স, এ

কিংবা, আম শুকয়ে আমসি, জল শুকয়ে পাঁক
বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, আগুন মরে থাক্। ২।৩ ব, কা,

এই বিভাগের তৃতীয় শ্রেণীটি ভালোবাসা ও প্রেম সম্পর্কিত। ভালোবাসার গভীরতা ও লঘুতা প্রবাদ-প্রবচনের সিদ্ধবাক্যে সমর্থিত হয়েছে ছড়ার রূপে। প্রেমের অগভীরতা ও লঘুতা কোথাও কোথাও নিতান্তই আত্মসুখে কেন্দ্রিত—

মধুপান কত্তে পারি
মাচির কামড় সইতে নারি ১।১ নঃ ত

আবার ভালোবাসার প্রত্যাখ্যানে অভিমানের কণ্ঠও অশ্রুত নয়—

যার জন্যে যার বুক ফাটে
সে আমারে এঁকে কাটে। ১।২ নঃ ত

কোথাও প্রেম বা ভালোবাসার প্রাপ্তি সংগতি-অসংগতি বিচার করে না—

যার সংগে যার মজে মন
কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম। ১।২ নঃ ত

বা, মনে মনে মিল
লেগে গেল খিল। ১।৩ নঃ ত

তৃতীয় ধরণের ছড়াগুলিতে লৌকিক সমাজের বিশেষ করে লৌকিক স্ত্রী-সমাজের গ্রাম্য রসিকতার প্রয়োগ ঘটেছে। সামাজিক আচার-আচরণ অন্বিত এই ছড়াগুলিতে গ্রামীণ সমাজের স্ত্রী-কণ্ঠ প্রায়শই উচ্চকণ্ঠ এবং কোথাও কোথাও অশ্লীলতা দুষ্টও।১ পুরুষ সম্প্রদায় একথার ব্যতিক্রম নয়—

১। বিদেশের ভাষাতেও এর পরিচয় আছে। তুলনীয়....“The rhyming slang, more prevalent in Cockney talk elsewhere in England, is no better than a pointless trick, a seeking of variety for variety's sake. Brown, Ivor, *Ibid,* 63.

ভাল ভাল করে গ্যালাম কেলোর মার কাছে
কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে। ২।১ নীঃ

এই রসিকতা অনেক বেশি দীপ্ত—

বলে দ্যাওরারে এর ব্যাওরা কি
নোন্দায়ের কোলে কেন শোয়না ঠাকুরঝি ২।১ সঃ এঃ

সামাজিক আচার-আচরণেও তার প্রকাশ—

কড়ি দিয়ে কিনলেম দড়ি দিয়ে বাঁধলেম
হাতে দিলেম মাকু একবার ভ্যা করতো বাপু ২।৩ সঃ এঃ

চতুর্থ ধরণের ছড়াগুলি লৌকিক সমাজের সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত এবং তার অনেকখানিই দেবতার চেয়ে অপদেবতা নির্ভর। এই ধর্ম-সংস্কার ওঝার সাপের মন্ত্রে প্রতিফলিত—

রেতে কাটে জাত সাপ
রাখতে নারে ওঝার বাপ। ১।২ বিঃ পাঃ বুঃ

কোথাও বা টোটকার প্রকাশ—

নরামৃত কল্যে পান
সশরীরে স্বর্গে যান
বাসি পেটে বাঁজা বউ নরামৃত খায়
সাত ছেলে পায় কোলে পতি পড়ে পায়। ১।২ বিঃ পাঃ বুঃ

গ্রামীণ সমাজের এই ধর্মীয় সংস্কার কখনও কখনও অসংলগ্ন ভাবনা, সাপের মন্ত্র, পশু-পাখির কথা, ডাকিনী সংস্কার ও মৃত্যুভয়ে প্রকাশিত—

সাপের ফেনা বাঘের নাক
ধুনোর আগুন চরোক পাক্,
সাত সতীনের সাদা চুল
ভাঁটির পাতা ধুতরো ফুল
নীলের বিচি মরিচ পোড়া
হন্নে কুকুর চোরের চণ্ডী
যমের দাতে এই গণ্ডী[১] ৫।৪ নীঃ

১। Macbeth নাটকের তিনজন ডাকিনীর কথোপকথনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়—

Second Witch : Fillet of a fenny snake,
In the caldron boil and bake;
Eye of newt and toe of frog,
Wool of bat and tongue of dog,

পঞ্চম ধরণের ছড়াগুলিতে হেয়ালী বা ধাঁধার প্রকাশ ঘটেছে। অবশ্য এদের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প।

নাই যাই খাচ্ছে তাই থাকলে কোথায় পেতে
কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।

বাংলা দেশের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত ছড়াও স্থান পেয়েছে—

এট্টুখানি পোলাগুয়া জলে নাও সেচে
চিনা জোহে কামড় দিলা তুড় তুড়াইয়া নাচে ৩।১ সঃ এঃ

যষ্ঠ ধরণের ছড়াগুলির বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলিতে সুপ্রাচীন লোক-সমাজের ভাবনা কিংবা প্রবাদবাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ অথচ সত্য কথাটি তেমন প্রতিফলিত হয়নি, যদিও সেদিকে ঝোঁক আছে। লঘু চাপল্য, হাস্যরস, প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে এগুলিকে একেবারে মিশ্র রীতির দৃষ্টান্ত বলা চলতে পারে। ছড়ার চঞ্চল ছন্দ, বক্তব্যের ঋজু ভঙ্গী ও সত্যের সঙ্গে পরিবেশ-পরিস্থিতিকে মিশিয়ে লঘু কবিতার ভাবনা প্রায়ই এদের আক্রমণ করে। বলা বাহুল্য, দীনবন্ধু তাঁর নাটকে এই রীতির লঘু হাস্যরসাত্মক

Adder's fork and blind-worms sting,
Lizard's leg and howlet's wing,
For a charm of powerful trouble,
Like a hell-broth boil and buble ;

Third Witch : Scale of dragon,
tooth of wolf,
Witchs' mummy, maw and gulf
of the ravin'd salt-sea shark,
Root of hemlock digg'd i' the dark,
Liver of blaspheming Jew,
Gall of goat, and slips of yew
Silver'd in the moon's eclipse
Nose of Turk, and Tartar's lips,
Finger of birth-strangled babe
Ditch-deliver'd by a drab,
make the gruel thick and slab :
Add thereto a tiger's chaudron,
For the ingredients of our caldron. IV/I

ছড়াধর্মী কবিতাকে গ্রহণ করেছেন নাটকের প্রয়োজনে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসংগতি এগুলির অনিবার্য রূপ। কোথাও তা—

ঠেকিয়াছে এই বার কায়তের ঘায়
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায়। ৩।১ নীঃ

কোথাওবা আঞ্চলিক বিদ্বেষের রূপ—

বাঙগাল পুঁটি মাছের কাঙগাল
বাঙগাল গঙগাজলের কাঙগাল
বাঙগাল ডেঙগা পথের কাঙগাল
বাঙগাল ভাল কথার কাঙগাল। ২।২ সঃ এঃ

লক্ষ্য করতে হয় এই শ্রেণীর ছড়াগুলিতে একটু কৃত্রিমতার ছাপ আছে। বহু মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েও একক মানুষের কণ্ঠ যেন এগুলিতে শোনা যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে সীতা উদ্ধারযাত্রায় সমাগত বানর সম্প্রদায় যে পরবর্তীকালের বাহ্যাড়ম্বর ও মিথ্যা আস্ফালনকারী অশক্ত সম্প্রদায়কে তুলে ধরতে পারে তারই প্রকাশ ঘটেছে—

বড় বড় বানরের বড় বড় পেট
যাইতে সাগরপারে মাথা করে হেট। ৪।২ নঃ ৩

এই ছড়াটিরই অন্য রূপ—

বাবু রাম কর কাম কথা কইবে কে
চাঁদেরে বিঁধিতে ধোনা ধনুক ধরেছে। ১।৪ লী

এই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কখনো অন্য পরিচ্ছদও পরিধান করে। ভালোবাসার ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হওয়ার দরুন—

প্রেম পুতলেম পাকের ভিতর পালাই কেমন করে
হাড়গোড় ভাঙগা দটি হবো তাড়য়ে যদি ধরে। ৪।৩ নঃ তঃ

আবার লঘু আনন্দ-মিশ্রিত অসামাজিক প্রেমের রূপ—

দেখে যা পাড়ার লোক চোরের দাগাদারি
যে ঘরেতে রাঙগা বউ সেই ঘরেতে চুরি
দেখে যা চোরের দাগাদারি ১।২ জাঃ বাঃ

কিংবা,
নাচবো না তো কি
আমি কি ভেসে এসেচি
কাল সকালে কেলে সোনার
কোলে বসেচি ১।২ জাঃ বাঃ

কোন কোন ছড়ায় ব্যঙ্গের দিকটিও প্রকাশিত এবং এগুলির মধ্যে শালীনতার অভাবও অনুভূত হয়—

হাবা ছেলে কাঁদিস নেকো আর
আমি থাকলে হবে বাবা
বাবার ভাবনা কি তোমার ৩।১ সঃ এঃ

কিংবা, আয় আমার অঞ্চলের নিধি
আঁচল ধরে পিছে পিছে
যশোদার নীলমণি যেমন
ননী খায়তো নেচে নেচে ২।১ জাঃ বাঃ

আবার কোথায় মা ওলাবিবি বেউলা রাঁড়ীর মেয়ে
কানাই বলাই নাচে একবার দেখ চেয়ে
ওমা একবার দেখ চেয়ে ১।১ লীঃ

এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সঙ্গে হাস্যরস মিশ্রিত হয় ছড়ায়—

ভিক্ষা দাওগো, ব্রজবাসী রাধাকৃষ্ণ বল মন
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচি বৃন্দাবন ২।১ জাঃ বাঃ

অথবা, আমি ফচকে ছুঁড়ি
ফুলের কুঁড়ি মুড়ি পোড়ানির ঝি
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলেছি ২।১ জাঃ বাঃ

আবার কোথাও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে ব্যঙ্গ, কোথাও স্নেহের রূপটি ফুটে ওঠে—

মনের মজাটি গাঁজা কাটি কচ্ কচ্
মামীর পীরিতে মামা হ্যাঁকচ প্যাঁকচ ৪।৩ লীঃ

বা, তুমি অরুচির রুচি
কচমচে কচকচি
ইচ্ছে করে তোমার নাকটি কেটে করি কুচি কুচি ২।১ কঃ কাঃ

আবার কোন ছড়ায় তীব্র হয়ে উঠেছে, "অসারে খলু সংসারে" একমাত্র সার পদার্থ শ্বশুর-মন্দিরে যাত্রার আকাঙ্ক্ষা—

নৌকা ডিঙ্গে চাইনে আমি আজ্ঞে যদি পাই
গঙ্গাজলে সাঁতার দিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাই ৩।১ জাঃ বাঃ

দীনবন্ধু-নাটকের আর একটি বিশিষ্টতা হল এক ধরণের হাস্যরসাত্মক কবিতার ব্যবহার। এই হাস্যরসাত্মক লঘু কবিতাগুলির আবেদন যথেষ্ট,

এমন কি এগুলি ব্যবহার না করলে অনেক চরিত্র সম্পূর্ণ হত না। নবীন-তপস্বিনী নাটকের জলধর প্রসঙ্গে এটি গভীরভাবে সত্য।

জল। পীরিতের গুণে গোরু ভূমি হে লিখন
এনেচ প্রেমের কথা করিয়ে বহন
হোঁদল কুৎকুতে মহাশয় সমীপেষু—
যদবধি হাঁদাপেট হেরেচি নয়নে
পূর্ণ চন্দ্র কার্ত্তিকেয় নাহি ধরে মনে
একাকিনী রেখে গেল স্বামী দেশান্তরে
রসিক রতন বিনা রহিব কি করে?
হাবুডুবু খায় রামা বিরহ হাঁদোলে
হোঁদলকুৎকুতে বিনা আর কেবা তোলে?
শনিবার সন্ধ্যা পরে দেবে দরশন,
নাহিলে ত্যাজিব আমি জীবনে জীবন ৩।২ নঃ তঃ

লীলাবতী নাটকের সমস্ত 'ইয়ার' চরিত্রগুলিও অনুরূপ সত্যে যুক্ত। তাদের কণ্ঠে একযোগে উচ্চারিত হয়েছে এই লঘু পদ্যটি—

নেশার রাজা মদের রাজা না খেলে কি বলতে পারি
বিমল সুধা বিনাশ ক্ষুধা পান করিয়ে বাদশা মারি
সুতার যেমন শ্যাম্পেন সেরী হতেন যদি ধ্যানেশ্বরী
শায়ের মেয়ে বিয়ে করি ঘর জামায়ে হতেম তারি।
৪।৩ জাঃ বাঃ

নাটকীয় ভাষা ব্যবহারে দীনবন্ধুর দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ হবার পরিচয় তাঁর নাটকগুলিতে আছে। 'নীলদর্পণ' থেকে সুরু করে 'কমলেকামিনী', পর্যন্ত মোট সাতটি নাটকের ভদ্র-অভদ্র, স্ত্রী-পুরুষ ও অন্যভাষা-ভাষী মানুষের ভাষা প্রয়োগে দীনবন্ধু শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষতঃ তাঁর হাস্যরসাত্মক নাটকগুলির প্রয়োজন সিদ্ধ করতে ভাষা এক অসামান্য স্থান গ্রহণ করেছে। আবার নাটকের সঙ্গে বাস্তবের যে গভীর যোগ তারই প্রকাশ ঘটেছে ছড়া, প্রবাদ-প্রবচনে। বস্তুতঃদীনবন্ধু-নাটকের ভাষায় গ্রাম ও সহর বাংলার প্রকাশই শুধু নয়, জীবনের তিক্ত বঞ্চনা ও দুঃখের সঙ্গে তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ ও স্নিগ্ধ হাসির মিশ্রন হয়েছে। প্রকৃত জীবনরসিকের দৃষ্টির মতই ভালোমন্দ, আলো আঁধারের অখন্ড রূপটি দীনবন্ধুর নাটকে আছে। তাঁর নাটকের ভাষাতেও সেই অখণ্ডতার প্রকাশ।

কাহিনী ও চরিত্র

নাটক ও উপন্যাসের কাহিনী ঠিক গল্পের নয় প্রকৃত পক্ষে উপকথা বা গল্পের আস্বাদ কথাবস্তুর বা আখ্যানের কিন্তু কাহিনী তার চেয়েও কিছু বেশি। Aristotle কাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করে আদি মধ্য ও অন্তের এক অনিবার্যতার কথা বলেছেন।১ প্রকৃত পক্ষে আখ্যান (talc) এবং কাহিনীর (plot) একটি বড় পার্থক্য এই যে, আখ্যানে সাধারণভাবে যুক্তির অনিবার্যতা থাকে না। যদিও সব আখ্যানেই সাধারণভাবে যুক্তি থাকে কিন্তু সে যুক্তি ঠিক কাহিনীর ঘটনা পরম্পরা নয়। বস্তুত গল্পধর্মী সাহিত্যে বর্ণনার স্থান অনেকখানি এবং মহাকাব্য, নাটক উপন্যাসের ক্ষেত্র অনুযায়ী গল্প বা আখ্যানের বিষয়বস্তু যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনার কৌশলও তেমনি ভিন্ন। মহাকাব্য বা উপন্যাসের বিস্তৃতির সংগে নাটকের বিস্তারের পার্থক্য দেখা যায়। মহাকাব্যের বিরাট পরিসরে অসংখ্য মানুষের মর্ম কথাটি ধ্বনিত হয়। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ব্যাপী এক মহাজাগতিক শক্তি মহাকাব্যের কাহিনীতে পরিব্যপ্ত হওয়ার ফলে কোন বিশেষ মানুষ বা ঘটনাকে প্রাধ্যান্য দেওয়া প্রায় অসম্ভব, কেননা, প্রধান অপ্রধানকে একটি গভীর ভাবদৃষ্টি গ্রন্থিত করে রেখেছে মহাকাব্যে। এই গ্রন্থন অসংখ্য মানুষের, অজস্র ঘটনার। স্বভাবতঃই এত মানুষের বহু ঘটনার দীর্ঘ ও বিচিত্র আখ্যান যে সত্যে যুক্ত হয় তা মহাকাব্যেরই। ছোট কাব্যে তা সম্ভব নয়। এমন কি যে উপন্যাসকে আধুনিককালের মহাকাব্য বলা হয় সেই উপন্যাসেও মহাকাব্যের মত বিস্তার লক্ষিত হয় না। অবশ্য নাটকের চেয়ে উপন্যাসের পরিসর সাধারণত বেশি, তাই উপন্যাসে কাহিনী সৃষ্টির সুযোগও বেশি। উপন্যাসে সংক্ষেপে হলেও মহাকাব্যের "fable composed of many fables" থাকতে পারে। ঔপন্যাসিকের বিশেষ মানসিকতার প্রতিফলন,

১। A beginning is that which is not itself necessarily after anything else, and which has naturally something else after it ; an end is that which is naturally after something itself, either as its necessary or usual consequent, and with nothing else after it ; and a middle, that which is by nature after one thing and has also another after it. A well-constructed Plot, therefore, cannot either begin or end at any point one likes ; beginning and end in it must be of the forms just described.

Bywater, Ingram, tr. *Aristotle on The Art of Poetry* (1909) 1962, 40

বিভিন্ন বর্ণনা ও সর্বোপরি ঘটনা ও ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের সাহায্যে উপন্যাসের কাহিনীটি নির্মিত হতে পারে। উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা, আখ্যানাংশ যে কাহিনীর সঙ্গে নিবিড় সূত্রে যুক্ত এমন নয়। অর্থাৎ উপন্যাসের কাহিনীতে লেখকের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু নাট্যকারের স্বাধীনতা ঔপন্যাসিকের চেয়ে কম।১ ঔপন্যাসিকের চেয়ে অনেক বেশি পরিমিত ক্ষেত্রে নাট্যকারকে বিচরণ করতে হয় বলেই তাঁকে উপকরণ সংগ্রহে সংযত হতে হয়। তাঁর শিল্পের জন্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও পরিস্থিতিকেই তিনি গ্রহণ করেন।২ প্রকৃতপক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও পরিস্থিতিগুলির সহযোগে গঠিত হয় কাহিনী। আর তার উপকরণ যেহেতু মানব জীবনের ঘটনা ও পরিস্থিতি সেই হেতু এই ঘটনা ও পরিস্থিতির ক্রিয়াশীলতার সূত্রকে কাহিনী নাটকে উপস্থিত করে। Aristotle কথিত কাহিনীর "beginning, middle and end" প্রকৃতপক্ষে একটি "complete whole"এর। Comedy৩ বা Tragedyর৪ এই "complete whole" নির্মিত

১।......the ballad's tightness of Plot is the reverse of the broad sweep of the epic ; the novelists' resources enable him, in designing his plot, to draw more on inner action, to give himself greater latitude in time and space than the dramatist who must parade his action before the spectator's eye. Steinberg, S. H., *Cassell's Encyclopaedia of Literature,* 1953, 421-88.

২। He has therefore to compress his materials ; to eliminate everything not absolutely essential to his purpose ; to select the most important incidents and situations, and concentrate his attention upon these.

Hudson, William Henry, *An Introduction To The Study of Literature,* 1913, 243

৩। "As for Comedy, it is (as has been observed) an imitation of men worse than the average; worse, however, not as regards any and every sort of fault, but only as regards one particular kind, the Ridiculous may be defined as a mistake or deformity not productive of pain or harm to others; the mask, for instance, that excites laughter, is something ugly and distorted without causing pain." causing pain." Bywater, Ingram, op. cit. 33.

৪। A tragedy,........is the imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself; in

হয় যে সব উপাদানে কাহিনী তার অন্যতম। এবং এই কাহিনী যেহেতু Comedy ও Tragedy-র, তাই এদের উপকরণ, রীতি ও প্রয়োগ কৌশলেও পার্থক্য আছে।

দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের সংখ্যা স্বল্প, কিন্তু তাদের উপাদান এবং বৈচিত্র্য অল্প নয়। প্রকৃতপক্ষে দীনবন্ধুর কাহিনীগুলির বিশিষ্টতা আছে।

নীলদর্পণ (১৮৬০), বিয়েপাগলা বুড়ো (১৮৬৬) ও সধবার একাদশী (১৮৬৬) এই তিনটি নাটক পরিণতির দিক থেকে সুখকর নয়। আবার নবীনতপস্বিনী (১৮৬০), জামাইবারিক (১৮৭২), লীলাবতী (১৮৬৭) ও কমলেকামিনী নাটকের (১৮৭৩) পরিণতি সুখকর, সাধারণভাবে এই দুটি বিভাগের একটিকে দুঃখের অন্যটিকে সুখের কাহিনী বললে, অসঙ্গত হয় না। অবশ্য প্রথম বিভাগের দুঃখ ও দ্বিতীয় বিভাগের সুখ, রূপ ও মাত্রাগত পার্থক্যে নাটকে প্রকাশিত হয়েছে। স্বভাবতঃই সুখের সূক্ষ্ম ও স্থূল মাত্রা ও গুণগত তারতম্যের ওপর যে বিষাদাত্মক, বেদনা মিশ্রিত হাস্যরসাত্মক, কৌতুককর ও ব্যঙ্গাত্মক ইত্যাদি নাটকের রূপ গঠিত হয়, তা এই দুটি বিভাগ স্পষ্ট করে না। সুতরাং আলোচনার প্রথমে একথা স্পষ্ট করে বলা দরকার যে দুঃখ ও সুখ, এই দুই বিভাগ আলোচনার সুবিধের জন্যে। বৃহৎ ও ব্যাপ্ত অর্থে নীলদর্পণ, বিয়েপাগলা বুড়ো ও সধবার একাদশীতে বেদনা আছে, যদিও কাহিনী, চরিত্র পরিকল্পনা ও পরিণতির দিক থেকে তিনটি নাটক শুধু তিন সমাজেরই নয় ভিন্ন রসাবেদনেরও।

নীলদর্পণ নাটকের আখ্যানটি বিষাদাত্বক। নীলকরের অত্যাচারকে কেন্দ্র করে স্বরপুর গ্রামের গোলোকচন্দ্র বসু ও সাধুচরণের পারিবারিকজীবনের ধ্বংস এই নাটকে রূপায়িত হয়েছে। নীলকরদের অত্যাচারে কৃষক সম্প্রদায় জর্জরিত। বল প্রয়োগে নীলচাষে নিযুক্ত করা ছাড়াও নীলকরদের উদগ্রলালসা কৃষক কুলবধূর দৈহিক পবিত্রতা নাশে উদ্যত। গোলোকচন্দ্র বসুর অন্যতম পুত্র নবীন মাধব নীলকরদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়। নীলকরদের সঙ্গে বিবাদে নিজের সর্বনাশকে সে নিকটবর্তী করে আনে। মিথ্যা মামলায় *গোলোকচন্দ্র বসুকে জেলে প্রেরণ করে নীলকরেরা।* বৃদ্ধ গোলোকচন্দ্র

language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work ; in a dramatic, not in a narrative form ; with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions.

Ibid, 35.

আত্মহত্যা করে সেখানে। নীলকররের সঙ্গে বিবাদে লাঠির ঘায়ে নবীনমাধবের মৃত্যু হল। পুত্রশোকে নবীনমাধবের উন্মাদিনী জননী হত্যা করলেন কনিষ্ঠা পুত্রবধূকে, পরে জ্ঞান লাভ করে নিজেও প্রাণ হারালেন।

নীলদর্পণ নাটকের এই আখ্যান প্রকৃত পক্ষে নীলকর অত্যাচারিত সমাজের এবং এই আখ্যান গোলোক বসু পরিবারের ধ্বংশ, সাধুচরণের একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমনির মৃত্যু ও তোরাপ প্রভৃতি রায়তদের কেন্দ্র করে প্রকাশিত হলেও তা প্রকৃতপক্ষে সমগ্র গ্রাম বাংলাদেশের। কিভাবে একটি বা দুটি শান্ত সুখী পরিবার নীলকরদের সর্বনাশা ক্ষুধার গর্ভে নিশেঃষিত হয়ে গোষ্ঠী ও সমাজের কাহিনী হয়ে উঠেছে এ আখ্যান তারই গ্রন্থনা।

নীলদর্পণ নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে গোলোকচন্দ্র বসু ও সাধুচরণের কথোপকথনে একই সঙ্গে স্বরপুর গ্রামের সুখ সমৃদ্ধির পাশে নীলকরদের নীলচাষের বিষক্রিয়া লক্ষিত হয়। "আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরি ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছ, এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে?

সাধু। এখন তো আর সুখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়াছে, গাঁতিও যায় যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয়নি সাহেব পত্তনি লয়েছে, এর মধ্যে গাঁখান ছারক্ষার করে তুলেছে। দক্ষিণ পাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া যায় না আহা! কি ছিল কি হয়েছে।" এই দৃশ্যেই নীলকরদের সঙ্গে আসন্ন বিবাদের সংবাদ বহন করে এনেছে নবীনমাধব। সাধুচরণ তার অসহায় অবস্থার কথা বলে।১ পরের গর্ভাঙ্কে আমিন ঐ সাধুরই জমিতে নীলচাষের দাগ দিয়ে যায়। সাধুচরণ ও রাইচরণকে ধরে নিয়ে যায় কুঠিতে। সাধুর কন্যার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে আমিন।২ তৃতীয় গর্ভাঙ্কে নীলকর আই, আই, উড ও গোপীনাথের কথোপকথনে নীলকর্মচারীদের নিষ্ঠুর পরিচয়ের পাশাপাশি সাধুচরণ ও রাইচরণ প্রহৃত হল। অপমানিত হল নবীনমাধব। প্রথম অংকের তিনটি গর্ভাঙ্কেই গোলোক বসু পরিবারের সঙ্গে নীলকরদের বিরোধ, সাধুচরণের অন্তপুরের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত, বলপ্রয়োগে নীলচাষে নিযুক্ত করার পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। বিরুদ্ধ শক্তি যে কতখানি প্রবল

১। সাধু। কর্তা মহাশয়, এর একটা বিলিব্যবস্থা করুন, নতুবা আমি মারা যাই। দেড়খানা লাঙ্গলে নয় বিঘা নীল দিতে হলে, হাঁড়ি শিকেয় উঠবে। ১।১

২। আমিন। (ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্বগত) এ ছুঁড়িতো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে লুপে নেবে—আপনার বুন দিয়ে বড় পেশকারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পাব—মালটা ভাল দেখা যাক। ১।২

তা এখনো পর্যন্ত তেমন ক্রিয়াশীল নয়, অথচ তার প্রবল প্রতাপের ছায়াপাত এখানে ঘটেছে। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে অন্তপুরিকাদের কথায় নীলকরদের যে আলোচনা আছে তা গ্রামীন সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে তোরাপ ও অন্যান্য রায়তদের বেগুনবাড়ির কুঠির গুদামে রাখা হয়েছে এবং তারা নীলকররের কাছে নির্মম ভাবে প্রহৃত হল। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সরলতার উপস্থিতি, তৃতীয়ে পদীময়রানীর পরিচয়। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে উড ও গোপীনাথ, দ্বিতীয়ে নবীনমাধব, এবং সৈরিন্ত্রীর কথোপকথন। তৃতীয়ে রোগ সাহেবের কামরায় ক্ষেত্রমনির উপস্থিতি, চতুর্থে সাবিত্রীর আক্ষেপ। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে কোর্টগৃহ, দ্বিতীয়ে নবীনমাধবের সঙ্গে নীলকর সাহেবের বিবাদ, নবীনমাধব আহত, সাবিত্রীর, উন্মাদনা। তৃতীয়ে ক্ষেত্রমনির মৃত্যু। চতুর্থে নবীনমাধব, সরলতা ও সাবিত্রীর মৃত্যু।

নীলদর্পণ নাটক যে পটভূমিকে আশ্রয় করেছে তার বিবরণ ইতিপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। বস্তুতঃ গ্রামবাংলার এক বৃহৎ সম্প্রদায় যে ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শক্তি পরীক্ষার কথা ভেবেছিল, তা ইতিহাস সমর্থিত। নীলদর্পণ নাটকের পটভূমিকায় যে বিরাট সমাজ কাজ করেছে সেই অগণিত গ্রামের মানুষগুলির ছবি এই নাটকে আছে। লক্ষ্য করতে হয় সুখ ও শান্তির আশ্রয় কেমন করে নীলকরদের অপরিসীম লোভ ও ধনাকাঙ্ক্ষায় বিনষ্ট হতে চলেছে তার পরিচয় নাট্যকার অত্যন্ত সহজে প্রথম গর্ভাঙ্কেই দেখাতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু তা যেহেতু নিতান্ত গোলোক বসু পরিবারের নয়, তাই আখ্যান গোলোক বসু পরিবারের চার পাশে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর বৃত্ত নির্মাণ করেছে। গোলোক বসুর জমির প্রতি নীলকরের যে লোভ তা-ই সাধুচরণের জমি গ্রহণেই ক্ষান্ত হয়নি তার একমাত্র কন্যার করুণ মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছে। এই দুটি পরিবারের পাশে তোরাপের মত অনেক রায়ত এসেছে এই নাটকে। বস্তুতঃ এ শুধু কৃষক নয়, নীলকর, কি আমিন কি পদীময়রানী নয়, বহু বিস্তৃত এক সমাজ। সেই জীবনের কথা তাই ঘর থেকে বাইরে এসেছে, গ্রাম থেকে সহরের কোর্টে, আবার ফিরে গেছে গ্রামের মৃত্যু যন্ত্রনায়। দীনবন্ধু অত্যন্ত সুকৌশলে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ও পরিবেশকে উপস্থিত করে এই বিচিত্র জীবনের কথাকে এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত করেছেন। এক বৃত্ত থেকে অন্য বৃত্ত নয় একই বৃত্তের কেন্দ্রস্থল থেকে ক্রমশঃ তার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। এই নাটকের প্রাণ এক বৃহৎ সমাজের। এ নাটকের মৃত্যু তাই একের নয়, অনেকের। অনেককে ছাড়িয়ে একের মাথা তোলার চেয়ে অনেক উন্নত শীর্ষ মানুষের পরিচয়, একের চেয়ে অনেকের পদধ্বনি স্পষ্ট। এই শক্তি সমাজের। দীনবন্ধু সেই শক্তিকেই আশ্রয় করেছেন তার নীলদর্পণ নাটকের কাহিনীতে।

নীলদর্পণ নাটকের কাহিনীতে দীনবন্ধুর যে সামাজিক বুদ্ধির প্রকাশ তারই এক বিশিষ্ট দিক প্রতিফলিত হয়েছে বিয়ে পাগলা বুড়ো নাটকে। দুই অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকটিকে আকৃতির দিক থেকে আলোচকেরা প্রহসন বলেছেন। এই প্রহসনের গল্প বৃদ্ধ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের অসঙ্গত বিবাহের ইচ্ছা ও মিথ্যা বিবাহে তার বিপর্যস্ত অবস্থাকে নিয়ে গঠিত। প্রথম অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক। তিনটি গর্ভাঙ্গে যথাক্রমে রাজীবলোচনের হিন্দু-সমাজের আচার-নিষ্ঠা রক্ষার বিবরণ, রাজীবলোচনকে শাস্তি দানের পরি-কল্পনা, ঘটকের আবির্ভাব ও রাজীবলোচনের বিবাহের প্রস্তাব, মিথ্যা সর্প-দংশন জনিত বিষ উদ্ধারের জন্যে রাজীবলোচনকে প্রহার, রামমনি, গৌরমনির বৈধব্য যন্ত্রণার কথোপকথন। দ্বিতীয় অঙ্কের তিনটি গর্ভাঙ্ক। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়ে যথাক্রমে বিবাহের উদ্যোগ, বাসরঘরে রাজীবলোচনের পীড়ন, রাজীবলোচন ও বধূবেশি রতা নাপিত; রাজীব মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে কন্যের সঙ্গে ঘটকের আবির্ভাব, অবগুণ্ঠনবতী পেঁচোর মার অবগুণ্ঠন মোচন।

বিয়ে পাগলা বুড়োর এই গল্পটিতে একটি কার্য কারণের সূত্র থাকায় ঘটনাগুলির অনিবার্যতা দেখা গেছে। বৃদ্ধ রাজীবলোচনের বিবাহের ইচ্ছায় ও বিবাহ যাত্রায় যে অসঙ্গতি, সেই অসঙ্গতির কৌতুককর পরিণতি এই গল্পের প্রাণ। কিন্তু এই কৌতুকের অন্তরালে দীনবন্ধুর সামাজিক চৈতন্যও যে ক্রিয়াশীল ছিল তা অনুভব করা যায়। সমাজচূড়ামণির এই আচরণে বাধা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে গ্রামের ছাত্রসমাজ এবং তাদের কৌশলে প্রথমে রাজীব প্রহৃত ও পরে মিথ্যা বিবাহে প্রতারিত (এই পরিণামকে পরিণত করার জন্যে কৌশল সংখ্যা কম নয়)। বৃদ্ধ রাজীবলোচনের অসঙ্গত ইচ্ছার পাশে ছাত্রসমাজের ইচ্ছাটি এত বেশি সতর্ক ও অন্তরালবর্তী যে পাঠকের পক্ষেও সহসা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুমান করা যায় না। নীলদর্পণ নাটকের কাহিনী যেমন এক পরিবার থেকে ভিন্ন পরিবারে, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামের মানুষে বা এক কথায় বৃহৎ সমাজে ব্যাপ্ত হয়েছে, এই প্রহসনে সেই বিস্তার নেই। অথচ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের এই ব্যাধি যে সমাজে ব্যাপ্ত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। দীনবন্ধুর এই নাটকে প্রকৃতপক্ষে এমন এক কথাবস্তু পরিবেশিত হয়েছে যার অনেকখানিই নগ্ন ও করুণ। দুই বিধবা কন্যার বৈধব্য যন্ত্রণার পাশে রাজীবলোচনের এই বিবাহ যে সমাজকে উপস্থিত করে তার নগ্ন ছবিটি পাঠককে পীড়িত করে। অবশ্য দীনবন্ধু এই কাহিনীকে সম্পূর্ণ কৌতুক-কর করেন নি। নববধূর বেশে পেঁচোর মার প্রবেশ এক অপ্রত্যাশিত চমকের সৃষ্টি করে ঠিকই, কিন্তু বৃদ্ধ রাজীবলোচনের এই আশা ভঙ্গ, কাহিনীর সবটুকুই কৌতুকরসে উজ্জ্বল করে তোলে না। বরং রামমনি, গৌরমনির

দুঃখের পাশে বিবাহ সভায় আর্তনাদরত রাজীবলোচন এমন এক সমাজের ছবি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে যা কৌতুকের পরিচ্ছদে শোভিত মাত্র।

এই কাহিনীর সংক্ষিপ্ত অসাধারণ। এক উদ্দেশ্য থেকে অন্য উদ্দেশ্যে যাত্রার মধ্যে যে দ্রুত চিন্তার পরিচয়, সেই পরিচয় যেন বিয়েপাগলাবুড়ো প্রহসনে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই শক্তির অনেকখানিই নেপথ্যে অথবা উপমা দিয়ে বললে রাজীবলোচনের বিবাহ সভায় নারীবেশে ছাত্রদের মত। এই বেশ কখনও কখনও গৃহীত হয় কখনও পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু গ্রহণ ও বর্জনেও এমন এক অপ্রত্যাশিত ভাব আছে যা কৌতুকের জন্যে প্রয়োজনীয় এবং এই প্রহসনের ঘটনা সংস্থানে এমন কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যা বিয়ে পাগলা বুড়োর আখ্যানকে সূত্রবন্ধ কাহিনীতে পরিণত করেছে।

সধবার একাদশীতে নীলদর্পণ বা বিয়ে পাগলা বুড়োর মত কোন নির্দিষ্ট কাহিনী নেই। অবশ্য পূর্বে আলোচিত অন্য দুটি নাটকের মত সধবার একাদশী নাটকের অন্তরালে একটি উদ্দেশ্য কাজ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা দেশে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে সুধাপান নিবারণ আন্দোলন অন্যতম। বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষিত নব্য বঙ্গীয় সম্প্রদায় মদ্য পানদোষে অধঃপতিত হয়েছিলেন। এর বিস্তৃত বিবরণ রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে ও শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' গ্রন্থে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত মদ্যপান ও বেশ্যাশক্তির প্রতি দীনবন্ধু সধবার একাদশী নাটকে কঠোর ইঙ্গিত করেছেন।

নাটকের কাহিনী নিমচাঁদ ও তার সঙ্গীদের। প্রকৃত পক্ষে এই নাটকের গল্পবস্তু কতগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা-নির্ভর। তিন অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকটির প্রথম অঙ্কে দুটি গর্ভাঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্কে নকুলেশ্বর, নিমেদত্ত, অটল এবং কাঞ্চনের মদ্যপান; দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে গোকুলচন্দ্র, জীবনচন্দ্র এবং অটলের কথোপকথন। দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি গর্ভাঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্কে কুমুদিনী ও সৌদামিনীর কথাবার্তা, কুমুদিনীর আক্ষেপ; দ্বিতীয়ে অটল, কাঞ্চন, নিমচাঁদ, ভোলারাম, রামমানিক্য ও কেনারামের উপস্থিতি, তৃতীয়ে মত্ত অবস্থায় গোকুলবাবুর বাড়ির সম্মুখে নিমচাঁদের অবস্থান। চতুর্থে জীবনচন্দ্র, অটলকে গোকুলের উপদেশ দান। তৃতীয় অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্কে নিমচাঁদ, রামমানিক্য, কেনারাম ও কাঞ্চনের উপস্থিতি। দ্বিতীয়ে, কাঞ্চনের প্রতি অটলের অভিমান, কাঞ্চনের প্রস্থান, নিমচাঁদের আক্ষেপ। তৃতীয়ে, ভুল করে কুমুদিনীকে আনয়ন। ও নিমচাঁদ প্রহৃত।

সধবার একাদশী নাটকের এই অঙ্ক ও গর্ভাঙ্ক বিভাগ থেকে কোন নির্দিষ্ট কাহিনীতে যাওয়া কঠিন। জীবনচন্দ্রের পুত্র অটলবিহারী সুন্দরী রসিকা

যুবতী স্ত্রীকে প্রায় পরিত্যাগ করে বড় মানুষী করে। এই বড় মানুষী গণিকা কাঞ্চনকে রাখা, বাগান বাড়িতে বাস ও মদ্যপানে চিত্রিত। অটলবিহারীর ইয়ার নিমচাঁদ বা ভোলা উভয়েই গৃহ বাস না করে বন্ধুর গৃহে থাকে। নিমচাঁদের অসাধারণ ইংরেজী শিক্ষা, মধ্যে মধ্যে অভিমান ও অনুতাপ অননুকরণীয় বাক্‌চাতুর্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার চরিত্রকে অন্যান্য চরিত্রগুলির পাশে বিশিষ্ট করে তুলেছে। এই নাটকের স্ত্রী-পুরুষ উভয় চরিত্রগুলি একে অন্যের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধে যুক্ত, কাহিনীর দিক থেকে যুক্ত হবার অনিবার্য কার্য-কারণ এদের মধ্যে তেমন নেই। অর্থাৎ এই নাটকের কাহিনী শিথিল। সব নাটকের কাহিনীতে যে গল্প থাকতেই হবে এমন কোন নির্দ্দিষ্ট বিধান নেই এবং গল্প বিহীন নাটক নতুনত্বের দাবী করতেও পারে। সধবার একাদশী নাটকের কাহিনী প্রকৃত পক্ষে চরিত্রের অন্তরালবর্তী। সেই অন্তরালবর্তী কাহিনীর প্রকাশ কুমুদিনীর সরস অথচ বেদনার্দ্র কথায়; কিন্তু তার অনেকখানিই অপ্রকাশিত যেমন অপ্রকাশিত নিমচাঁদ পত্নীর পরিচয় ও অন্তর্বেদনা। বস্তুত সধবার একাদশীর কাহিনী এতবেশি চরিত্র নির্ভর যে চরিত্র আলোচনাতেই তার রূপটি স্পষ্ট হতে পারে।১ কিন্তু তার পূর্বে দ্বিতীয় বিভাগের আলোচনায় প্রবৃষ্ট হওয়া যাক।

নবীনতপস্বিনী, জামাই বারিক, লীলাবতী ও কমলেকামিনী নাটক এই চারটির পরিণতি সুখকর। পূর্বে আলোচিত নাটকের কাহিনীগুলির সঙ্গে এই নাটকগুলির একটি বড় প্রভেদ আছে। অন্য নাটকগুলির মত সামাজিক কোন উদ্দেশ্য এই নাটকগুলির অন্তরালে ক্রিয়াশীল নয়। এ ছাড়াও এদের মধ্যে ঐক্য আছে। নবীনতপস্বিনী ও কমলেকামিনী নাটকে, রাজা, রাজপুত্র, রাজকন্যা, নিরুদ্দিষ্ট পুত্র প্রাপ্তি, অভিজ্ঞান ও পত্রের সাহায্যে রাজপুত্রের সত্য পরিচয় ব্যক্ত করা ইত্যাদি ঘটনা আছে। উভয় নাটকেই রাজপুত্রের ভালোবাসার প্রকাশ। এই ভালোবাসার অন্তরঙ্গ পরিচয় বস্তুত ইংরেজী কাব্যের। আবার জামাই বারিক ও লীলাবতীতে সমাজ জীবন চিত্রিত। জামাইদের একত্র রাখার দৃশ্যে যে সামাজিক মনের প্রকাশ, তারই বিশিষ্ট প্রতিফলন লীলাবতীর কুলীনপুত্র হেমচাঁদ নদেরচাঁদে প্রকাশিত। জামাই বারিকের মূল কাহিনী অভয়-কাহিনীর। এ কাহিনী বিবাহ পরবর্তী রোমাণ্টিক ভালোবাসায় উজ্জ্বল

১। 'সধবার একাদশীতে তথাকথিত নাট্যকাহিনী' অতি ক্ষীণ, নেই বল্লেই হয়। সমস্ত নাটকটি একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র—নিমে দত্তকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। অজিত দত্ত, **বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস** ১৯৬০, ১১৭।

আবার লীলাবতীতে ললিত-লীলাবতীর বিবাহপূর্ব ভালোবাসা। এই চারটি নাটকেই প্রধান কাহিনীর পাশে পাশে উপকাহিনীর আবির্ভাব হয়েছে। কোথাও জলধর-জগদম্বা, বিন্দু-বগলা-পদ্মলোচন, কোথাও নদের-চাঁদ-হেমচাঁদের কাহিনী। কমলেকামিনীতে অবশ্য উপকাহিনীর উপাদান থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কোন কাহিনী সৃষ্টি হতে পারে নি। সুতরাং এই নাটকগুলিকে একটি বিশেষ বিভাগে রাখার যুক্তি আছে।

নবীনতপস্বিনী নাটকের মূল কাহিনী রাজা রমনীমোহনের। তিনি তার নিরুদ্দিষ্টা রানী ও পুত্র বিজয়কে ফিরে পেলেন নাটকের শেষে। এই কাহিনীর সঙ্গে, জলধর-জগদম্বার কাহিনীটি যুক্ত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এই দুটি কাহিনীর স্বাদ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথম কাহিনীর বিজয় ও বড় রানীকে ফিরে পাওয়ায় Shakespeare-এর Comedy of Errors নাটকের ছায়াপাত ঘটেছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে মালতি মল্লিকাব কথোপকথনে রাজার বিবাহ-সংবাদ আলোচনায় এ কাহিনীর সূচনা। বড় ও ছোট রানীর মৃত্যু-সংবাদ পরিবেশন ইত্যাদির মধ্যে বড় রানীর প্রতি রাজার প্রকৃত ভালোবাসা স্পষ্ট হয়। রাজাকে জামাতা হিসেবে পাওয়ার জন্যে সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণ ইচ্ছুক। তিনি তার একমাত্র কন্যা কামিনীকে রাজার হস্তে সমর্পণ করতে চান! কিন্তু কামিনীর সঙ্গে ভালোবাসা হয়েছে এক নবীন তপস্বীর। এই তপস্বী রাজার নিরুদ্দিষ্ট বড় রানীর গর্ভজাত পুত্র। রাজার বিবাহের জন্য যখন সকলে প্রস্তুত তখন রাজসভায় উপস্থিত করা হল তপস্বী ও তার মাতা তপস্বিনীকে। রাজা বড় রানীকে চিনতে পেরে গ্রহণ করলেন স্ত্রী-পুত্রকে।

এই কাহিনীর অনেকখানি স্থান গ্রহণ করেছে বিজয় ও কামিনী। রাজার বিরহ, বিবাহের জন্য পাত্রী সন্ধান ইত্যাদি ঘটনার পাশে বিজয় ও কামিনীর ভালোবাসা এক নতুন বৃত্ত গঠন করে। রাজা রমনীমোহনের শোক, রাজ্য পরিত্যাগ করে বনবাসের সংকল্প গ্রহণের কারণ নিরুদ্দিষ্টা বড়রানী। বিচার-সভায় স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে তিনি পুত্র, পুত্রবধূও লাভ করলেন। এই কাহিনী পরিণত হয়েছে একটি লিপি ও অঙ্গুরীয়ের সাহায্যে। নাটকীয় ঘটনার যে সংক্ষিপ্ত ও সমস্ত ঘটনার যে অনিবার্য যোগ, তা এই নাটকের রাজা রমনীমোহনের কাহিনীতে শিথিল। অনেক সময়েই নিরুদ্দিষ্টা বড় রানীর ও ছদ্মবেশী নবীনতপস্বীর মতই কাহিনীর সূত্রজাল অদৃষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয় কাহিনীটি শুধু রসাবেদনের ক্ষেত্রেই নয় কাহিনী হিসেবেও স্বতন্ত্র। জলধর-জগদম্বার উপস্থিতি হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে। রাজা রমনীমোহনের রাজমন্ত্রী জলধর, এই পরিচয় ছাড়া মূল কাহিনীর সঙ্গে তার কোন সংযোগ নেই। কিন্তু অনুতপ্ত রাজার শোকদীর্ণ চিত্রের পাশে জলধর-জগদম্বার কাহিনী

বাজার বিষণ্ণ রূপকে ভাবগম্ভীর করে তোলে। হাস্যরস সৃষ্টি ছাড়াও এই কাহিনীর অন্য সার্থকতা এখানে।

জামাইবারিক নাটকেও দুটি কাহিনী আছে। অভয় ও কামিনীর কাহিনীটির পাশে বগলা-বিন্দু ও পদ্মলোচনের উপকাহিনীটি দেখা গেছে। বিজয়বল্লভের অজস্র জামাতাদের মধ্যে অভয়কুমার যে একটু স্বতন্ত্র তা অনুভব করতে কামিনীকে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। জামাই বারিকের অসম্মান ও নির্যাতনের পরিচয় এই নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাংকে কামিনী, ভবিময়রানী ও হাবার মার কথায় স্পষ্ট হয়েছে। এই অসম্মান ও নির্যাতন যে জমিদারগৃহের বাইরে অন্যরূপে প্রকাশ পেতে পারে তার পরিচয় দ্বিতীয় অঙ্কে বগলা-বিন্দুবাসিনীর কলহে পরিস্ফুট হয়েছে। সপত্নীত্বের বিরোধ এখানে প্রবল কৌতুকরসে ব্যক্ত হয়েছে। এক কাহিনীতে অপমানিত অভয়কুমার গৃহত্যাগী অন্য কাহিনীতে দুই পত্নীর কলহের জ্বালায় পদ্মলোচন বিবাগী। তারই পূর্ব সূত্র হিসেবে জামাই বারিকের দৃশ্য—অভয়কুমারের বিতাড়ন সন্নিবেশিত। অভয় কুমারের উদ্ধারের জন্যে কামিনীর বৃন্দাবনে আগমন, বৈষ্ণবীর বেশে অভয়ের সংগে কণ্ঠি বদল ইত্যাদির পাসে বিন্দু-বগলার সখীত্ব সম্পাদনের সংবাদটি যেন পদ্মলোচনের গৃহ প্রত্যাবর্তনের ছবিকে নিশ্চিত করে তোলে।

প্রকৃত পক্ষে নবীনতপস্বিনী ও জামাই বারিক নাটকের প্রধান কাহিনী দুটি গম্ভীর ও মিলনমূলক হলেও দীর্ঘকালের দুঃখকষ্টের স্মৃতিও যেন পাশাপাশি উপস্থিত হয়। এমন কি এই দুটি কাহিনীতে রাজা রমনীমোহনের স্ত্রী পুত্র লাভ, মাধব-শ্যামার পুনর্মিলন, অভয় কামিনীর পুনর্মিলন সম্পূর্ণ ভিন্ন রসের কাহিনীতে রূপান্তরিত হত যদি জলধর-জগদম্বা ও বিন্দু-বগলার কাহিনী এই নাটক-দুটিতে থাকতো না। শুধুই কৌতুকরস সৃষ্টি নয়—একটি ভাবগম্ভীর কাহিনীর পাশে সমান্তরালভাবে আর একটি লঘু কাহিনীর এই যাত্রা দুটি কাহিনীকেই একে অন্যের অলক্ষ্যে প্রাণবান করে তোলে। এক কাহিনীর সমস্ত দুঃখ যন্ত্রনা অন্য কাহিনীর লঘুকৌতুকে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে; আবার গম্ভীর কাহিনীর কাছ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে কৌতুক তার গুণগত মাত্রাকে বজায় রাখে। এই প্রধান দুটি কাহিনীর পাশে অপ্রধান হয়েও পাঠকের কৌতুহলী দৃষ্টিতে যে দুটি কাহিনী ধরা পড়ে তারা জলধর-জগদম্বা ও বগলা-বিন্দুর কাহিনী। হোঁদলকুৎকুতে বেশী জলধরের মুক্তির পর গৃহ প্রত্যাবর্তনে ও দীর্ঘকালপরে পদ্মলোচনের গৃহ প্রত্যাবর্তনের ফলাফল আমরা অনুভব করতে পারি। এই দুটি নাটকের কাহিনী সমান্তরাল দুই পথের মত নিজের নিজের লক্ষ্যে উপস্থিত হয়েছে। শুধু পাশাপাশি থাকার

ফলে এক কাহিনী উপহার দিয়েছে একটি ঘটনা অন্য কাহিনীকে, অন্য কাহিনীটিও প্রতিদান দিয়েছে অনুরূপভাবে। এই কাহিনীর স্বাতন্ত্র্য যে কত বেশি তার প্রমাণ এই উপকাহিনীগুলিই স্বতন্ত্র নাটকে রূপান্তরিত হতে পারে। জামাইবারিকের বিন্দু-বগলার অংশটি স্বতন্ত্র নাটক হিসেবে মুদ্রিত এবং অভিনীত হয়েছে১ এ কথাই তার প্রমাণ।

অন্য দুটি নাটকের একটিতে বাংলাদেশের জমিদার পরিবারের অন্যটিতে মণিপুর ও ব্রহ্মদেশের রাজপরিবারের কাহিনী। লীলাবতীর কাহিনী জমিদার হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের নিরুদ্দিষ্ট পুত্র অরবিন্দকে পাওয়ার কাহিনী। এই কাহিনীর সঙ্গে হরবিলাসের শ্যালক শ্রীনাথ, প্রতিপালিত পুত্রস্থানীয় ললিত ইত্যাদির কাহিনীযুক্ত হয়ে মূল কাহিনীকে বর্দ্ধিত করেছে। অরবিন্দকে দীর্ঘকাল না পেয়ে হরবিলাস পোষ্যপুত্র নেবার উদ্যোগ করে এবং সেই অবস্থায় কৌশল করে অরবিন্দের বেশে এক ব্রহ্মচারী এসে উপস্থিত হয়। পরে অবশ্য প্রকৃত অরবিন্দ আসে এবং সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হয়। হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা লীলাবতীর সঙ্গে নদের চাঁদের বিবাহ উপলক্ষে হেমচাঁদ-নদেরচাঁদের উপস্থিতি। এই নাটকের অধিকাংশ চরিত্রের কাহিনী একটি উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হয়েছে। অন্য নাটকের কাহিনীটি মণিপুররাজ ও ব্রহ্মরাজের সঙ্গে বিরোধ ও পরে দুই পরিবারের বৈবাহিক সূত্রে মিলিত হওয়ার কাহিনী। মণিপুররাজের প্রথম রানীর পুত্র ছোট রানীর হিংসায় বিসর্জিত হয়। সেই পুত্রকে প্রতিপালন করেন ত্রিপুরা ঠাকরানী। মণিপুররাজের কনিষ্ঠা মহিষী ধুনী দাইয়ের সাহায্যে ঐ পাপকার্য করেছিলেন সপত্নী-বিদ্বেষে। পরে তিনি অনুতপ্ত হন। মণিপুররাজের সহকারী সেনাপতি শিখণ্ডী-বাহনই বিসর্জিত রাজপুত্র। ব্রহ্মরাজ কন্যা রনকল্যানীর সঙ্গে তার ভালোবাসা হয়। পরে উভয় রাজা বন্ধুত্ব ও বৈবাহিক সূত্রে মিলিত হন।

লীলাবতী নাটকের কাহিনীতে হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের নিরুদ্দিষ্ট পুত্র প্রাপ্তি ও কমলেকামিনী নাটকে শিখণ্ডী বাহনের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন একই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় যে নবীনতপস্বিনী নাটকেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। লীলাবতী ও কমলেকামিনী নাটকে ললিত-লীলাবতী ও শিখণ্ডীবাহন-রনকল্যানীর ভালোবাসা আছে। নবীনতপস্বিনী নাটকেও বিজয়কামিনীর ভালোবাসা অনুরূপ। কিন্তু লীলাবতী নাটকের পরিবেশ একটি বিশেষ সমাজের। কুলীন কন্যা ও কুলীনপাত্রের পাশে একটি বিত্তশালী

১। দীনবন্ধু মিত্র, **জেনানা যুদ্ধ**, (১৩৩৩) ১৯২৬ (জামাইবারিক প্রহসনের অন্তর্গত), মনোমোহন থিয়েটার ও অন্যান্য বহু থিয়েটারে বহুবার অভিনীত।

পরিবারের কথাবস্তু এই নাটকের। লীলাবতীর বিবাহ প্রসঙ্গে হেমচাঁদ-নদেরচাঁদের কাহিনীটি যুক্ত হয়েছে মূল কাহিনীর সঙ্গে। এ কাহিনীর পরিবেশ তাই প্রায়শই অন্তপুরে। শারদাসুন্দরী ও হেমচাঁদের চিত্রে, শারদা-সুন্দরী ও লীলাবতীর কথোপকথনে লীলাবতীর যে ভবিষ্যৎ জীবন ব্যঞ্জিত হয়, তারই প্রকাশ কন্যা দর্শন দৃশ্যে হেমচাঁদ-নদেরচাঁদকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত। আবার অরবিন্দ পরিচয়ে অন্যের আবির্ভাবের পর রহস্য মোচনের সূত্রে জমিদার বা বিত্তশালী সমাজের যে কাহিনী বর্ণিত হয়, তাও যুক্ত হয়েছে, কাহিনীর একটি প্রধান ঘটনার সঙ্গে। হেমচাঁদ-নদেরচাঁদ, শ্রীনাথ, সিদ্ধেশ্বর, ললিত ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে একটি নবীন সম্প্রদায়ের মানসিকতাও ব্যক্ত হয়। এদের পাশে ললিত-লীলাবতীর ভালোবাসা, মানসিক অশান্তির পর বিবাহ, কাহিনীটিকে একটি মিলনান্তক পরিণতি দান করে।

কমলেকামিনী নাটকের কাহিনীতেও শিখণ্ডীবাহন ও রনকল্যানীর ভালোবাসা, এদের মিলন, শিখণ্ডীবাহনকে রাজপুত্র প্রমাণ করা এগুলির জন্যেই যেন নাট্যকার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন। রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ কোন রাজমহিমা এই কাহিনীতে নেই বরং সাধারণ মানুষেব আশা-আকাঙ্ক্ষার মতই একটি ভলোবাসার কাহিনী এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই দেশের সংগ্রামের মধ্যে সহসেনাপতি শিখণ্ডীবাহনের অতুলনীয় বীরত্ব, ব্রাহ্মরাজকন্যা রনকল্যানীর মাল্যদান, বৈষ্ণবীর বেশে শিখণ্ডীবাহনের শিবিরে রনকল্যাণীর সখীর আবির্ভাব, এগুলিতে গল্পরস আছে এবং পাঠক ও দর্শক এমনই এক প্রত্যাশিত পরিণতি আশা করে। কাহিনীতে নতুনত্ব এসেছে মণিপুর রাজমহিষী গান্ধারীর পূর্ব অপরাধ বর্ণনায়। এই বর্ণনা অপ্রত্যাশিত চমকে শিখণ্ডীবাহনের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরতে যেমন সাহায্য করে তেমনি সাহায্য করে কাহিনীটির মর্যাদা দানে।

দীনবন্ধু মিত্রের এই সাতটি নাটকের কাহিনী রাজা, জমিদার, বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ ও সাধারণ গ্রাম্য জীবনের। গ্রাম ও সহর তাঁর নাটকের পরিবেশ রচনা করেছে। এই পরিবেশে সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যা তাদের প্রকৃত রূপ নিয়ে নাটকগুলিতে উপস্থিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে কাহিনীগুলি আমাদের আকৃষ্ট করে তা তার হাস্যরসাত্মক উপাদানের জন্যেই। দীনবন্ধু নাটকের হাস্যরস কতগুলি প্রধান-অপ্রধান চরিত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। বস্তুত তাঁর নাটকের মর্যাদা শুধু কাহিনী নির্ভর নয় তা চরিত্র নির্ভরও বটে। সুতরাং চরিত্র সৃষ্টির জন্যে তিনি কোন কৌশল ও কি উপকরন গ্রহণ করেছেন সেই আলোচনার সার্থকতা আছে।

দীনবন্ধুর সাতটি নাটকের ছোট বড় চরিত্রের সংখ্যা শতাধিক। গ্রাম ও

সহরের বহু বিচিত্র মানুষের চিত্র তাঁর নাটকগুলিতে দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে তাঁর সমকালে এত সংখ্যক মানুষের ভিড় আর কারো নাটকে নেই। দীনবন্ধুর বহু দেশদর্শিতায় ও সহানুভূতি-স্নিগ্ধ অভিজ্ঞতায় এই চরিত্রগুলি শুধুই বিশিষ্ট নয়, তাঁর সমকালের সমাজ-জীবনের একটি সম্পূর্ণ রূপকেও তুলে ধরেছে। সাধারণত মহৎ নাট্যকারের দৃষ্টিতে একটি অখণ্ডতা থাকে। ব্যক্তি ও সমাজের মিলন-বিরোধের মধ্যে একটি ক্রিয়াশীল জীবন প্রবাহকে লক্ষ্য করেন নাট্যকার। একটি বা দুটি জীবন বিশেষ একটি সামাজিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে। অনেকগুলি ঘটনার সূত্রে গ্রথিত হয়ে তার সমগ্র রূপটি প্রত্যক্ষ হয়। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এই সম্পূর্ণ জীবনটিকে গ্রহণ করেন নাটকে। বস্তুত যিনি যতবড় নাট্যকার তিনি তত বেশি জীবনের অখণ্ড ছবিটি আনতে পারেন তাঁর নাটকে। স্বভাবতই ট্রাজেডি এবং কমেডি, এই দুই রীতির নাটকে যেহেতু একই ধবনের পরিণতি থাকে না সেই হেতু এই দুই রীতির নাটকে জীবনের অখণ্ড রূপটিও একরকম নয়। ট্রাজেডি সাধারণ ভাবে মহতের দুর্দশাকে উপস্থিত করে, কিন্তু কমেডিতে দুর্দশার চেয়ে হাস্যকরতার ১ স্থান অনেক বেশি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মহতের নাও হতে পারে। অর্থাৎ ট্রাজিক এবং কমিক চরিত্রের মধ্যে যে পার্থক্য তা শুধুই রীতিগত নয় গুণগতও এবং কোথাও কোথাও তা-ই একমাত্র এ দুয়ের পার্থক্য নির্দেশক।

বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় মাত্র সাতটি নাটকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় অধিকাংশ মানুষগুলি তাঁর নাটকে ভিড় করেছে। এমন পরিপূর্ণ জীবনের চিত্র তাঁর আগে কোন নাটকে পাওয়া যায় নি। রাজপরিবার ও রাজকর্মচারী, গ্রাম ও সহরের সম্প্রান্ত মানুষ, স্ত্রী, পুরুষ ও কৃষক সম্প্রদায়ের পাশে ছাত্র, ঘটক, চাকর, বিদূষক, পণ্ডিত, রায়ত, নেশাখোর, নীলকর ইত্যাদি বিচিত্র মানুষের ছবি তাঁর নাটকে স্থান পেয়েছে। প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি চবিত্রের আলোচনায় দীনবন্ধুর চরিত্র সৃষ্টির প্রতিভা স্পষ্ট হতে পারবে।

দীনবন্ধু মিত্রের শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হাস্যরসে। নীলদর্পণ ছাড়া অন্য সমস্ত নাটকগুলির মৌল আবেদন হাস্যরসের। তাঁর হাস্যরসাত্মক নাটকগুলি বিষয়বস্তু, ঘটনা ও প্রকাশভঙ্গীতে ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একটি প্রেরণা যে সমস্ত নাটকগুলিতে ক্রিয়াশীল এমন মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। নীলদর্পণ নাটকের পটভূমিতে হাস্যরসের অবকাশ ছিল না। বাংলাদেশেব

1. "The style of tragedy was supposed to be mainly serious and lofty, the style of comedy generally light and familiar."

Herrick, T. Marvin, *Comic Theory In The Sixteenth Century,* 1949, 36

অগণিত কৃষক পরিবারের প্রতীক হিসেবে গোলোক বসু পরিবার ও অন্যান্য কৃষক রায়তের অপমানিত ও অত্যাচারিত রূপ এই নাটকের বিষয়বস্তু। নীলকরদের ভয়াবহ অত্যাচারের মধ্যে ট্রাজেডির অশ্রুজলই একমাত্র অবলম্বন হিসেবে ধরা দিয়েছে। এই গভীর ও করুণ পরিবেশে দু-একটি চরিত্র সামান্য দু-একটি কথায় উজ্বল হয়ে উঠেছে।

নীলদর্পণ নাটকের দুটি অংশ উদ্ধার করে রায়ত বা কৃষকদের চরিত্র স্পষ্ট করা যায়। নীলকরদের অত্যাচারে যাদের প্রায় প্রত্যহ পীড়িত হতে হয়েছে, ধর্ম এবং সম্মান যাদের বিসর্জন দিতে হয়েছে তারাই প্রকৃত পক্ষে এই নাটকের মৌল শক্তি। গোলোক বসুর শান্ত পরিবারে ও তার গ্রামের মানুষদের নায়কত্ব করেছে এই নাটকে নবীনমাধব। কিন্তু বিন্দুমাধব বা অন্য প্রধান ভদ্র চরিত্র-গুলির পাশে যারা বাস্তবতার দাবী নিয়ে উপস্থিত হয় তাদের সকলেই অপ্রধান রায়ত সম্প্রদায়ের। দীনবন্ধুর বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি এই কৃষক সম্প্রদায়েকে তাদের নগ্ন স্বাভাবিকতায় আঁকতে পেরেছেন। নীলদর্পণ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তোরাপ ও চারজন রায়তকে বেগুনবেড়ের কুঠির গুদামঘরে জোর করে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে ধরে আনা হয়েছে। নীলকরদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোস দুর্বলের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বলেই যেন তা বেশি অসহায়। “তোরাপ। ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পারবো না। ঝে বড় বাবুর জন্যি জাত বাঁচেচে, ঝার হিল্লেয় বস্‌তি কত্তি নেগেছি, ঝে বড়বাবুর হাল গোরু বেচ্‌য়ে নে ব্যাড়াছে, মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড়বাবুর বাপ্‌কে কয়েক করে দেব? মুই তো কখনুই পারবো না জানকবুল।”

তোরাপের কথার উত্তরে দ্বিতীয় রায়ত বড়বাবুর প্রতি তার কৃতজ্ঞতার কথা স্বীকার করে, কিন্তু উপায় নেই। “...... তা করবো কি, সাক্ষী না দিলি যে আস্ত রাখে না, উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়েয়ে উটেলো দ্যাদিনি অ্যাকন তবাদি অক্ত বোঝানি দিয়ে পড়ছে গোড়ার পা য্যান বল্‌দে গোরুর খুর।” দ্বিতীয় রায়ত বর্ণনা করে কাচারির, “মুই সেরের কেচ্‌রির ভেতর অনেক তামাসা দেখেলাম। ওয়া! ন্যাজের কাছে বসে মাচেরটক সাহেব যেই হ্যাল মেরেছে, দুই সুমুন্দি মোক্তারওর্মানির র করো্য অ্যাসেছে। হেড়াহেড়ি যে কত্তি নেগলো, মুই ভাবলাম ময়নার মাটে সাদ খাঁদের ধলাদামড়া আর জমাদ্দারদের বুদো এঁড়ের নড়ই বেদলো।” এই দৃশ্যেই চতুর্থ রায়ত গোলকবসুর বর্ণনা করে “মোর কোলের ছেলেটার গা তেতো করেলো তাইতি বসমশার কাছে মিছরি নিতি অ্যাকবার স্বরপুর আয়েলাম। আহা কি দয়ার শরীল, কি চেহারার চটক, কি অরপুরের রূপী দেখেলাম। বসে আছেন য্যান গজেন্দ্রগামিনী।”

রায়তদের কথোপকথনের এই ভাষায় হাসির উপাদান আছে কিন্তু তার আবেদন উপরিউক্ত রায়তদের কাছে নয় কেননা এ ভাষা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা। উডসাহেবের বুটের তলায় যে রায়ত পিষ্ট হয় যার বুক থেকে রক্ত ক্ষরিত হয়, সে হাসির কথা বলে না। বস্তুত এদের আচার আচরণ, কথাবার্তার মধ্যে এমন কোন উপাদান নেই যা রায়ত সম্প্রদায়ের কাছে হাস্যকর, অথচ তা শিক্ষিত দর্শক ও পাঠকের মনে অনেক সময় হাস্যোদ্রেক করতে পারে। এখানেই দীনবন্ধুর শক্তির পরিচয়। রায়তদের উপমার সঙ্গে পাঠকের কল্পনাশক্তির অসঙ্গতি সমস্ত নিষ্ঠুর যন্ত্রনার মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত বেদনা-মিশ্রিত হাসির সৃষ্টি করে হৃদয় ও বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করে একই সঙ্গে। সেই পরিচয় এই অংশে আছে। রায়তদের অন্যতম প্রতিনিধি তোরাপ চরিত্রে গ্রাম্য-জীবনের একটি স্বাভাবিক ও বলিষ্ঠ রূপকে উল্লিখিত দৃশ্যে প্রত্যক্ষ করা গেছে। পরবর্তী অংশে ক্ষেত্রমণির উদ্ধার দৃশ্যে বা নবীনমাধবের আহত হওয়ার উত্তর-কাহিনীতে তোরাপের পরিচয় আছে। প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মানের সঙ্গে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আর সমস্ত প্রাণ যেন ফুটে বেরোয়। লোঁ, দেখে গাটা যার ঝাঁকি দিয়ে ওঠে, ভাতার মারির মাঠে সাহেবকে পেলে যে তার চোয়াল আসমানে উড়িয়ে দিতে চায় সে শুধুই প্রভুর প্রতি আনুগত্যে ও শ্রদ্ধায় বিগলিত নয়, সে নিজের শক্তির ওপর আস্থাবান। নীলদর্পণ নাটকের গ্রাম্য চরিত্রের এই সরল অনাবৃত অথচ বলিষ্ঠ জীবনকে পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে যত সহজে তোরাপ তুলে ধরতে পেরেছে এমন আর অন্য কোন চরিত্র নয়।১ অবশ্য

১। তোরাপের কথাগুলিতে যে চরিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা সর্বদেশে, সর্ব-কালের কবিকল্পনাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। তাহার বিশাল পেশীপুষ্ট দেহ একটা বন্য পৌরুষের ছবি এ কথাগুলিতে যেমন সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে, তেমনি এই ভাষার ভঙ্গিতেই তার অন্তরের বালকমূর্তি এবং অকপট কুটিলতাহীন ক্রোধ যে রসের সৃষ্টি করে, তাহাতে একাধারে হাসি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। 'লোঁ দেখে গাড়া মোর ঝাঁকি মেবে ওটছে'—এই একটি কথায় সে কোন্ জাতের মানুষ তাহা আমরা নিমেষে বুঝিয়া লই; চরিত্র-চিত্রণে এমন অব্যর্থ নাটকীয় কল্পনাই সেক্সপীয়ারের গৌরব। কিন্তু তোরাপের চরিত্রে এই যে এখানে আদিম পশুটার মূর্তি উঁকি মারিতেছে, তাহার ক্রোধ প্রকাশের ভঙ্গিতে সেই পশুরই শিশুরূপ দেখিয়া আমরা কৌতুক অনুভব করি; সেই পশুই একটি অকপট মনুষ্যত্বের মাধুর্যে মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। তোরাপের ভাষাও লক্ষ্য করিবার বস্তু, এখানে ভাষার অসংযমই প্রাণের প্রাবল্য সূচনা করিতেছে। এ ভাষায় যে অশ্লীলতা আছে তাহা 'আর্টের' অশ্লীলতা নয়, চরিত্র-গত দুর্নীতি নয়, এ অশ্লীলতায় ন্যায্য অধিকার কেবল এই চরিত্রেরই আছে, সে অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে চাহিবে, এত বড় রুচিবাগীশ ভগবানও নহেন, তোরাপ তাহাই প্রমাণ করিয়াছে।'

মোহিতলাল মজুমদার, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ১৩৫৩, ১১৭।

নীলদর্পণের ক্ষেত্রমণির চরিত্রও অনুরূপ সত্যে যুক্ত। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ক্ষেত্রমনির সেই পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে।

সাধুচরণের একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণি বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় বালিকা। সাধভক্ষণের উদ্দেশ্যে সাধুচরণ তাকে গৃহে এনেছে। সেই অবস্থায় তাকে নীলকরের লুব্ধ দৃষ্টির গ্রাসে পড়তে হয়েছে। নাটকের পরিণতির জন্যে যে অসংখ্য ঘটনাগুলি এখানে ঘটেছে, ক্ষেত্রমনির উপস্থিতি সেই মূল প্রবাহের একটি সূত্র মাত্র। অন্য সূত্রগুলির সঙ্গে তার পার্থক্য শুধু প্রকাশে।

তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ক্ষেত্রমনিকে রোগের ঘরে এনেছে পদীময়রানী। "ক্ষেত্র। ময়রাপিসি, মোরে এমন কথা বলনা, মুই পরান দিতি পারবো, ধর্ম দিতি পারবো না, মোরে কেটে কুচি কুচি কর, মোরে পুড়য়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না, মোর ভাতার মনে কি ভাববে?

পদী। তোর ভাতার কোথায় তুই কোথায়, একথা কেউ জান্তে পারবে না এই রাত্রেই আমি সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো।

ক্ষেত্র। ভাতারই যেন জান্‌তি পারলে না—ওপরের দেবতা তো জান্তি পারবে, দেবতার চকি তো ধুলো দিতি পারবো না। আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জ্বলবে, মোর স্বামী সতী বল্যে মোরে যত ভালবাসবে তত মোর মন তো পুড়তি থাকবে, জানাই হোক, আর অজানাই হোক, মুই উপপতি কত্তি কখন পারবো না।" ... ...

"মোরে কাল সাপের গত্তের মধ্যে একা রেখে গিলি, মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপতি লেগিছি, মোর যে ভয়তে গা ঘুরতি লেগেছে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধুলো বেটে গেল।

রোগ। ডিয়ার, ডিয়ার, (দুই হস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্ত ধরিয়া টানন) আইস, আইস। ক্ষেত্র। ও সাহেব তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দেও, পদীপিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেট্‌য়ে দাও, আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না, (হস্ত ধরিয়া টানন) ও সাহেব তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা। হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও, তুমি মোর বাবা।

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে। আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোর ছেলে মরে যাবে, দই সাহেব। মোর ছেলে মরে যাবে—মুই পোয়াতি।

রোগ। তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার নজ্জা যাইবে না। (বস্ত্র ধরিয়া টানন)।

ক্ষেত্র। ও সাহেব মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও (রোগের হস্তে নখ বিদারণ)

রোগ। ইনফরন্যাল্ বিচ্। (ক্ষেত্র গ্রহণ করিয়া) এইবার তোমার ছেনালি ওগ্য হইবে।

ক্ষেত্র। মোরে অ্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না। মোর বুকি একটা তেরোনালের খোঁচা মার, মুই স্বগ্গে চলে যাই ও গুখেগোর বেটা আটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মরা মরো। মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি তোর হাত মুই এঁচ্ড়ে টুকরো টুকরো করবো। তোর মা বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না; দেঁড়য়ে রলি কেন। ও ভাই ভাতারীর ভাই, মাব না মোর প্রাণ বার করে ফ্যালনা, আর যে মুই সইতে পারিনে।"

নাটকে ক্ষেত্রমনির স্থান সামান্য। কিন্তু স্বল্প স্থান গ্রহণ করেও যে চরিত্র তার মৌল শক্তিকে জীবন্তরূপে প্রকাশ করতে পারে তার প্রমাণ ক্ষেত্রমণি। বাংলা সাহিত্যের সমস্ত বিভাগেই ক্ষেত্রমনির মত চরিত্র একক। নীলকরদের উদগ্র লালসার সামনে একটি অসহায়া কৃষক বধূর সম্মান ও ধর্ম রক্ষার এই দৃশ্যে নাট্যকার সর্বশক্তির নিয়োগ করেছিলেন বলে মনে হয়। মানুষের ক্ষুধার নিষ্ঠুর ও ধর্মহীন এক পরিস্থিতিতে নিতান্তই অনভিজ্ঞ এক বালিকা অন্তর্বত্নী বধূকে উপস্থিত করেছেন নাট্যকার। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা শুধু ক্ষেত্রমনির কাছেই নয় পাঠক ও দর্শকের কাছেও করুণ ও মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে। মোহিতলাল মজুমদার এই দৃশ্যকে দীনবন্ধুর 'অগ্নিপরীক্ষা' বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃত পক্ষে এই নাটকে যে কটি মৃত্যু ঘটেছে, তাদের মধ্যে ক্ষেত্রমণির মৃত্যুদৃশ্য শিল্পের দিক থেকে গভীরতর মর্যাদার অধিকারী। পিতামাতার স্নেহলালিত একমাত্র কন্যার সাধভক্ষণ বা চুনুরি সাড়ির আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়নি। পরিচিত সংশয় থেকে অন্য এক নিষ্ঠুর জগতে উপস্থিত হলেও গ্রামীণ সংস্কৃতির বলিষ্ঠ জীবন ও নীতিবোধ থেকে ক্ষেত্রমণি বিচ্যুত হয়নি। "এই দৃশ্যের এইটুকুর মধ্যেই অসহায়া নারীর যে অবস্থা-সঙ্কট চিত্রিত হইয়াছে তাহার তীব্রতা ও নিদারুণতার কারণ এই যে, নৃশংস হিংস্র জন্তুর আক্রমণে যেন শশকশিশু তাহার সকল্ শক্তি প্রয়োগ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহার নখদন্ত তাহার প্রাণের মতই কোমল, ফুল বজ্র হইয়া উঠিতে পারিল না। জীবনের এত বড় নির্মম কঠোর দিকটা যে কখনও দেখে নাই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের সারল্যে যে আজন্ম লালিত, চাষার ঘরের নির্বোধ স্নেহে যাহার হৃদয় মন গঠিত, সে যখন সহসা জগতেরই নিষ্করুণ লোলুপতার মূর্তি

দেখিল, তখন তাহার আত্মরক্ষার যে প্রয়াস আমরা দেখি, তাহাতে ট্রাজেডির নায়িকা সুলভ আচরণ ও বাক্য বিন্যাস নাই; অজগর সর্পের আক্রমণে ক্ষীণপ্রানা পক্ষীমাতার যে নিতান্ত নিষ্ফল আর্তচীৎকার ও নখরপাত এখানে তাহাই স্বাভাবিক: প্রাণের প্রবল আকুলতা দুর্বল দেহের বাধা অতিক্রম করিতে পারিতেছে না।"১ ক্ষেত্রমনির মৃত্যুর দৃশ্যেও এক আদিম জীবনচেতনা ব্যক্ত হয়। রেবতীর "মুই সোনার নক্কি ভেসিয়ে দিতে পারবো না। মারে মুই কনে যাব রে? সাহেবের সঙ্গে থাকা যে মোর ছিল ভালরে।" এই গভীর ক্ষেদোক্তির মধ্যে ক্ষেত্রমনির মৃত্যু আরো গভীর ও মর্যাদাময় হয়ে ওঠে।

নীলদর্পণ নাটকের অনেকগুলি প্রধান অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে তোরাপ ও ক্ষেত্রমনি এই দুটি চরিত্র বিশিষ্টতার অধিকারী। তার কারণ, গোলোক বসু বা নবীনমাধবের পাশে যে কৃষক সম্প্রদায় দেখা দিয়েছে, তাদের আন্তরশক্তিব অধিকার পেয়েছে এই দুটি চরিত্র। অন্য চরিত্রগুলির মর্যাদা এতে হীন হয় না। বরং এদেরই পাশে ভদ্র স্ত্রী-পুরুষ চরিত্রগুলিও বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। তোরাপের নির্ভীক সারল্য, প্রভুভক্তির সঙ্গে আদিম প্রাণশক্তির প্রাচুর্য তার চরিত্রকে যেমন স্পষ্ট করে তেমনি এক অসহায় পরিস্থিতিতে, অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতায় ক্ষেত্রমনি তার সরল, গ্রাম্য বলিষ্ঠ ধর্মভীরু রূপটিকে তুলে ধরে। তোরাপের পরিণাম নাট্যকার দেন নি কিন্তু বাংলা দেশের কৃষক-জীবন যে একটি সূত্রে গ্রথিত ছিল, সে পরিচয় নাট্যকার দিয়েছেন। মাটিব সঙ্গে জননী মূর্তিকে একত্র দেখেছে বাংলা দেশের কৃষক সম্প্রদায়। নীলকরের উদগ্র লালসার স্পর্শে সেই জননী মূর্তি ক্রমশই বিশীর্ণ ও বিধ্বস্ত হয়েছে। সোনার লক্ষ্মীকে ভাসিয়ে দেওযা ছাড়া অন্য কোন পথ তখন খোলা ছিল না। ক্ষেত্রমনি চরিত্রের গৌরব এখানে যে, নাট্যকার তাকে জীবন্ত ও বাস্তবরূপেই এই মাটির প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে এঁকেছেন। ক্ষেত্রমণির গ্রাম্য বেশেই তার যথার্থ রূপটি ফুটে উঠেছে।

নীলদর্পণ নাটকে করুণ রসের যে প্রাধান্য তা প্রকৃত পক্ষে দীনবন্ধুর স্বভাব ধর্ম নয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে দীনবন্ধু করুণ রসের কাহিনী বা চরিত্র সৃষ্টি করতে অক্ষম। বরং একথাই বলা যায় যে তার অধিকাংশ নাটকে এমন কতকগুলি উপকরণ বা উপাদান আছে যা প্রকৃত পক্ষে করুণ রসেরই। নীলদর্পণ নাটকের কাহিনী ও চরিত্র, নবীনতপস্বিনীর রমনীমোহনের কাহিনী, বিয়ে পাগলাবুড়োর রাজীবলোচনের দুর্গতি, ইত্যাদিতে করুণ রস সৃষ্টির অবকাশ ছিল। দীনবন্ধু ক্ষেত্রবিশেষে সেই অবকাশের সুযোগও

১। মোহিতলাল মজুমদার, **পূর্বোক্ত**, ১১৯-২০।

নিয়েছেন। কিন্তু করুণ রস তাঁর নাটকের প্রাণ নয়। প্রকৃত পক্ষে তাঁর নাটকগুলির কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টিতে এমন সব উপকরণের সাহায্য তিনি নিয়েছেন যার পরিণতি হাস্যরসে। এই হাস্যরস সর্বদাই যে দর্শক ও পাঠকদের উচ্ছল হাসিতে পূর্ণ করে এমন নয়। কখনো কখনো এই হাসির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থাকে এক গভীর বেদনা। অসঙ্গতির তিক্ততা বা ব্যঙ্গের শাণিত বাক্য এ হাসিতে স্নিগ্ধ ও রমনীয় হয়ে ওঠে।১ দীনবন্ধু এই হাসির স্রষ্টা হলেও সব নাটকে উচ্চস্তরের হাস্যরস তিনি সৃষ্টি করেন নি; অথবা সব চরিত্রেই উচ্চস্তরের হাস্যরস সৃষ্টি করা যায় না। দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটকের অন্যতম চরিত্র জলধরকে কেন্দ্র করে এক আশ্চর্য কৌতুককর হাসির সৃষ্টি হয়েছে।

নবীন তপস্বিনী নাটকের জলধর চরিত্রের সঙ্গে Merry Wives of Windsor নাটকের Falstaff চরিত্রের মিল অন্য অধ্যায়ে লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য Falstaff-এর বাগ্‌ বৈদগ্ধ জলধর চরিত্রে নেই। জলধর-জগদম্বা'র কাহিনীটি মূল কাহিনীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার জন্যে যোজিত হলেও এই কাহিনীই নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। তার কারণ জলধর জগদম্বা চরিত্রের স্বভাব ও দৈহিক বিকৃতি।

জলধর বিগত যৌবনা জগদম্বার স্বামী ও রাজমন্ত্রী। রাজধানীর বিভিন্ন নারীর প্রতি সে লুব্ধ। কামবাসনা চরিতার্থ করার উপায় করে নেওয়ার মত বুদ্ধিমান জলধরের মধ্যে কাব্য প্রতিভাও আছে। প্রকৃত পক্ষে নাটকে জলধরের যে চাক্ষুষ পরিচয় তা নয়ন রোচক নয় অথচ তার সমস্ত অসঙ্গত, দুর্নৈতিক আচরণের মধ্যে এমন একটি সহজ বাক্‌চতুর রসিক মানুষ আছে যার সবটাই আমাদের খারাপ লাগে না। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে জলধরের আবির্ভাব হয়েছে নাটকে। পূর্ববর্তী দৃশ্যে মালতী ও মল্লিকার কথোপকথনে, রাজা রমনীমোহনের বড়রাণীর আত্মহত্যা ও বিবাহের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। এই দৃশ্যে জলধর রাজার উদ্যানে এসেছে মালতীর দেখা পাওয়ার জন্যে।

"জলধর। মালতী এই রমনীয় উদ্যানে জলক্রীড়া করিতে আসে, আমি

১। The laughter of satire is a blow in the back or the farce. The laughter of comedy is impersonal and of unrivalled politeness, nearer a smile, often no more than a smile. It laughs through the the mind, for the mind directs it; and it might be called the humour of the mind.

Meredith, George, *Essay on the Idea of Comedy and of the Uses of Comic Spirit*. 1912, 46

ত্রিভঙ্গ হোয়ে এই খানে দাঁড়াই, শিস্ দিতে থাকি, বংশীধ্বনি বিবেচনা করে সেই রমনিমনি রাধাবিনোদিনী আমার নিকটে আসবেন।

(শিস্ দেওন) বংশীধারীর মত আর কিছু থাক্ না থাক্ বর্ণটি আছে। এই তো রূপ, এতেই জগদম্বার গৌরব কত, এমন স্বামী, যেন আর কারো হয়নি, একথা একদিকে সত্য বটে। আমার যেমন রূপ, আমার জগদম্বারও ততোধিক।"

মালতীর প্রত্যাশারত জলধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বিদ্যাভূষণের। "মন উচাটন, মালতী কারণ, কই দরশন পাই গো তার" এই গানের পর মালতী মল্লিকার সঙ্গে দেখা হয়েছে জলধরের। মালতী-মল্লিকার সঙ্গে কথোপকথন রত অবস্থায় হঠাৎ আবির্ভূত হয় জগদম্বা।

"জগদম্বা। ও পোড়া কপালীর বেটা, এই তোমার রাজবাড়ী যাওয়া, তোমার আর মরণের জায়গা নেই, ঘাটের পথে পোড়া কপাল পোড়াচ্চে।"

"জলধর। (মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে) ওঁরাই আমারে ডেকে গোটা কত কথা জিজ্ঞেস কচ্ছেন, আমি কি কারো দিকে উঁচু নজরে চাই?"

বংশীধারীর সঙ্গে তুলনারত জলধর নিজেব বর্ণ সম্পর্কে সচেতন এমন কি জগদম্বার রূপ বর্ণনায় স্বামী হিসেবে কিছু নিষ্ঠুরও। মালতী মল্লিকার সঙ্গে বসিকতার মাঝখানে আকস্মিক জগদম্বার আবির্ভাবে জলধরের চকিত পরিবর্তনটুকুও লক্ষ্মণীয়। বস্তুত জলধরের লাম্পট্যের চিত্রকে দীনবন্ধু এক স্নিগ্ধ হাস্য কৌতুকের প্রলেপ দান করেছেন। মালতীর গৃহে সদাগরের মিথ্যা অনুপস্থিতির সুযোগে যে জলধর নিগৃহীত ও অপমানিত হয়, তা তার প্রাপ্য শাস্তি; কিন্তু কোথাও জলধরের এই অসংগত ও অসামাজিক আচরণে পাঠক-চিত্ত প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে না। বরং এই পরিস্থিতির কৌতুককরতায় কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটবে দর্শক ও পাঠক সেটি কল্পনা করে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাক্চতুর, কামুক, রসিকতাপ্রিয় জলধর, পাঠক ও দর্শকের দৃষ্টিতে জলধরমূর্তি পরিত্যাগ করে হোঁদলকুৎকুতে রূপান্তরিত হয়। যে জলধর মল্লিকাকে মা-র সম্ভাষণ করতে বাধ্য হয়েছিল সেখানে জগদম্বার সম্মার্জনী কাজ করেছে। আবাব মালতীর গৃহে উপস্থিত জলধর নেপথ্যে রতিকান্তের গলা শুনে বলেছে "মালতী, আমার মাতা খাও দোর খুল না, আমি লুকুই, দোহাই তোমার, দোহাই তোমার, জগদম্বারে রাঁড় করো না"। জলধরের অন্যায় আচরণ ও তার শাস্তি উভয়ই যেন এই কৌতুককর পরি-স্থিতিতে অন্তরালবর্তী হয়েছে। তার অন্যায়ের একটি ক্ষীণ আভাস যেন পাঠক ও দর্শকের মনের মধ্যে একান্তে আছে—মালতী মল্লিকার শাস্তিকে গ্রহণ করে জলধর এক অফুরন্ত হাসির রাজ্যে উপস্থিত করে পাঠক ও দর্শককে। মুখোস দেওয়া, গুড় আলকাতরায় অভিষিক্ত, তুলো, শোন, আবির মাখা জল-

ধরকে খাঁচার মধ্যে বন্দী হতে হয়েছে। আরব দেশোদ্ভূত হোঁদলকুৎকুতের স্বভাবের সঙ্গে আমাদের অপরিচয় আছে বলেই নাট্যকারের পক্ষে হাস্যরস সৃষ্টির এক বিশিষ্ট সুযোগ হয়েছে।

নবীনতপস্বিনী নাটকে জলধরের দুর্নৈতিক ও অসঙ্গত আচরণ দীনবন্ধু হাস্যরসিকের দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন বলেই তার চারিত্রিক অসঙ্গতি আমাদের সামাজিক চৈতন্যকে আলোড়িত করতে পারে না। জলধরের প্রতি আমাদের সহানুভূতি না থাকলেও নাট্যকারের সহানুভূতি আছে। আর তারই ফলে জলধর নিজের রূপগুণ সপর্কে সচেতন। লৌহপিঞ্জরে বন্ধ জলধরকে পরিত্যাগ করে বাহকেরা পলায়ন করার পর জলধরের কথাটি স্মরণযোগ্য—'বাপ লাটির গুতো হতে ত্রাণ পেলেম। আঃ কি প্রেম করিচি: প্রেমের পিত্তি টেনে বার করিচি।' বস্তুত, তার লাম্পট্যের সঙ্গে এক বাক্‌চতুর রসিক মনের মিশ্রণ হয়েছে বলেই তার সমস্ত অসঙ্গতিগুলি সাধারণ অসঙ্গতির ঊর্ধ্বে ওঠে। জলধরকে মুক্তি দেওয়ার আগে রাজা জিজ্ঞাসা করেছিল—"ইতিপূর্বে তোমার রসিকতায় কোন রমণী বশীভূত হয়েছিল?"

জলধর। শত শত।

রতিকান্ত। একবার জগদম্বাকে ডেকে আনি"।

অপমানিত ও প্রহৃত যে জলধর রাজার প্রশ্নের উত্তরে 'শত শত' নারী বশীভূত করার কথা বলে সেই জলধর রতিকান্তের কথার উত্তরে বলে—"সদাগর মহাশয় তুমি আমার ধর্ম বাবা, আমায় রক্ষা কর, এর উপরে ঝাঁটা হলে আর আমি প্রাণে বাঁচবো না"।

ব্যক্তি জলধর ও রাজগৃহে মন্ত্রী জলধর প্রকৃতপক্ষে দুই ভিন্ন মানুষ। জগদম্বার স্বামী জলধরের একনিষ্ঠ পত্নীপ্রীতি ও বিনম্রতার সঙ্গে আর এক জলধর এসে দাঁড়ায়: যার পরিণতি হোঁদলকুৎকুতের রূপে। মনে হয় শুধুই সামাজিক আচার-আচরণের অসঙ্গতি নয় জলধর চরিত্রের মধ্যেই এই দুটি রূপের সহাবস্থান ছিল। দীনবন্ধুর কৌতুকদৃষ্টি সেই অসঙ্গতিকে এক আশ্চর্য উচ্ছল হাসিতে রূপান্তরিত করে জলধরকে এক অখণ্ড মূর্তিতে রূপদান করেছেন। নবীন তপস্বিনীর জলধর চরিত্রের অফুরন্ত কৌতুক বিয়ে পাগলা বুড়োর রাজীবলোচন চরিত্রে[১] ব্যঙ্গাত্মক রূপ পরিগ্রহ করেছে।

১। বিয়ে পাগলা বুড়োর রাজীবলোচন জীবন্ত চরিত্র। মধুসূদনের ভক্তপ্রসাদের চেয়ে রাজীব আরো বেশি বাস্তব এই কারণে যে, শেষ পর্যন্ত দীনবন্ধু তাকে অনুতপ্ত reformed চরিত্রে পরিণত করেননি। কেবল রাজীব নয়, রামমনি, পেঁচোর মা, পাড়ার ছেলেরা সকলেই বাস্তব জগতের রক্ত মাংসের মানুষের মতই সত্য।
অজিত দত্ত, পূর্বোক্ত, ১২১-২২।

এখানে নিছক হাস্যরসের বা কৌতুকরসের সৃষ্টি নয়—সেই সংগে সামাজিক দায়িত্ব পালনের চেষ্টাও নাট্যকারের দিক থেকে কাজ করেছে। বৃদ্ধ রাজীবলোচনের বিবাহের ইচ্ছা ও গ্রামের স্কুলের ছাত্রদের কৌশলে সেই বিবাহ ইচ্ছার ব্যর্থ পরিণতি এই নাটকে দেখানো হয়েছে।

দার পরিগ্রহের মধ্যে যে সামাজিকতার প্রকাশ তা একটি বিশেষ বয়সে অসংগত নয়—কিন্তু নিতান্ত বৃদ্ধের মধ্যে এই ইচ্ছা জাগ্রত হলে তা স্বভাবতঃই অন্য অর্থে গৃহীত হতে পারে। বিয়ে পাগলা বুড়োর রাজীবলোচন গ্রামের প্রধান, সামাজিক আচার-আচরণের নিয়ামক, গ্রামের ছাত্রদের সংগে ও প্রতিবেশীদের সংগে সদ্ভাবহীন। নিতান্ত শিশুদের কাছেও তার বিবাহ বাসনার কথা অপ্রকাশিত নয়। "বুড়ো বামনা বোকা বর, পেঁচার মাকে বিয়ে কর"—এই ছড়া শুনতে পেয়ে যে রাজীবলোচন তাদের ছুটে ধরতে যায় সে অসমর্থ। কিন্তু তাদের প্রতি রাজীবলোচনের মনোভাব গোপন থাকে না—'যম নিদ্রাগত আছেন, এত বালক মরচে তোমাদের মরণ হয় না—কি বলবো দৌড়াতে পারিনে তা নইলে একটি একটি ধরি আর খাই।' বৃদ্ধের এই মানসিকতার মধ্যে একটি স্নেহশূন্য রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজীবলোচনের ইচ্ছা ও কার্যের, দেহ ও শক্তির মধ্যে এমন এক অসংগতি আছে যা একদিকে তার অসহায় করুণ রূপটি ও অন্যদিকে সেই অসহায় অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হবার ব্যর্থ চেষ্টাকে তুলে ধরে। প্রথম অংকের দ্বিতীয় গর্ভাংগে রাজীবলোচন নিজেই সেই অবস্থার বর্ণনা করে।

"রাজীব। পেঁচোর মা বেটীই আমাকে বুড়ো করে তুলেছে, গ্রামময় রাষ্ট্র করে দিয়েছে ওর যখন বিয়ে হয় আমি তখন মল্লিকদের বাড়ী গোমস্তাগিরি কর্ম করি—কি ভয়ানক কথা ব্যক্ত করেছে। আমার কলোপ, কালাপেড়ে ধুতি, কৌশল সব বৃথা হল একথা মনের ভিতর আন্দোলন করিলেও হানি হতে পারে।

মন! প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হও, বিবেচনা কর আমি বিশ বৎসরের নবীন পুরুষ, আমি ছোলাভাজা কড়্ মড়্ করে চিবিয়ে খেতে পারি, আমি দৌড়ে বেড়াতে পারি, আমি সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে পারি, আমি ষোড়শী প্রেয়সীকে অনায়াসে কোলে তুলে লতে পারি। বেটীকে দেখলে আমার অংগ জ্বলে যায়, তা নইলে কিছু টাকা দিয়ে বেটীকে বল্‌তে বলি পেঁচো যে বার মরে সেইবার আমি হই—আবার ভারত ছাড়া বেটীর নাম কচ্চি, বেটীর মুখ ভংগিমা মনে হলে হৃৎকম্প হয়।"

বিবাহের কথায় ও পেঁচোর মার উল্লেখে রাজীবলোচনের ক্ষিপ্তপ্রায় মূর্তিটি প্রায় উন্মাদ একটি চিত্র উপস্থিত করে। তার চরিত্র যে শুধুই

বিবাহ দৃশ্যে বা পরিণতির দৃশ্যে স্পষ্ট হয়েছে এমন নয়। তার চরিত্রের অসঙ্গতি হল সে বার্ধক্য পীড়িত—সেই বৃদ্ধত্বকে অস্বীকার করে যে রাজীবলোচন যৌবনকে গ্রহণ করতে চায় সেখানেই এই চরিত্রটি নিজেকে করুণ রূপে প্রকাশ করে। কখনো কখনো হাস্যরসাত্মক নাটকের এই কারুণ্যে tragedy-র সুরও ধ্বনিত হয়ে ওঠে।১ বস্তুত সামাজিক আচার-আচরণ বহির্ভূত অসংগত বিবাহ ইচ্ছার পরিণতি ছাড়াও বার্ধক্যকে অস্বীকার করার এক ব্যর্থ প্রয়াস এই নাটকের অন্তরালে কাজ করেছে। রাজীবলোচনে তারই প্রকাশ।

বিষয়ী ও বুদ্ধিমান রাজীবলোচন জলধরের মতই কাব্যরসিক। মিথ্যা বিবাহ-বাসরে নববধূর বেশে রতার সঙ্গে রাজীবলোচনের কথোপকথন প্রবল হাসির সৃষ্টি করে। কিন্তু এই হাসির অন্তরালে এক গভীর বেদনাও স্পষ্ট। দীনবন্ধুর হাস্যরস সৃষ্টির পরিচয় দিতে গিয়ে মোহিতলাল মজুমদার এই প্রহসনটির আশ্রয় নিয়েছেন। "বিয়েপাগলা বুড়ো যখন আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে বিবাদ করিয়া, যুবা সাজিয়া, নকল শালি শালাজের কানমলা সহ্য করিবার প্রানপণ চেষ্টা করিয়াও শেষে কাঁদিয়া ফেলে এবং 'মলাম, গিচি, মেরে ফেল্লে — রামমনি!' বলিয়া তাহার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পালয়িত্রী ও রক্ষয়িত্রী বর্ষীয়সী বিধবা কন্যার নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, তখন এই কৌতুকাভিনয়ের মধ্যেই মুহূর্তের জন্য মানুষের করুণতম অদৃষ্টই হাসিয়া উঠে। নিজ বার্ধক্য অস্বীকার করিয়া যে বৃদ্ধ বিগত যৌবনের অভিনয় করিতেছে, সে যে কিছুতেই জরাকে ফাঁকি দিতে পারিতেছেনা, নিমেষের, মোহও টিকিতেছে না সে যে সত্যই শিশুর মত অসহায় এবং একটুতেই আকুল হইয়া মাতৃস্থানীয়া রামনিকে তাহার স্মরণ করিতে হয়,—নিয়তির সহিত কঠিন সংগ্রামে বিমূঢ় মানুষের এই অবস্থা যেমন হাস্যোদ্দীপক, তেমনই শোকাবহ। কিন্তু এই রীতিমত প্রহসনের দৃশ্যেও যে কল্পনা রাজীবলোচনের মুখে ওই 'ও, রামমনি!', বলাইয়াছে, তাহাকে কি নাম দিব? প্রহসনের মধ্যেও এই রূপ হাস্যরসের দৃষ্টান্ত কি আর কোথাও মিলিবে?"

দীনবন্ধুর পরবর্তী নাটক সধবার একাদশীতে উৎকৃষ্ট হাস্যরস ও কতগুলি বিশিষ্ট চরিত্র দেখা গেছে। এই নাটকের পশ্চাতেও নীলদর্পণ নাটকের মত একটি বিপ্লব কাজ করেছে। অবশ্য নীলদর্পণ নাটকের পটভূমিতে বাংলা দেশের অগনিত কৃষক সম্প্রদায়ের জীবিকা ও সম্মানের যে তীক্ষ্ম প্রশ্ন ছিল,

১। "....the end of a comedy would often be the commencement of a tragedy, where the curtain rise again on the performers. Meredith. George, *Ibid.*

সধবার একাদশীতে তা নেই। প্রকৃত পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের সুরাপান ও বেশ্যাসক্তির যে প্রবল প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তা এ নাটকের পটভূমি। নীলবিপ্লবের মত সুরাপান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিকের ব্যাপ্তি ছিল না এবং উভয় সমস্যার প্রকৃতিও ভিন্ন। সধবার একাদশী নাটকের পটভূমিতে যে সম্প্রদায়ের চিত্র উপস্থিত হয়েছে তা এক আত্মিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। দীনবন্ধুর শিল্পী চৈতন্যে যে সুগভীর সহানুভূতি ও বাস্তবানুরাগ সঞ্চিত ছিল তা তাঁর সামাজিক চৈতন্যকে আবো গভীর করেছে। জীবনের সমস্ত ভালোমন্দ, দ্বন্দ্ব মিলনের অতীত শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের এক অখণ্ড জীবন বোধ সধবার একাদশীতে দেখা গেছে।

সধবার একাদশী সম্পর্কে রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছিলেন যে, "ইহার আদ্যপান্ত কেবল বখামি ও মদের কথাতেই পরিপূর্ণ"। লালবিহারী দে-ও সধবার একাদশীর বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষও সধবার একাদশীকে যোগ্য সম্মান দেন নি। বস্তুত দীনবন্ধুর সমকালে অনেকেই সধবাব একাদশীব নিমচাঁদ চরিত্রকে শিল্প সৃষ্টি হিসেবে গ্রহণ করেন নি। নিমচাঁদ চরিত্র আলোচনা কালে তাদের সামাজিক চেতনা ও নৈতিকতারই প্রকাশ ঘটেছে। এর কারণ সম্ভবত সমকালের প্রভাব। মদ্যপান দোষে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ যে উচ্ছন্ন হতে চলেছিল তাদের চিত্রকে নাটকে উপস্থিত করাটা সেকালে তেমন বরণীয় হয় নি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও দীনবন্ধুর এই সৃষ্টির প্রতি সুবিচার কবেন নি। কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিতে দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ নাটক সম্ভবতঃ সধবার একাদশী এবং শ্রেষ্ঠ চরিত্রও হয়তো নিমচাঁদ। সধবার একাদশীর এই শ্রেষ্ঠতা কোন সামাজিক মূল্যমান থেকে নয় তা সম্পূর্ণ সাহিত্যের দিক থেকে। সধবার একাদশীর নিমচাঁদ ও আবো দু-একটি চরিত্রে এক অখণ্ড শিল্প দৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে।

দীনবন্ধুর নাটকগুলিতে হাস্যরসাত্মক চরিত্রের সংখ্যা যথেষ্ট এবং দীনবন্ধু করুণ ঘটনা ও বিষয়কে এই চরিত্রগুলিতে যুক্ত করেও তাদের করুণ রসের চরিত্র করে তোলেন নি, বরং কারুণ্যের প্রলেপে চবিত্রগুলি কোথাও কৌতুকের, কোথাও অট্টহাস্যের কোথাও বা বেদনা মিশ্রিত হাসির সৃষ্টি করেছে। প্রকৃত পক্ষে সমস্ত হাসির অন্তরালে যে উপকরণটি কাজ করে তার প্রকৃতি ও গুণগত মাত্রার ওপর হাসির, কৌতুকের বা ব্যঙ্গের মাত্রা নির্ভর করে।

লেখকের প্রবণতা অনুযায়ী তাদের সাহিত্যে হাস্যরসের এই বিভিন্ন বিভাগের বিকাশ ঘটে। লক্ষ্য করতে হয় লঘুতরল হাস্যরসের মত করুণ বা

বিষাদের কথাতেই অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিক পারদর্শী। কিন্তু যে বিষাদ গভীর অবক্ষয়ের রূপে ট্রাজেডির পরিণামকে অর্চনা করে বা সমস্ত সুখ-দুঃখের অতীত এক পূর্ণতার বোধে বেদনা মিশ্রিত হাসির সৃষ্টি করে তা বিরল। প্রকৃত পক্ষে শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের সৃষ্টিতে ট্রাজেডির সুরটিও ধ্বনিত হয়।১ দীনবন্ধু এই বিরল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলেই এ হাসির এক করুণ অথচ সম্পূর্ণ পরিণামী পরিচয় নিমেদত্ত চরিত্রে দেখা গেছে।

ধনবান জীবনচন্দ্রের পুত্র অটলবিহারীর অন্যতম ইয়ার নিমচাঁদ। ইংরেজী শিক্ষিত নব্য বঙ্গীয়দের আচার-আচরণ তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। নাটকের প্রথম দৃশ্য থেকেই তার আবির্ভাব। নিমেদত্তের মধ্যে নাট্যকার সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণগুলির সমাবেশ ঘটিয়ে একটি মারাত্মক দোষে দুষ্ট করেছেন।২ ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তার অসাধারণ পরিচয়, সমকালীন সমাজ ও জীবন সম্পর্কে চিন্তা, বাক্‌চাতুর্য ইত্যাদির পাশে এক গভীর বেদনাও তার চরিত্রে আছে। নিমেদত্তের চরিত্রে তাই দুটি স্পষ্ট বিভাগ করা যায়। একদিকে তার ব্যবহারিক জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় অন্যদিকে নিজেকে বিশ্লেষণের প্রকাশ।

নিমেদত্ত দুশ্চরিত্র। নিজের পরিবারের প্রতি কর্তব্যশূন্য হয়ে যত্র তত্র দিন যাপন করে। মদের প্রতি তার আন্তরিক অনুরাগ।

"নিম। (মদ্যপান করিয়া) মদ খেলেই যে রোগ জন্মিবে এমন কিছু বিধান

১। "The stroke of the great humourist is world wide, lights of Tragedy in his laughter."

Meredith, George, *Ibid*, 44.

২। নিমে দত্তের প্রকৃতি হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, হীরকের ন্যায় সারবান ও দুর্লভ। কিন্তু এই হীরকখণ্ড যত্নে রচনা করিয়া বিধাতা কি জানি কি কারণে ইহার মর্মমধ্যে এমন একটি কলঙ্ক বিন্দু নিবেশিত করিয়া এই পাপপুন্যময় সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন যে, সে কলঙ্কবিন্দু ক্রমশ আয়ত হইয়া সমগ্র হীরক দেহকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহার উজ্জ্বলতাকে নিজেরই মালিন্য প্রকাশক করিয়াছে, তাহার স্বচ্ছতাকে নিজেরই ত্রুটি প্রদর্শক করিয়াছে, তাহার বহুমূল্যতাকে পাঠকগণের ক্ষোভ পরিবর্ধক করিয়াছে মাত্র। নিমে দত্ত স্বভাবতঃ সরল, খলদ্বেষী, পবিত্রচেতা, সারবান, বুদ্ধিমান, কিন্তু সুরা-সেবনরূপ এক ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতাদোষ এই সমগ্র গুণকেই ভ্রষ্ট করিয়া তাহার প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়াছে। ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য: সধবার একাদশী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত **সমালোচনা সাহিত্য** (১৩৭০) ১৯৩৩, ১৫০।

শাস্ত্রে লেখা নাই। যদিই জন্মায় তা বলে কি, যে মহাত্মাকে একবার সহায় কল্লেম, যে মহাত্মার অনুকূলতায় জাতিভেদ উঠয়ে দিলাম, তাঁতি, সোনার বেনে, কামার, কুমারকে নিয়ে একাসনে আহার কল্যেম, যে মহাত্মার গুণপ্রভাবে বন্ধু পঞ্চে একত্রিত হয়ে বিমলানন্দ অনুভব কল্যেম, সেই মহাত্মাকে বিনশ্বর অসুস্থতা হেতু পরিত্যাগ করবো?" কিন্তু মদ ক্রয় করার ক্ষমতা তার নেই। অতএব তাকে নির্ভর করতে হয় ধনীর পুত্রদের পর। তারই ভাষায় "বড় মানুসের ছেলে বোটারা এক একটি করে সভ্য হবে, আর আমি ধেনো খেয়ে মরবো। এক ব্যাটা বড় মানুসের ছেলে মদ খেলে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।" নিমচাঁদের মদ্যপানের মধ্যে গৌরবের কিছু নেই কিন্তু মদ্যপ নিমচাঁদ সে সম্পর্কে সচেতন। মদ্যপ ও প্রকৃতিস্থ অবস্থায় অটল, নকুলেশ্বর, রামমানিক্য, কেনারাম ইত্যাদি চরিত্রের মধ্যে নিমচাঁদ তার ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছে তার আত্মিক অবক্ষয়ের জন্যে। অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে যে বিপর্যয় বা শূন্যতাব বোধ আছে তা প্রকৃত পক্ষে বাইরের। এই চরিত্রগুলির মধ্যে কোথাও ব্যক্তি ও সমাজের বা নিজেদের সত্তার দ্বিধাগ্রস্ত রূপ ও দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয় নি। কিন্তু নিমচাঁদ এদিক থেকে ব্যতিক্রম। সুরাপান নিবারনী সভার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে যে নিমচাঁদ পরিণয় নিবারনী সভাব প্রস্তাব দেয়, তার যুক্তি মদ্যপের। "ইতিবৃত্ত খুঁজে খুঁজে দেখা যাচ্ছে কতিপয় বিবাহিতা কামিনী পতিকে প্লান্‌টিন দেখিয়ে উপপতি করেছে এবং দুই একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাতে পত্নী কর্তৃক পতি বিনাশিত হয়েছে সুতরাং বিবাহটা অতি ভয়ঙ্কর। বিবাহ প্রচলিত থাকাতে অস্মদ্দেশে কত বিদ্যাবিশারদ দেশহিতৈষী যুবক কামতুরা কামধুরার হস্তে অকালে মানবলীলা সংবরণ করিতেছেন, কত যুবক রমণীর কু-চরিত্রজাত দুঃসহ ক্রোধানল মনে রাখিয়া যেমন চেয়ারে উপবেশন করিতেছিলেন, অমনি হুস্‌ করে অনল শিখা, হয়ে পুড়ে মরেছেন।" অবশ্য এই লঘু রসিকতার মধ্যে নিমচাঁদের প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত হয় নি। তার স্বভাব মন্দ হলেও তার সমস্ত প্রকৃতিই যে অসৎ এমন নয়। মিথ্যাচার ও মূর্খতার অহংকারকে সে সহ্য করতে পারে না। ইংরেজদের আচার-আচরণে সে বিশ্বাসী। তার মদ্যপানের অনুরোধ অটল প্রত্যাখ্যান করলে তাই শোনা যায় "অফর কল্যে না খেলে যে কত অপমান...কিছু বোঝে না, পাজি চাষা ক্যাডোভেরাস।" আবার অন্যত্র কেনারামের প্রতি "বাবা, কালেজে পড়ে বিদ্বান হয়েছ, ইংরেজী এটীকেট শিখেছ, একজন জেণ্টেলম্যানের অফরটি ত্যাগ করা উচিত নয়।" কিন্তু এ সমস্ত সংস্কার তার ব্যবহারিক জীবনের। মদ্যপানের নেশায় যে নিমচাঁদ অটলের মোসাহেবী করে সে যে প্রকৃত পক্ষে অটল ও তার সঙ্গীদের চেয়ে অনেক বড় এই বোধ তাকে পীড়িত করে।

"নিমচাঁদ, রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্ম-লজ্জা মান-মর্যাদা পরিপন্থী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি, তুমি কি ছিলে, কি হয়েছ। তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ।

'Things at the worst will cease, or else climb upward
To what they were before—'

হা! জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ করিছি, আমাকে অধর্মাকর মদিরা হস্তে নিপাতিত কল্যে। যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়া আহার আহরণ করেছেন, সে পিতা এখন আমায় দেখলে চক্ষু মুদিত করেন ; যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং মুখ চুম্বন করিতে করিতে আপনাকে ধন্যা বিবেচনা কত্তেন, সেই জননী এখন আমায় দেখলে আপনাকে হতভাগিনী বলে কপালে করাঘাত করেন; যে শ্বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন, তিনি এখন আমাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে বসেন: শ্বাশুড়ী আমায় দেখলে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন; শালী শালাজ আমায় দেখলে হাঁসেন—দাঁতে মিসি মধুর হাঁসি। তুমি কে চাও কি, কাঁদো কেন? আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই: কিন্তু সুধাংশুবদনী আমাকে একদিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও বলেন নাই, আমার জন্যে প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুনতে হয় বলে কারো কাছে বসেন না। আহা! আমার নেশা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, আমার কথা নিয়ে সকলে কানা-ক্যানি করছে, কুরঙ্গনয়নী কার্যান্তর ব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্তভাগে বিজন স্থানে করকপোল হয়ে ভাবনা প্রবাহে ভাসমানা আছেন, আলুলায়িত কেশ, লুণ্ঠিত অঞ্চল, অশ্রুবারি নথের মুক্তার গায় মুক্তার ন্যায় দুলিতেছে। কেহ আসচে কি না, একবার ফিরয়ে দেখচেন—মদ কি ছাড়বো? আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সে কালে ভূতে পেতো, এখন মদে পায়—ডাক ওঝা, ডাক ওঝা, ঝাড়য়ে আমার মদ ছাড়য়ে দেক্, আমি সুরধনী সভায় নাম লেখাব, কারো কথা শুনবো না।"

নিমচাঁদের এই আত্মবিশ্লেষণাত্মক উক্তিতে তার নিজের চরিত্রটি স্পষ্ট হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নিমচাঁদের সমস্ত আচার-আচরণ ও কথাবার্তার অন্তরালে অন্য একটি গভীর বেদনা আছে কিন্তু তা পারিবারিক জীবনের সাধারণ ব্যর্থতা নয়। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে নিমচাঁদ চরিত্রকে যে অর্থে

গ্রহণ করা হয়েছে তা যথার্থ নয়।১ ঐ গ্রন্থে নিমচাঁদের 'Thou sticketh a dagger in me' অটল কি গালাগালি তুই দিলি"। এই উক্তির ওপর নির্ভর করে লেখক বলেছেন, "সমগ্র প্রহসনের মধ্যে ইহার সর্ব প্রধান চরিত্র নিমচাঁদের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে এই সামান্য আভাসটুকু মাত্র পাওয়া যায়। নিমচাঁদের সমস্ত আচরণের মধ্যেই তাহার জীবনের এই প্রচ্ছন্ন বেদনার অভিব্যক্তিই প্রকাশ পাইয়াছে। এইটুকু বুঝিতে পারিলে তাহার চরিত্রের প্রতি ঘৃণা অপেক্ষা সমবেদনাই অধিক হয়। এই সম্পর্কে অনতিকাল ব্যবধানে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের একটি চরিত্রের কথা উল্লেখ করিতে পারি। তাহা দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র। ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনই দেবেন্দ্রনাথের চারিত্রিক অধঃপতনের মূল। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন 'যদি কখনও স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ কর্ণে শুনি তবে মদ ছাড়িব, নচেৎ এখন মরি বাঁচি সমান কথা।'

নিমচাঁদের দাম্পত্য জীবনের যে আভাসটুকু আমরা পাইলাম, তাহাতে তাহার পক্ষেও বাঁচা মরা সমান কথাই ছিল।" নিমচাঁদের দাম্পত্য জীবনের কোন প্রত্যক্ষ চিত্র এই নাটকে নেই এবং স্বভাবতই নিমচাঁদ চরিত্র সম্পর্কে একটি প্রামাণিক কথা বলার জন্যে তার সামগ্রিক রূপটি গ্রহণ করা দরকার। পূর্বে উল্লেখিত নিমচাঁদের দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি নিমচাঁদের যে ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে তার গুরুত্ব গভীর। নিমচাঁদের ব্যর্থতার কারণ যে তার পত্নী নয়, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বস্তুত স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মর্যাদাবোধ ঐ অংশে দেখা গেছে। স্বভাবতই নিমচাঁদের এই উক্তিতে একটি অন্য মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। নিমচাঁদের কল্পনার যে স্ত্রীর রূপটি ফুটে ওঠে তা স্নেহে, প্রেমে, ভক্তিতে বাঙগালী গৃহবধূর। অধঃপতিত নিমচাঁদের পক্ষে সেই স্ত্রীর কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। দুশ্চরিত্র নিমচাঁদ সর্বস্তরে নিম্নগামী হয়েও স্ত্রীকে সম্মান করে, এখানেই তার মহত্ব এবং এই বোধ থেকেই তার চরিত্রের রূপটি আমাদের শ্রদ্ধা ও সহনাভূতির বিষয় হয়ে ওঠে। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিমচাঁদের তুলনাটিও অসম। দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবনের ব্যর্থতার মূলে তার স্ত্রীর দায়িত্ব অনেকখানি এমন ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন কিন্তু নিমচাঁদের ব্যর্থতার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে কারণ মাদক। অতএব নিমচাঁদের ব্যর্থতার মধ্যে যদি কোন বিশেষ কারণ উপ্ত হয়ে থাকে তা প্রকৃত পক্ষে এক অসহায় বোধজনিত এবং দীনবন্ধুর গভীর সহানুভূতিতে তার চরিত্রের দ্বন্দ্ব এক অখণ্ডতাকে প্রকাশ করেছে।

১। 'নিমচাঁদের সমগ্র জীবনের ব্যর্থতার জন্য তাহার দাম্পত্য জীবনই যে দায়ী সমগ্র নাটকের মধ্যে তাহার অস্পষ্ট আভাস মাত্র আছে।'

আশুতোষ ভট্টাচার্য, **বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস**, ১ম খণ্ড, ১৯৬০, ২৭০।

বস্তুত নিমচাঁদ চরিত্রের মধ্যে যে বিষাদ ও বেদনার প্রকাশ তা তার পরিবেশ, শিক্ষা, বাচনভঙ্গী ও পরিণতির মাধ্যমে এমন এক বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় দেয় যা উচ্চতর কল্পনাশক্তির। নিমচাঁদের সমস্ত আচার-আচরণের মধ্যে যে ব্যক্তিত্বটি স্পষ্ট হয় তা নিছক হাস্যরসকে প্রাধান্য দেয়নি বরং তার ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার ব্যর্থতাকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে। প্রকৃত পক্ষে নিমচাঁদ চরিত্রে সমাজ ও ব্যক্তিচেতনার এক গভীর দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে বলেই তা এত গম্ভীর। সুরার শৃংখল থেকে মুক্ত হবার চেষ্টায় তার এক অসহায় রূপ এই নাটকে আছে। হাস্যরসিকের দৃষ্টিতে দীনবন্ধু সেই সত্যকে নিমচাঁদ চরিত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন। নিমচাঁদের বেদনা তাই অনেক সময়ই ব্যক্তি অতীত এক সমাজের বেদনাকে পরিস্ফুট করেছে। তার চরিত্রের বেদনা-মিশ্রিত হাস্যরস এক নতুন জগতের সৃষ্টি করে। সূক্ষ্ম ও স্থূলের সমন্বয়ে নির্মিত জগতের এক-একটি দিক উন্মুক্ত হয়ে ওঠে। "For humour, frown upon it as will, is nothing less than a fresh window of the soul. Through that window we see, not indeed a different world, but the familiar world of our experience distorted as if by the magic of some tricky sprite." ১ প্রকৃত পক্ষে নিমচাঁদ এই 'fresh window of the soul'-কেই তুলে ধরে।

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য সধবার একাদশী প্রবন্ধে নিমচাঁদ চরিত্র আলোচনায় উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন এই ভাষায়—"নিমেদত্ত ইহ শরীরে নরকযাতনা-ভোগের আশ্রয় স্বরূপ। পাপী ব্যক্তি কি প্রকার নরক যাতনা ভোগ করে, তাহা দেখাইতে হইলে কাজেই নরকোচিত উপকরণের আবশ্যক হয়। নিমেদত্তের প্রকৃতি দুইটি পরস্পর বিসম পদার্থে রচিত। তন্মধ্যে একটি দেবোচিত, একটি পিশাচোচিত। পিশাচোচিত ভাগ প্রবল হইয়া দেবোচিত, ভাগকে পরাভূত করিয়াছে, দেবোচিত ভাগ পরাভূত হইয়াও রোষানল বিস্তারপূর্বক পিশাচোচিত ভাগকে তাড়না করিতেছে; দেবোচিত ভাগ রোষানলকে আরো উজ্জ্বল করিতেছে। আরও প্রখর করিতেছে। এই নিমেদত্ত, এই নরক, 'সধবার একাদশী' প্রহসন বটে, কিন্তু পাঠকের মনে আক্ষেপ জন্মাইবার পক্ষে এই প্রহসনের অপেক্ষা অধিক কার্যকরী গ্রন্থ অল্প দেখিয়াছি।"

দীনবন্ধুর পরবর্তী নাটকে সধবার একাদশীর মত উচ্চ কবিকল্পনার প্রকাশ ঘটেনি। যদিও বংকিমচন্দ্র লীলাবতী নাটকের প্রশংসা করে লিখেছিলেন—

---

1. Knox, Ronald A., 'On Humour and Satire', Jepson, R.W., *New And Old Essays,* 1939, 206

"লীলাবতী বিশেষ যত্নের সহিত রচিত, এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প।" সধবার একাদশীর নিমচাঁদ চরিত্রে যে বেদনা ও হাস্য-রসের সমাহার, তা বিশুদ্ধ হাস্যরসিকের; কিন্তু লীলাবতীর নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ চরিত্রে সেই বিশুদ্ধ হাস্যরস নেই। বস্তুত হেমচাঁদ নদেরচাঁদ চরিত্রের অসংগতিতে কৌতুক ও বিদ্রূপের মিশ্রণ হয়েছে এবং তার পরিণতিও মিশ্র ধরনের হাসিতে। হেমচাঁদ নদের চাঁদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও দৈহিক বর্ণনায় কৌতুকরস কাজ করে, কিন্তু তা যেহেতু এক বিশেষ সামাজিক আচারের সংগে যুক্ত, সেই হেতু এই চরিত্র দুটির অন্তরালে দীনবন্ধুর সামাজিক চৈতন্যও কখনো কখনো প্রকাশিত হয়েছে। হেমচাঁদ, নদেরচাঁদ চরিত্র পাঠকের কাছে যে আবেদন সৃষ্টি করে তার সবটাই উচ্ছল কৌতুকরস নয় কিছুটা ব্যংগ রসও।

হেমচাঁদ-নদেরচাঁদ লীলাবতী নাটকের অপ্রধান চরিত্র হয়েও আবেদনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট। তার কারণ এই দুটি চরিত্রের স্বভাব ও প্রকৃতিতে এমন এক সহজাত হাস্যকরতা আছে যা পাঠককে হাস্যোচ্ছল করে তোলে। Aristotle-এর কমেডি সম্পর্কে বক্তব্যটি এই প্রসংগে স্মরণ করা যায়। তিনি বলেছেন '....it is an imitation of men worse than the average; worse however, not as regards any and every sort of fault, but only as regards one particular kind, the Ridiculous, which is a species of ugly. The Ridiculous may be defined as a mistake or deformity not productive of pain or harm to others; the mask, for instance, that excites laughter, is something ugly and distorted without causing pain."[১]

এরিস্টোটল যে অর্থে 'Ridiculous'-এর ব্যবহার করেছেন তাকে ঠিক হাস্যকর এই অনুবাদ করা যায় না। কেননা তার সংগে এমন ত্রুটি বা বিকৃতি জড়িয়ে আছে যা বেদনাদায়ক বা পীড়াদায়ক নয়। বস্তুত সব ধরনের হাসিতেই বেদনা বা পীড়া থাকলেও তার প্রকাশ পীড়িত করে না। তা নির্ভর করে বেদনার মাত্রার ওপর। হেমচাঁদ নদেরচাঁদের চরিত্রে এমন এক অসংগতি আছে যা Aristotle কথিত Ridiculous কে স্মরণ করায়।

নদের চাঁদ হেমচাঁদ লীলাবতী নাটকে হাস্যরসের প্রধান উৎস। উভয়ের সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের। এদের আচার আচরণ, কথাবার্তার মধ্যে পূর্ববর্তী নাটকের বাক্‌চাতুর্য ও ইন্দ্রিয়তন্ত্রতার সূত্রটি যেন গ্রথিত হয়ে আছে। দুটি চরিত্রকে আপাত দৃষ্টিতে একই ছাঁচে নির্মিত বলে মনে হয় কিন্তু নদেরচাঁদের উপাদানে

১। Bywater, Ingram, *op. cit,* 33

গঠিত হয়েও হেমচাঁদ চরিত্রে ও প্রকৃতিতে একটু স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই এই চরিত্র দুটির ভিন্ন পরিচয় আছে। নদেরচাঁদের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হবার পূর্বে নদেরচাঁদ লীলাবতীকে দেখতে চায়। সেই বিষয়ে হেমচাঁদের সঙ্গে তার কথোপকথন হচ্ছে—

"হেম। তুমি যারে দেখতে চাচ্চো সিদ্ধেশ্বর তারে দেখেছে।

নদে। লুকুয়ে?

হেম। না, সিদ্ধেশ্বরের সুচরিত্র বলে ললিতের সঙ্গে যেতে পেয়েছিল।

নদে। এবারে এক্সচেনঞ্জ থেকে একখান সুচরিত্র কিনে আনবো, গায় দিয়ে লোকের বাড়ীর ভিতর যাব।

হেম। তার দাম কত।

নদে। কত?

হেম। গোজন্ম পরিত্যাগ।

নদে। ঠিক বলিছিস—আমাদের যে নাম বেরুয়েছে, আমাদের দেখে বেশ্যারাও ঘোমটা দেয়, মাগ মরে অবধি গৃহস্থের মেয়ের মুখ দেখিনি, কি ঝিউড়ি, কি বউ। তোমার মাগটিই কেঁচে কনে বউ হয়েছেন, আমায় দেখলে আদহাত ঘোমটা দেন।

হেম। আমি বলে দিইচি, তোমার সঙ্গে আবার কথা কইবে। মাও ভর্ৎসনা করেছেন।

নদে। মামী মামার কুনকী হাতী ছিলেন তা জানিস তো?

হেম। কুচ্ছ কথা নিয়ে তোর যত আমোদ। তুই ক্রমে ক্রমে ভারি বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছিস। ও সব কথা ভাল লাগে না।

নদে। তবে যে বড় দেখাতে চাচ্চিস্?

হেম। আমার স্ত্রীর কাছে সে বসে থাকবে। সেই সময় দেখাব, তাতে আমি দোষ ভাবিনে।

নদে। চিরজীবি হয়ে থাক, তোমার কল্যাণে আজ খেমটির নাচ দেব, মদের শ্রাদ্ধ করব।

হেম। বেশ কথা।"

এই অংশের মধ্যেই দুটি চরিত্রের স্বভাব ও প্রকৃতিগত মিল ও পার্থক্যটুকু সূচিত হয়েছে। হেমচাঁদ নদেরচাঁদের মত নাটকের অন্যান্য পাত্র-পাত্রীদের কাছে নিগৃহীত হয়নি। প্রকৃত পক্ষে নদেরচাঁদের দৈহিক রূপবর্ণনায় শ্রীনাথের সঙ্গে নদেরচাঁদ হেমচাঁদের কথোপকথনে, পাত্রী দর্শনে, নদেরচাঁদ হেমচাঁদের এক গ্রাম্য ও অশালীন চিত্র প্রকটিত হয়েছে। অবশ্য, "হেমচাঁদ নদেরচাঁদের মত মূর্খ ও দুর্বৃত্ত নয়। শিথিল চরিত্র হইলেও সে শারদা সুন্দরীকে ভালবাসে,

এবং নদেরচাঁদের প্ররোচনায় 'ঘরেরমাগকে খেমটাওয়ালী' করিতে রাজি নয়। সুতরাং গুলির আড্ডায় তাহার নিন্দা শোনা যায় 'নদেরচাঁদ যে বলে হেমাকে হেমার মাগ খারাপ কল্লে তা মিথ্যে নয়।' স্ত্রীকে অপমান ও বয়াটে বৃত্তির চূড়ান্ত করিয়া তাহার বাক্স উলটাইয়া হেমচাঁদ তাহার সঞ্চিত টাকাগুলি জবরদস্তি করিয়া লইয়া গেল বটে, কিন্তু সেই নৈপুন্য রচিত কৌতুক দৃশ্যের মধ্যেই আবার তাহার মুখে আক্ষেপোক্তি শুনিতে পাই 'ভারি বদ ইয়ার!' এখানে তাহার প্রতি যেমন শারদাসুন্দরীর, তেমনি হাস্যরসিক নাট্যকারেরও ক্ষমাশীল প্রীতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।"১

এই নাটকে কুলীন পাত্র হিসেবে নদেরচাঁদের নিগৃহীত রূপটি পাঠকের কৌতুক জাগায়। নদেরচাঁদ হেমচাঁদের বিবাহ ও বঙ্গভাষা সম্পর্কিত বক্তৃতায় এই চরিত্র দুটির সমস্ত অসংগতি এক প্রবল কৌতুককর উচ্ছ্বসিত হাসির সৃষ্টি করে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "উনপাজুরে বরাখুরে।" নদেরচাঁদ হেমচাঁদ তাদের সমস্ত চারিত্রিক স্খলন পতন সত্ত্বেও শুধুমাত্র হাস্যরস সৃষ্টির জন্যেই পাঠকের দৃষ্টিতে স্নেহসিক্ত হয়ে ওঠে। এখানেই দীনবন্ধুর চরিত্র সৃষ্টির কৃতিত্ব।

চরিত্র সৃষ্টির এই বিশিষ্টতা পরবর্তী নাটক জামাই বারিককেও উজ্জ্বল। অভয়-কামিনী, পদ্মলোচন-বিন্দু-বগলা ইত্যাদি চরিত্রগুলিতে দীনবন্ধু কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও কতগুলি অপ্রধান চরিত্রে তার প্রকাশ অনেক বেশি। নীলদর্পণ নাটকে বা নবীন তপস্বিনী নাটকে যেমন যথাক্রমে রায়ত ও বেহারাদের পরিচয় আছে এবং নাম উপাধিবিহীন হয়েও সামান্য দু একটি কথায় নিজেদের চরিত্রকে পরিস্ফুট করেছে, তেমনি জামাই বারিককেও অনুরূপ চরিত্রের বিকাশ দেখি। পার্থক্য শুধু এই যে এরা সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষাব ক্ষেত্রে ভিন্ন। কিন্তু গোষ্ঠীর কোন বিশেষ চরিত্র থাকলে এই নাটকের জামাইদের চরিত্রে তা আছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে দীনবন্ধু জামাই বাবিক নাটকেব জামাইগুলিব সংগে নীলদর্পণের রায়ত সম্প্রদায় ও নবীনতপস্বিনীর বেহারাদের মিল খুঁজে পেয়েছেন। বস্তুত এদের চরিত্র ভিন্ন। সামান্য দু-একটি কথায় গোষ্ঠী জীবনের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেও নিজেদেব স্বাতন্ত্র্যকে এরা প্রকাশ করতে পারে। সেক্সপীয়রের নাটকে জনতার চরিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে এবং সেখানে জনতার সম্মিলিত চরিত্র ছাড়াও প্রতিটি মানুষের স্বতন্ত্র চরিত্র আছে। নীলদর্পনের কৃষকেরা বা নবীনতপস্বিনীর চার জন বেহারার সাধারণ চরিত্র রায়ত বা বেহারা মাত্র; কিন্তু এই পরিচয়ই তাদের শেষ পরিচয় নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের কথাবার্তায় তাদের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়েছে।

১। সুশীলকুমার দে, **দীনবন্ধু মিত্র,** (১৩৫৮) ১৯৫১, ৬১-৬১।

জামাইবারিকের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম,ও ষষ্ঠ জামাইয়ের সাধারণ পরিচয় ধনবানের গৃহের জামাতা। এদের সকলেই বিভিন্ন মাদক দ্রব্যের বশীভূত, অকর্মন্য ও অপদার্থ। নিজেদের গৃহে সুখ ও বিলাসের উপকরণ না থাকার ফলে শ্বশুর মন্দিরকে জীবনের সার পদার্থ বলে মনে করে। ওদের সকলকে থাক্‌তে হয় একত্রে বহির্বাটির একটি ঘরে। এদের সকলের স্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। সাক্ষাৎ করার জন্যে অন্দরমহলের কর্ত্রীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট নামে পাশ দেওয়া হয়। দীনবন্ধু এই চরিত্রগুলিকে তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে স্বতন্ত্র রূপে আঁকতে পেরেছেন। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক থেকে সেই পরিচয় নেওয়া যাক্।

কেশবপুর জামাই বারিকে চারজন জামাই উপবিষ্ট। এদের কথোপকথনে একটি বিশেষ রূপ আছে।

"প্রথম জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) আমি ভাই আজ একমাস বাড়ীর ভিতর যাইনি, প্রেয়সী আমাকে ডাইভোর্স কল্লেন নাকি।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) হয়েছিল কি?

প্রথম জা। বাল্‌সেছিলেন তা আড়াই দিনে সেরে গিয়েছে, আজ একমাস কুঁড়ে পাতর লুস্‌চেন, বরমা পনির মত ছুটে বেড়াচ্ছেন, আমি বাড়ীর ভিতর যেতে চাইলেই গিন্নি বলেন কাহিল।

তৃতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) কদিন এখানে ছিলাম না, এর মধ্যে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে দেখ্‌ছি যে, পাসগুলিন থাকে কোথা?

চতুর্থ জা। গিন্নির ঘরে। যারে যারে তিনি বোঝেন বাড়ীর ভিতর যাবার যোগ্য, তার তার নামের পাস পাঁচির কাছে দেন, পাঁচি জল খাওয়ার সময় দিয়ে যায়।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) বিনা পাসে যাবার যো নাই?

তৃতীয় জা। না।

দ্বিতীয় জা। কোন দিন চেষ্টা করেছিলে?

তৃতীয় জা। আমি একদিন বিনা পাসে যাবার চেষ্টা করেছিলাম। মাজের দরজার দরওয়ান ব্যাটা পাস দেখ্‌তে চাইলে, দেখাতে পাল্লেম না। অর্ধচন্দ্র আহার করে ফিরে এলেম।

প্রথম জা। (গাঁজা টিটিপিতে টিপিতে) সময় না হলে তার আমাদের দরকার হয় না।

আমরা যেন ভাই কুক্‌সাহেবের আড়গড়ার মেল গ্যাণ্ডার ফিমেল গুস্‌—

দ্বিতীয়ী জা। সাবাস দাদা বেশ বলেছ—কি বল্‌বো গাঁজা টিপছি তা

নইলে শেক্‌হ্যাণ্ড কত্তেম—নেভার মাইন, কেনি দাও, (কনুইতে কনুইতে ঘর্ষন) শালা বাবুদের পাশ নাই?"

চারজন জামাইদের গাঁজা টেপার সাধারণ দৃশ্যে প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষ্য করার মত। এদের সকলেই অন্দর মহলে প্রবৃষ্ট হতে চায় সেদিক থেকে এরা সকলেই একই কষ্টের অধিকারী। কিন্তু প্রথম জামাই যে দীর্ঘ একমাস বাড়ির ভেতর যায়নি, সেদিক থেকে তার যন্ত্রণা অন্যদের চেয়ে অধিক হতে পারতো। কিন্তু প্রথম জামাইয়ের সহ্যশক্তির চেয়েও অন্য একটি বৈশিষ্ট্য আছে, তা তার রসিক চিত্ত। তাই 'প্রেয়সী আমাকে ডাইভোর্স কল্যেন নাকি' এই কথায় একটি প্রসন্ন মনের প্রকাশ ঘটে। দ্বিতীয় জামাই যে কিছু-কাল অনুপস্থিত ছিল তার সংবাদ এখানে আছে তাই তার মধ্যে খবর সংগ্রহের কৌতুহল। তার প্রশ্নের উত্তরে প্রথম জামাই যে ভঙ্গীতে স্ত্রীর অসুস্থতার খবর দেয় সেখানেও সেই প্রসন্ন রসিকচিত্তের প্রকাশ। তবে কিছুটা বেদনাও যেন সেখানে মিশে আছে। তৃতীয় জামাইয়ের আক্ষেপ দীর্ঘদিন বিরহের নয়—দশ দিনের। দশ দিন ধরে জামাই বারিকের বরগা গোনা ছাড়া অন্য কোন কাজ তার নেই। তার নামের পাশটিও যে দেওয়া হয় না সেখানেও এক আক্ষেপের ধ্বনি আছে। চতুর্থ জামাই সংবাদ পরিবেশনে পটু। সংবাদ সে রাখেও। তাই পাশ কোথায় থাকে, এর উত্তর দিতে গিয়ে গিন্নির ঘরে, একথা বলেই থেমে যায়নি। জামাইয়ের যোগ্যতা অনুযায়ী যে পাসগুলি দেওয়া হয়, সে কথাও সে বলে। দশ দিনের বিরহী বিমর্ষ তৃতীয় জামাই যে বিনা পাশে অন্দরে প্রবৃষ্ট হতে গিয়ে অপমানিত হয়েছে—একথা অন্যদের কাছে স্বীকার করতে সে সঙ্কুচিত হয় না। প্রথম জামাইয়ের কথায় লঘু হলেও এক অপ্রত্যাশিত হাসির সৃষ্টি হয়। "আমরা যেন ভাই কুক্‌ সাহেবের আডগড়ার মেলগ্যাণ্ডার ফিমেল গুস্‌"-কথার এই অদ্ভুত উপমায় প্রথম জামাই তাদের দুঃখকষ্টের অতীত হাস্যরসিকের জগতে উত্তীর্ণ হয় আর এই কথার সমর্থন করে যে দ্বিতীয় জামাই "নেভার মাইন কেনি দাও" বলে, তারা জামাই বারিকের অন্য সমস্ত জামাইদের মধ্যে অনন্য। পঞ্চম জামাইয়ের "সাত কাণ্ট রামায়ণ" বর্ণনার যে কাহিনী যা তারই ভাষায় "বোল্লিকের রামায়ণ বাল্মীকির সঙ্গে মিলবে কেন?" অথবা ষষ্ঠ জামাইয়ের মাণিক পীরের গান বস্তুত জামাই বারিকের বহু বিচিত্র জীবনের মধ্যে একই অনন্যতার দাবী করে।

দীনবন্ধুর সর্ব শেষ নাটক কমলে কামিনী নাটকের কাহিনী ও চরিত্র পূর্ববর্তী নাটকগুলির মত নয়। কমলে কামিনীর বক্কেশ্বর চরিত্র অন্য চরিত্র-গুলির মধ্যে একটু বিশিষ্ট হলেও তার স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন নেই।

দীনবন্ধুর এই সাতটি নাটকে অজস্র চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে। গ্রাম ও সহরের সাধারণ ও বিশিষ্ট মানুষ, নীলকর ও কর্মচারী, রায়ত রাজা, রাজ কর্মচারী, বিদূষক, ঘটক, জমিদার, ছাত্র, পণ্ডিত, নেশাখোর, সদাগর, উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট ব্রহ্মচারী ইত্যাদি পুরুষ চরিত্র এবং রাজ পরিবার ও রাজ পরিবার-ভুক্ত, সম্ভ্রান্ত ও চাষি পরিবারের স্ত্রী চরিত্র দীনববন্ধুর নাটকে আছে। এদেরই পাশে স্থান গ্রহণ করেছে পদী ময়রাণী ও কাঞ্চনের মত বারনারীরা।

এই দীর্ঘ আলোচনায় মাত্র কয়েকটি চরিত্রের আলোচনা হল এবং তাদের অধিকাংশই অপ্রধান চরিত্র। বস্তুত অন্য প্রধান চরিত্রগুলির পাশে এরা এত বিশিষ্ট যে নাটকে প্রধান স্থান গ্রহণ না করেও এরা প্রাধান্য পেয়েছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে অন্য চরিত্রগুলির আলোচনা মূল্যহীন। প্রকৃত পক্ষে কোন চরিত্রই ব্যর্থ নয়, যদি সে তার নিজস্ব রূপটি প্রকাশ করতে পারে। দীনবন্ধু এক অখণ্ড শিল্প দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন বলেই তাঁর সৃষ্টিতে এই চরিত্রগুলিও অনন্যসাধারণতা লাভ করেছে। পূর্বোক্ত আলোচনায় দীন-বন্ধু-সৃষ্টির সেই পরিচয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য চরিত্র-গুলি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা চলতে পারে।

দীনবন্ধু নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলি কম বিশিষ্ট নয়। নীলদর্পণ নাটকের রেবতী, দেওয়ান গোপীনাথ ও পদী ময়রানী, নবীন তপস্বিনীর বিদ্যাভূষণ, সুরমা, মালতী, মল্লিকা, বিয়ে পাগলা বুড়োর রতা, রামমণি ও পেঁচোর মা, সধবার একাদশীর জীবনচন্দ্র, ভোলা, রামমানিক্য, কেনারাম, কাঞ্চন, সৌদামিনী ও কুমুদিনী, লীলাবতীব শ্রীনাথ, ললিত, সারদা ও লীলাবতী, জামাই বারিকের পদ্মলোচন, বিন্দু, বগলা, কমলে কামিনীর শিখণ্ডীবাহন বক্কেশ্বর, গান্ধারী, ও রণকল্যাণী উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "দীনবন্ধু আহ্লাদপূর্বক সকল শ্রেণীর সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য-প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্য বর্ষীয়সী, তোরাপের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নসীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে, নিমচাঁদের মত সহুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগরবিহারী গ্রাম্যবাবু, কাঞ্চনের মত মনুষ্য-শোণিত-পায়িনী নগর-বাসিনী রাক্ষসী, নদেরচাঁদ হেমচাঁদের মত 'উনপাঁজুরে বরাখুরে' হালসহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডেপুটি, নীলকুঠির দেওয়ান, আমীন, তাগাদাগীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর মা, কাওরানীর মত লোকের পর্যন্ত তিনি নাড়ীনক্ষত্র জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন, আর কোন বাঙ্গালী লেখক

তাহা তেমন পারে নাই।"১ বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর তীব্র সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে দীনবন্ধুর কবিত্বশক্তির প্রকাশ এমন এক অখণ্ডতায় যে, জীবনের সর্বস্তরে তা ব্যাপ্ত হতে পেরেছিল; তারই প্রকাশ একদিকে যেমন রেবতীর মাতৃহৃদয়ের সুগভীর বেদনাকে প্রকাশ করে, তেমনি অন্য দিকে দেওয়ান গোপীনাথের নির্মমচরিত্র এবং বেদনাহত রূপটিকে একটি কথায় স্নিগ্ধ ও হাস্যোজ্জ্বল করে তোলে। নীলকর উড়ের কাছে পদাহত গোপীনাথ বলে "কি পদাঘাতই করেছে, বাপ! বেটা যেন আমার কালেজ-আউট বাবুদের গোন পরা মাগ"। আবার এই শক্তিই দুশ্চরিত্রা পদী ময়রানীর মধ্যে এক মহত্তর হীনতাকে লক্ষ্য করে। পদী ময়রানীর "ও মা, কি লজ্জা! বড়-বাবুকে মুখখান দেখালাম", সত্য সত্যই তার আন্তরিক লজ্জাকে প্রকাশ করে। অথবা রোগ সাহেবের গৃহে যে পদী রোগকে বলে "ছোট সাহেব ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ি যাক্ তখন আর একদিন আসবে" তা আন্তরিক হয়ে কানে বাজে। দীনবন্ধুর অধিকাংশ নারী চরিত্র তা সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত যে পরিবারেরই হোক না কেন এক শান্ত গৃহমুখী চিত্রকে পরিস্ফুট করেছে। বিদেশী নাটকের সংগে দীনবন্ধু-নাটকের নারী চরিত্রগুলির এখানে পার্থক্য।২ লক্ষ্য করতে হয় সধবা, বিধবা ও বারনারী তাঁর নাটকে আছে। এদের কেউ কেউ বয়স্কা গৃহকর্ত্রী—অধিকাংশই যুবতী। এদেরই পাশে দাসী বা পরিচারিকাশ্রেণীও দেখা গেছে। নীলদর্পণের সাবিত্রী, নবীন তপস্বিনীর সুরমা ব্যক্তিত্বসম্পন্না গৃহের একমাত্র কর্ত্রী। এদেরই আশ্রয়ে বর্ধিত হয়েছে সৈরিন্ধ্রী, সরলতা,

(১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, **রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা।** ১৮৭৬।

২ The heroines of Comedy are like women of the world, not necessarily heartless from clear-sighted : they seem so to the sentimentally reared only for the reason that they use their wits and are not wandering vessels crying for a captain or a pilot. Comedy is an exhibition of their battle with men and that of men with them : and as the two, however divergent, both look on one object, namely life, the gradual similarity of their impressions must bring them to some resemblance. The Comic poet dares to show us men and women coming to their mutual likeness ; he is far saying that when they draw together in social life their minds grow liker ; just as the philosopher discerns the similarity of boy and girl, until the girl is marched away to the nursery.

Meredith, George, *Ibid.* 15.

কামিনী। পতির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায়, গৃহের সকলের প্রতি সেবায় ও কর্তব্যে আদর্শ গৃহবধূর মূর্তি এদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন দীনবন্ধু। আবার নারীর অন্যরূপকেও প্রত্যক্ষ করেছেন মালতী মল্লিকার উচ্ছ্বসিত যৌবন-শক্তিতে, রসিকতায়। মালতী মল্লিকার কৌতুকে পাঠকচিত্ত যেন উচ্ছল হয়ে ওঠে। নাট্যকার বিশেষ করে মল্লিকার মধ্যে এক রসিকা যুবতীকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বিগতা যৌবনা সন্দেহগ্রস্তা জগদম্বার ভাষায় 'মালতীকে আমার ভয় হয় না, ও খুব ধীর শান্ত। আমার ভয় করে ঐ মল্লিকে ছুঁড়ীকে। ছুঁড়ী যেন আগুনের ফুলকি, যার চালে পড়বে তার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে।' মল্লিকা সম্পর্কে জগদম্বার কথার শেষ অংশটুকু পরীক্ষিত সত্য নয় কিন্তু এক অফুরন্ত কৌতুক রসে সে যে চঞ্চল তার প্রকাশ এ নাটকে আছে। মল্লিকা চরিত্রের এই উচ্ছলতা সধবার একাদশীর সৌদামিনী ও বিশেষ করে কুমুদিনী চরিত্রে দেখা গেছে। কুমুদিনীর দাম্পত্য জীবনের ব্যার্থতার প্রতি-ক্রিয়া হিসেবে ব্যাঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর যে প্রকাশ সধবার একাদশীতে ঘটেছে তা প্রকৃতপক্ষে বাক্‌চাতুর্য ও তির্যক রসিকতায় আশ্চর্য সজীব। রাজ-কন্যা রণকল্যাণীর মধ্যে অসাধারণত্ব নেই এবং লীলাবতীর ভালোবাসার রোম্যান্টিক চেতনা রনকল্যাণীর চরিত্রে কাজ করেছে। বিন্দু-বগলার কলহে যে দুই সপত্নীর পরিচয় ব্যক্ত হয় তা তীব্র ও তিক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের পরিণতির নীরবতা বিস্ময়কর। পদ্মলোচনের স্বামীত্বের অংশ নিয়ে যাদের প্রাত্যাহিক কলহ সমস্ত নৈতিকতাকে অস্বীকার করে—পদ্মলোচনের গৃহ-ত্যাগের পর তারাই যখন সমস্ত বিবাদ পরিত্যাগ করে সন্ধি করে, তখন এই মিলনও যেন করুণ হয়ে ওঠে। সধবার একাদশী ও জামাই বারিকের অন্যতম কয়েকটি চরিত্র নিমচাঁদের পাশে ম্লান মনে হলেও তাদের বৈচিত্র্য কিছু কম নয়। মূর্খ ডেপুটি কেনারামের পরিচয়, অথবা ভুল ইংরেজীতে বাক্যালাপরত ভোলা কিংবা পূর্ববঙ্গের ভাষা ব্যবহারকারী রামমাণিক্য, পদ্মলোচন ইত্যাদি চরিত্র হাস্যরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

দীনবন্ধুর নাটকগুলিতে যে অসংখ্য চরিত্রের পরিচয় তাদের অধিকাংশই শিল্প হিসেবে সার্থক সৃষ্টি। তাঁর গভীর সহানুভূতি ও সর্বশ্রেণী সম্পর্কে অভিজ্ঞতার সঙ্গে এক পরিণত শিল্পবোধ ছিল। সেই শিল্পবোধ একজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের হওয়ায় সমাজের ভালোমন্দ উচ্চ নীচকে এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছে। Comedy রচয়িতার সামাজিক কর্তব্য তাঁর নাটকে কাজ করেছে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে ব্যঙ্গ অথবা বিদ্রূপের কশাঘাতের চেয়ে এক স্নিগ্ধ মনোরম হাসির প্রকাশই বেশি। সমালোচকের কথা অনুসরণ

করে বলা যায়—“নাটকীয় কল্পনায় কোন চরিত্রই সামান্য থাকে না, সকল চরিত্র সমান মূল্যবান। তাই দীনবন্ধুর নদেরচাঁদ ও তাহার সৃষ্ট আর কোন চরিত্র হইতে নিকৃষ্ট নহে; এখানে আদর্শের কথা নাই, রুচির কথা নাই, কাব্য সৌন্দর্যের কথা নাই—আছে কেবল ব্যক্তি-চরিত্রের কথা। এই নদেরচাঁদও আমাদের আকৃষ্ট করে কোন গুণে? এত বড় একটা দুশ্চরিত্র মূর্খও আমাদের রসবোধ তৃপ্ত করে কেমন করিয়া? সে কি কেবল নিষ্ঠুর ব্যাঙ্গের পাত্র হইয়া? না লেখকের উদার হাস্যরসে অভিসিক্ত হইয়া সেও তাহার মনুষ্য সুলভ দুর্বলতার প্রতি আমাদের সজ্ঞানে না হউক অজ্ঞানে আত্মীয়তা আকর্ষণ করে ইহাই দীনবন্ধুর হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য। বাংলা নাটকে এ বৈশিষ্ট্য আর কাহারও নাই।” দীনবন্ধু-নাটকের চরিত্রগুলি এই হাস্যরস থেকেই সৃষ্ট ও বিকশিত হয়েছে।

উপসংহার

দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলির প্রাণ হাস্যরসে। একমাত্র নীলদর্পণ নাটক তার ব্যতিক্রম। কিন্তু নীলদর্পণের নিষ্ঠুর পটভূমিকা ও বিষাদান্ত পরিণাম সত্ত্বেও তার মধ্যে কখনো কখনো এক করুণ হাস্যরসের প্রকাশ হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে হাস্যরসের যে কয়েকটি প্রধান সাধারণ বিভাগ আছে (Humour, wit, satire এবং fun), বিভিন্ন লেখক তাঁদের রুচি ও জীবনদৃষ্টি অনুযায়ী এক এক ধরনের হাস্যরসের প্রতি আকৃষ্ট হন। কমেডি রচয়িতার দৃষ্টিতে জীবন-সম্পর্কিত অখণ্ড ধারণা থাকলে এই সব বিভাগগুলিই ধরা দেয়। দীনবন্ধুর নাটকগুলিতে হাস্যরসের এই প্রকাশ বিভিন্নভাবে ফুটে উঠেছে। কোথায়ও তার কাহিনী বা চরিত্রের পরিণতিতে পাঠকের মন বেদনাবিহ্বল হয়ে ওঠে না। জীবন রসিকের দৃষ্টিতে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে সমস্ত অসংগতি ও বিদ্রূপের জ্বালা। কোথাও অফুরন্ত কৌতুক, কোথাও বাক্‌চাতুর্যের হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তি, কোথাও বা ব্যঙ্গের স্মিত অথচ অপ্রত্যাশিত প্রকাশ, সর্বোপরি হাসি ও বেদনার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ তাঁর নাটকগুলিতে দেখা গেছে। ছোট ও বড় সাতটি নাটকের কাহিনী ও শতাধিক চরিত্রে হাস্যরসের প্রকাশও ঘটেছে বিচিত্রভাবে। দীনবন্ধুর হাস্যরস সৃষ্টির কৌশল তাই বিস্ময়ের বোধ জাগায়।

সূক্ষ্ম বা স্থূল যে কোন হাস্যরসের মূল কারণ অসংগতি। সে অসংগতি বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হতে পারে। হাস্যরস সৃষ্টির এই কৌশলে দীনবন্ধু-নাটকের অসংগতিগুলিকে যে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়, চারিত্রিক অসংগতি তার মধ্যে অন্যতম। নীলদর্পণ থেকে সুরু করে কমলে কামিনী নাটকের যে চরিত্রগুলির কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে তাদের চারিত্রিক অসঙ্গতিই প্রকৃত পক্ষে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। বিয়ে পাগলা বুড়োর বৃদ্ধ রাজীবলোচনের বিবাহের ইচ্ছার মধ্যে এমন একটি অসংগতি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। বয়স ও মর্যাদা অনুযায়ী তার যে আচরণ করা উচিত তা বিস্মৃত হয়ে সে যে নিজেরই দেহ ও মনের বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করে ও পরিশেষে লাঞ্ছিত হয়, এই অসংগতিই বিভিন্ন ঘটনায় এক প্রবল কৌতুকোচ্ছল হাসির সৃষ্টি করে। এই নাটকের পেঁচোর মা চরিত্রেও অনুরূপ অসংগতি আছে। বৃদ্ধ রাজীব-লোচন তার নাম উচ্চরণে তিক্ত হয়ে উঠলেও রাজীবলোচনকে বিবাহের জন্যে সে আগ্রহ প্রকাশ করে। সামাজিক মর্যাদাতে নিতান্তই অসম হয়েও পেঁচোর মার বিবাহ ইচ্ছায় এক কৌতুককর মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে, নবীন তপস্বিনীর জলধর জগদম্বা উভয় চরিত্রেই এই অসংগতি আছে। বস্তুত

তারাই যথার্থ যোগ্য পতি পত্নী। কিন্তু নারী বা পুরুষের মোহ বা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির রূপ যৌবন তাদের নেই এবং সে সম্পর্কে জলধর অন্ততঃ সচেতন কিন্তু এই সচেতনতা একমাত্র তার স্ত্রীর ক্ষেত্রেই। মালতীর রূপ চিন্তায় নিজেকে যেরূপে সে প্রকাশ করে তা তার পদমর্যাদা বা সামাজিক মর্যাদার বিরোধী। জলধর চরিত্রে অবশ্য আন্তরিক দ্বন্দ্ব নেই বরং নিমচাঁদ চরিত্রের দ্বন্দ্ব গম্ভীর। মদ্যপানাসক্তির হাত থেকে মুক্ত হবার চেষ্টায় এক অসহায় রূপ নিমচাঁদ চরিত্রে আছে। প্রকৃত পক্ষে চারিত্রিক অসংগতি যে কোন চরিত্রের একটি বিশিষ্ট গুন। অসংগতি থাকার ফলেই তাদের রূপটি আদর্শ নয়—বাস্তব। দীনবন্ধুর নাটকে এই বাস্তব চরিত্রের পরিচয় স্বল্প নয়।

চারিত্রিক অসংগতি প্রকৃত পক্ষে কোন বিশেষ অবস্থা বা মানসিকতার ওপর সব সময় নির্ভরশীল নয়। হাস্যসৃষ্টির কৌশল বহু বিচিত্র উপকরণে নির্মিত হতে পারে। অনেক সময় fun বা কৌতুকরস সৃষ্টির জন্যে এমন কতকগুলি উপকরণ গ্রহণ করা হয় যা লঘু তরল হাসির সৃষ্টি করে। কোথাও কোথাও তা carricature ধর্মীও হয়ে ওঠে। অংগভংগীর সাহায্যে এই হাস্য-রস প্রকাশিত হতে পারে। নবীন তপস্বিনীর জলধর চরিত্রে এই অংগভংগীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। রাজার উদ্যানে ত্রিভংগ হয়ে দণ্ডায়মান জলধব মালতীর প্রতীক্ষারত, তার শিস্ দেওয়া, মালতীর বেশধারিনী জগদম্বার কাছে জলধরের হামাগুড়ি দেওয়া বা পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় জলধরের জন্তুসুলভ চিৎকার ও অংগভংগীতে প্রবল কৌতুক, হাস্যরসের উচ্ছাস তার চরিত্রকে বিশিষ্ট করে তোলে। সমার্জনী হস্তে জগদম্বার রূপেও অনুরূপ কৌতুককর হাস্যরস প্রকাশিত হয়। বিয়ে পাগলা বুড়োর রাজীবলোচনের প্রহারের দৃশ্যে চপেটা-ঘাত ও সমার্জনীর ব্যবহারে, নববধূর বেশে রতার পদযুগল ধারণরত রাজীব-লোচনের ভঙ্গীতে, দীনবন্ধু হাস্যরস সৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করেছেন। সধবার একাদশীর ভোলা, রামমানিক্য ও নিমচাঁদের মদ্যপ অবস্থাতে অভিনয়ের সময় অংগভংগীর বিশেষ আশ্রয় নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। অবশ্য লীলাবতীর হেমচাঁদ ও কমলেকামিনী নাটকের বক্কেশ্বরের তুলনায় জামাইবারিকে এই কৌশল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও বিশিষ্ট হয়েছে। জামাইবারিকে অঙ্গভংগীর সাহায্যে হাস্যরস সৃষ্টির এই প্রয়োগ-কৌশল পদ্মলোচনকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত। অভয়কুমারের ভাষায়, "কি দাদা হরগৌরী হয়ে বসে রয়েছ যে অর্দ্ধেক অংগে তেল দিয়েছ অর্দ্ধেক অংগ রুক্ষ রেখেছ।" দৃশ্যপট উত্থিত হবার পর পদ্মলোচনকে অর্ধাংগ তৈলসিক্ত অবস্থায় দেখে এক প্রবল কৌতুকের সৃষ্টি হয়, তার ব্যক্তিগত জীবনের করুণ ও হাস্যকর উপাদানগুলিও যেন একত্রে ভেসে ওঠে।

অন্যান্য হাস্যরসিকের মতই দীনবন্ধুর হাস্যরস সৃষ্টির আর একটি অন্যতম কৌশল বাক্‌ভঙ্গী ও বাচনভঙ্গী। কণ্ঠস্বরের গ্রাম পরিবর্তন ও বাচনভঙ্গীর বিশিষ্টতায় দীনবন্ধুর অনেকগুলি চরিত্র হাস্যকৌতুক ও বাক্‌-বৈদগ্ধের সৃষ্টি করেছে। জলধর-পত্নীর ভাষা ব্যবহারে, বিয়ে পাগলা বুড়োর মেয়েদের ছদ্মবেশে, বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে, সধবার একাদশীর ভোলার বিকৃত ইংরেজীতে, জামাই বারিকের বিন্দু-বগলার কলহে, কণ্ঠের স্বরগ্রামের ওঠা-নামাকে লক্ষ্য করা যায়। এই কথাবার্তার মধ্যে কলহ, ক্রোধ এবং ব্যঙ্গের এমন এক অসঙ্গতি আছে যা হাস্যরসের সৃষ্টি করে। অবশ্য বাচনভঙ্গী আরো বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে। জলধরের ভাষায় যা কৌতুককর, নিমচাঁদের ভাষায় তা তীব্র দ্যুতিতে ভাস্বর। মালতীর গৃহে তার স্বামীর মিথ্যা প্রস্থানের পর গুড়ের জালা থেকে যে জলধর বেরিয়ে আসে তার মুখে মুখোস।

"মল্লিকা। ওটা কিসের মুখোস।

মালতী। ওটা হোঁদলকুৎকুতের মুখোস।

জলধর। একথা নিয়ে খুব আমোদ কত্তে পাত্তেম, যদি ঠিক জানতেম যে, ব্যাটা আর আসবে না, আমার এক প্রকার হৃৎকম্প হয়েছে।"

জলধরের বাচনভঙ্গীতে এক নির্দোষ কৌতুকের ভাব আছে। এমন কি, নিজেকে নিয়েও সে কৌতুক করতে পারে। নিমচাঁদ অবশ্য শুধু দীনবন্ধু-নাটকের নয়, সমগ্র বাংলা নাটকের বাচনভঙ্গীর ক্ষেত্রে অসাধারণত্ব পেয়েছে। "নিমেদত্তের আকর্ষণ কাটানো সহজ নয়, সে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে witty মাতাল, আর প্রকৃতিস্থের মধ্যেও কি সাহিত্য-জগতে কি বাস্তব-জগতে তার মত বাগ্‌বাণিজ্যের রথচাইল্ড একান্ত দুর্লভ। অটলবিহারী মদের মায়া কাটাইতে পারে নাই, কাঞ্চনের মায়া কাটাইতে পারে নাই। এসবের মূল বোধ করি নিমেদত্তের বাগ্‌বৈভবের মায়া"১। নিমেদত্তের এই বাক্‌চাতুর্য অনেক ক্ষেত্রেই হাস্যরসের সৃষ্টিতে অক্ষম হয়েছে। নপুংসকের সাহায্যে ভুল করে কুমুদিনীকে ধরে আনার পর রামধন কর্তৃক নিমচাঁদকে প্রহার দৃশ্যের একটু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—

"রাম। হারামজাদা, পাজি, মদ খেলে আর চোকে কানে দেখতে পাও না?

নিম। (রামধনের কিল খাইতে খাইতে) Once-Twice-Thrice. Out আবার মারে দূর ব্যাটাচ্ছেলে, তোর যে আউট হয়ে গেছে—

রাম। তোমার মাৎলামিটে বার কচ্চি। (কানমলন)

(১) প্রমথনাথ বিশী, **বাংলা সাহিত্যে নরনারী** ১৯৫৩

নিম। "As tedious as twice told tale" কানমলা যে একবার হয়ে গেছে, ও আর ভাল লাগবে কেন?

রাম। দূর ব্যাটা পাজি। (গলা টিপে)

নিম। That's repetition too—গলাটিপি হয়ে গেছে বাবা, এখন আর কিছু টেপো।

রাম। এখন তোমাকে সন্দেশ কিনে দিই।

নিম। কেন বাবা জিনিষগুলো নষ্ট করবে, মদের মুখে কোন শালা সন্দেশ খেতে পারে না।

রাম। হারামজাদা ব্যাটারা, বসে মদ মারবেন আর লোকের সর্বনাশ করবেন।

নিম। আমরা তো মদ মারি, অপনি যে মাতাল মারেন।

রাম। মেরে মেরে তোমার হাড় গুড়ো করবো। (প্রহার)

নিম। ইতি কর না বাবা, যথেষ্ট প্রহার হয়েছে, পুতি বেড়ে যাচ্ছে—উপসংহারের কাল উপস্থিত। রামবাবু আপনি অতি বিজ্ঞ, অনেক পরিশ্রমে বিদ্যালাভ করেছেন, মহাশয়ের কিলকলাপ কি পর্যন্ত জ্ঞানপ্রদ, তা যারা অধ্যয়ন করেছে, তারই বলতে পারে, আপনার পদাঘাত পুঞ্জ প্রকৃত পীযূষ—"And the last, though not the least," আপনার অর্ধচন্দ্রগুলিন যার-পর নাই Edifying. আপনার অর্ধচন্দ্রে আমার বুদ্ধি যেরূপ মার্জিত হয়েছে, Lock on Human Understanding পড়ে এরূপ হয়নি।"

নদেরচাঁদ-হেমচাঁদের বাচনভঙ্গীতেও অনুরূপ হাস্যরসাত্মক উদ্দেশ্য কাজ করেছে। কমলেকামিনী নাটকের বক্কেশ্বরও কোথাও কোথাও এই ভঙ্গীতে ভাষা ব্যবহার করেছে। দীনবন্ধু তাঁর নাটকের পাত্র-পাত্রীদের প্রকৃত চরিত্র অবহিত ছিলেন এবং তাদের মুখের ভাষাও তিনি জানতেন। স্বভাবতঃই বাচনভঙ্গীও তাই তাঁর নাটকে হাস্যরস সৃষ্টির একটি বড় কৌশল হয়ে দেখা দিয়েছে।১

বিবিধ পোষাক ও বিশেষ করে পরিস্থিতি হাস্যরসাত্মক নাটকের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে। দীনবন্ধু তাঁর নাটকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ না দিলেও অনুমান করা যায়, যে রাজা, জমিদার-কৃষক, শহরে বাবু, অন্তঃপুরচারিণী নারী, বালক প্রভৃতির চরিত্র অনুযায়ী তাদের পরিচ্ছদের কথা ভেবেছেন। কিন্তু হোঁদলকুৎকুতে বেশী জলধরের রূপ, বৃদ্ধ রাজীবলোচনের বিবাহ বেশ, চাঁপার যোগজীবন ও বিভিন্ন ব্রহ্মচারীর বেশ, কামিনীর তপস্বিনী ও রনকল্যাণীর সখীর বৈষ্ণবিণী বেশ, অনেক ক্ষেত্রে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

১। দ্রষ্টব্য ঃ দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের ভাষা

অবশ্য এই হাস্যরসের প্রকৃতি এক নয়। আবার হাস্যরস সৃষ্টির কৌশল অনেকখানিই পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। এই পরিস্থিতি যেহেতু নাটকের, তাই, এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় অনেকখানি স্থান আলোকিত হয়ে ওঠে। মালতী-মল্লিকার সঙ্গে কথোপকথনরত অবস্থায় জলধরের সামনে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় জগদম্বা, কিংবা মালতী মনে করে যে জলধর জগদম্বার নিন্দে করে—সেখানে আকস্মিক অবগুণ্ঠন সরে যাবার পর আবির্ভাব হয় জগদম্বার। জলধরের দীন, বিনীত ও আর্ত মূর্তিটি এক প্রবল কৌতুকে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিবাহ-সভায় নকল যুবক সেজে রাজীবলোচনকে সহ্য করতে হয় শালী শালাদের নির্যাতন। কর্ণমর্দনের যন্ত্রণায় রামমনির নাম করে যে রাজীবলোচন কেঁদে ওঠে তার চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই পরিস্থিতিতে। মত্ত অবস্থায় গোকুলবাবুর গৃহের সামনে শুয়ে 'envious' দরওয়ানের মৃত্যু কামনা করে যে নিমচাঁদ, বারনারীদ্বয়, বৈদিক ও জীবনচন্দ্র এবং পরিচারিকার সঙ্গে সাক্ষাতে ও কথোপকথনে করুণ ও হাস্যের এক যুগপৎ মিশ্রণে সে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। বিন্দু-বগলার হাতে যে চোরটির পৃষ্ঠদেশে মধ্য রাত্রির শান্তি ভঙ্গ হতে থাকে, যেখানে হঠাৎ আবির্ভূত হয় পদ্মলোচন। দুই স্ত্রীর এই আচরণ ও আক্ষেপ নতুন কৌতুকে জ্বলে ওঠে। বক্কেশ্বরকে চোখ বেঁধে নিজেদের সৈন্য-শিবিরে এনে প্রহারের ব্যবস্থা,—এই পরিস্থিতিতেও কৌতুক-হাসির প্রাচুর্য আছে। প্রকৃত পক্ষে শক্তিশালী নাট্যকারের লক্ষ্য বিশেষ কোন ঘটনা বা চরিত্রের প্রতি নয়, তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাটকের সামগ্রিক অসঙ্গতির প্রতি। দীনবন্ধুর নাটকে এই অসঙ্গতি হাসির অন্তরালে নিবিড়।

দীনবন্ধুর নাটকের সংখ্যা স্বল্প, কিন্তু বৈচিত্র্যময়। বস্তুতঃ তাঁর প্রতিভা নাট্যকারেরই। এমন কি কাব্যরচনাও নাটকেরই হয় প্রস্তুতি, নয় পরিপূরক। ছাত্র-জীবনের কবিতা লেখার পর্বে ও পরিণত নাট্যশিল্পে যে দীনবন্ধুর প্রকাশ, তা একটি প্রবাহ। কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের আসরে একটি অপরিণত কবিচিত্তের প্রকাশ। সব শক্তিমান কবিশিল্পীর মতই দীনবন্ধুরও প্রথম আবির্ভাব কাব্যের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সূচনায় তাঁর শিল্পী চিত্তের পরবর্তী ইঙ্গিত অলক্ষিত থাকেনি।১ কবিতা-যুদ্ধের আসরে একটি তরুণ কবি-চিত্তের বিক্ষোভ ধ্বনিত হয়েছে। কাব্যের কল্পলোকের চেয়ে কাহিনীর বাস্তবধর্মে ও চরিত্র-চিত্রণে দীনবন্ধু আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁর পরবর্তী সাহিত্য সৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রেরণা হয়েছে, এই সময়েরই লেখা একটি কবিতা। আবার

১। দ্রষ্টব্য ঃ দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম জীবনের কবিতা

দ্বাদশ কবিতা ও সুরধুনী কাব্যে যুগযন্ত্রণায় অস্থির এক কবিকে দেখা গেছে। ব্যক্তি-জীবনের সুখ-দুঃখ, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, পারিবারিক স্নেহের ও কর্তব্যের যে অস্পষ্ট প্রকাশ প্রথম জীবনে রচিত কবিতাগুলিতে স্পষ্ট নয়, তা দ্বাদশ কবিতায় মূর্ত। ব্যক্তির নিবিড় অনুভবধন্য হয়েছে বলেই 'দ্বাদশ কবিতা' অপরিচিত হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর এক উল্লেখযোগ্য রচনা। সুরধুনী কাব্যে এই ব্যক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণকে আত্মস্থ করেছে। নাট্যকারের বাস্তব দৃষ্টির সঙ্গে কবিকল্পনার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ এই কাব্যে হয়েছে। পুরাণ ও ইতিহাস মন্থন করে সুরধুনীর প্রবাহে কবি ভেসে এসেছেন বাংলা দেশে। হিন্দু-মুসলমানের স্বপ্নলালিত বৃহৎ ভারতবর্ষের এক বিচিত্র ছবিকে অসংখ্য কাহিনীতে গ্রথিত করেছেন। কবি মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের পাশে দীনবন্ধুও আপন ভাবলোক ও বাস্তবলোকের এক অভিনব রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন সুরধুনী কাব্যে। পুরাণ-ইতিহাসের পাশে সমকালকে এমন গভীর মর্যাদা দেওয়ার প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে বিরল। বস্তুতঃ সুরধুনী কাব্য, কবিভাবনা ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মহৎ শক্তির অধিকারী। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃকা মূর্তির এক আশ্চর্য নতুন রূপ সুরধুনী কাব্যে দেখা গেছে।

কিন্তু দীনবন্ধুর প্রতিভা কাব্যে সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়নি। নীলদর্পণ নাটকে যার সূচনা, সেই প্রতিভা সধবার একাদশীতে চরম স্ফূর্ত হয়েছে। বাংলা দেশের বিচিত্র স্থান ও বহু শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগ দীনবন্ধুকে শুধুই বহু দেশদর্শী করেনি—তাদের গভীরতম দুঃখ-বেদনা, হাসি-আনন্দের অংশীদার হওয়ার অনিবার্য অভিজ্ঞতাও তিনি পেয়েছিলেন। দীনবন্ধু-নাটকে তারই প্রকাশ। নীলকরের নিষ্ঠুর অত্যাচারে মর্মাহত হরিশ্চন্দ্র বা শিশিরকুমার পত্রিকার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। দীনবন্ধু লিখেছিলেন নাটক। অবশ্য একথাও ঠিক যে, নীলদর্পণ নাটক বিশেষ করে ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশিত হবার ফলে নীল-আন্দোলনে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধিই এই নাটকের একমাত্র লক্ষ্য হয়নি। তোরাপ, ক্ষেত্রমণির মত চরিত্র তাদের আদিম ও বর্বর জীবনের এক আশ্চর্য বলিষ্ঠ রূপকে তুলে ধরেছে বলেই এ নাটক নীল-আন্দোলন উত্তীর্ণ হয়ে এখনো পাঠকের ও দর্শকের চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর অসাধারণ সহানুভূতি ও বাস্তববোধের উল্লেখ করেছেন তাঁর জীবনীতে। প্রকৃত পক্ষে এই সহানুভূতি ও বাস্তববোধের সঙ্গে শিল্পীর এক অখণ্ড জীবনদৃষ্টি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে, তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র। বিস্ময় এবং

বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। গরীব-দুঃখীর দুঃখের মর্ম বুঝিতে অমন আর কাহাকেও দেখি না। তাই দীনবন্ধু অমন একটা তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর এই তীব্র সহানুভূতি কেবল গরীব-দুঃখীর সঙ্গে নহে; ইহা সর্বব্যাপী। তিনি নিজে পবিত্র চরিত্র ছিলেন, কিন্তু দুশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভান ছিল না। এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক, তিনি সর্ব-স্থানে যাইতেন, শুদ্ধাত্মা-পাপাত্মা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু অগ্নিমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় পাপাগ্নিকুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি-শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুষ্ক জীবনসুখ, বিফলীকৃত শিক্ষা, নৈরাশ্যপীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। বিবাহ বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুকে আমি বিশেষ জানিতাম, তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার বিশ্বাস, এইরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য সংসারে আর আমি দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ, তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে।” দীনবন্ধুর এই সামাজিক অভিজ্ঞতা ও তীব্র সহানুভূতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এক হাস্যরসিকের চিত্ত।

দীনবন্ধুর প্রধান পরিচয় নাট্যকার হিসেবে। একটি বিশেষ রীতি বা রূপকে গ্রহণ করেছিলেন তিনি এবং আলংকারিক সংজ্ঞার সাহায্যে তাকে Comedy এবং Farce নাম দেওয়াও চলে, কিন্তু যে চরিত্রগুলি তাদের বিপুল বৈচিত্র্যের মাধ্যমে নিজেদের তুলে ধরেছে, সেই চরিত্রগুলিকে দেখেছেন, শুধু নাট্যকার নন, জীবনরসিকও। “অন্যান্য লেখকদের সহিত হাসা যায়, আমোদ করা যায়, কিন্তু দীনবন্ধুর সহিত হাসিয়া আমোদ করিয়াই তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তাঁহাকে ভালোবাসিয়া জীবনের সুখ-দুঃখের পথে নিত্যকার সঙ্গী করিতে হয়। দীনবন্ধু শিল্পী হিসাবে না মানুষ হিসাবে বড় ছিলেন তাহা জানি না, কিন্তু শিল্পীসত্তা ও মানুষীসত্তার এরূপ নিবিড়তম সমন্বয় বোধ হয় আর কোথাও দেখি নাই। তিনি তাঁহার জীবনকে শিল্পের মধ্যে অবারিত করিয়া দিয়াছেন এবং শিল্পকে জীবনের মধ্যে পরিপূর্ণ মুক্তি দিয়াছেন”।১

দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলি সমকালীন বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে গভীর-ভাবে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং বাঙ্গালীর সমাজচেতনার এক বিশিষ্টরূপ তাঁর

১। অজিতকুমার ঘোষ **বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা** (১৩৬৭) ১৯৬০, ৩০০।

নাটকে ধরা দিলেও আঙ্গিকের ব্যবহারে দীনবন্ধু নিজস্ব পথটি খুঁজে নিতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন ইংরেজী নাটকের কাহিনী, চরিত্র ও পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁর নাটকের যে মিল, তার থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, দীনবন্ধু মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের মতই বিদেশী ভাবনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর নাটকের সামাজিক পরিবেশ বাংলা দেশের হলেও এদেরই অন্তরালে বিদেশী ছাপটুকু আছে। দীনবন্ধুর কৃতিত্ব যে, তিনি সেই বিদেশী প্রভাবকে শুধু আত্মস্থই নয়, নিজস্ব রূপে বিশিষ্ট করে নিতে পেরেছিলেন। তাঁর নাটকের কাহিনী, চরিত্র ও পরিস্থিতিতে যে হাস্যরস সৃষ্টি-কৌশল অনুসৃত হয়েছে তা প্রকৃত পক্ষে দীনবন্ধু সমকালের বাংলা নাটকে ছিল না। বস্তুতঃ বিদেশী কমেডি ও ফার্সের হাস্যরস সৃষ্টির বিভিন্ন কৌশলের সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলির মিল আছে। তাঁর নাটকের হাস্যরস সর্বত্রই উক্ত শ্রেণীর বেদনামিশ্রিত হাসির নয়। কোথাও অঙ্গভঙ্গী, কোথাও বিচিত্র পোষাক, কোথাও চারিত্রিক অসঙ্গতি, কোথাও ভাষা ও পরিস্থিতির মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর হাস্যরস প্রকাশিত হয়েছে। যে চরিত্রগুলিতে হাস্যকরতা ও হাস্যরসের প্রকাশ, তারা সকলেই যে শিল্পের প্রয়োজন সিদ্ধ করে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে এমন নয়। অর্থাৎ কমেডির চরিত্র-সৃষ্টিতে যে নৈতিকতার প্রতি লক্ষ্য থাকে তা সাধারণত ব্যঙ্গাত্মক, বিদ্রূপাত্মক নাটকগুলির লক্ষ্য; কিন্তু দীনবন্ধুর হাসিতে সূক্ষ্ম ও স্থূল, ব্যঙ্গবিদ্রূপের সঙ্গে বাক্-চাতুর্যের লীলা ও কারুণ্যের সমাবেশ হয়েছে। Restoration যুগের Mixed Comedyর এক অন্তরঙ্গ পরিচয় যেন দীনবন্ধুর হাস্যরসাত্মক নাটকগুলিতে পাওয়া যায়। দীনবন্ধু-নাটকের বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে তাই লক্ষ্য করতে হয় গ্রাম ও সহরের ব্যক্তি ও সমাজ স্থান পেয়েছে। সহর-জীবনের পরিশীলিত রূপের পাশে গ্রামের আদিম সহজ বলিষ্ঠতা দেখা গেছে। দীনবন্ধুর নাটকে এই দুই জীবন, সূক্ষ্ম ও স্থূল, সুস্থ ও বিকৃতের পাশাপাশি অবস্থান করেছে। ঊনবিংশ শতকের জীবন-জিজ্ঞাসা দীনবন্ধুকে মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের মত ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসা বা নিখিল মানুষের জিজ্ঞাসায় ব্যাপ্ত করেনি। মানুষ হিসেবে স্নেহে, সমবেদনায় যে জীবনগুলিকে তিনি দেখেছেন তাকে সাহিত্যে রূপদান করতে গিয়ে সরে এসেছন এক নির্লিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক আসনে। এখানে দীনবন্ধু শিল্পী হিসেবে নির্মম। রোগ ও ক্ষেত্রমণির দৃশ্যে এই নির্মম দৃষ্টির প্রকাশ। বিদেশী ভাবনা ও রীতির সঙ্গে যুক্ত এবং দীনবন্ধুর পূর্বকালের সাহিত্যে এই দৃষ্টির পরিচয় নেই। অবশ্য একথার প্রতিপাদ্য বিষয় এই নয় যে, দীনবন্ধুর নাটক ছদ্মবেশী বিদেশী সাহিত্য। প্রকৃত পক্ষে দীনবন্ধুও তাঁর সমকালের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কবি-ঔপন্যাসিকের মতই বিদেশী সাহিত্য ও সাহিত্য-ভাবনার সঙ্গে

পরিচিত ছিলেন। বাংলা দেশ ও বাঙগালীর জীবন তাঁর নাটকে যে চিত্র উপস্থিত করেছে তা ইংরেজী সাহিত্য-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত; একথা বলার অন্য যুক্তি দীনবন্ধু ও তাঁর সমাজও সেই ভাবনার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

দীনবন্ধুর নাটকগুলিকে আশ্রয় করেই যে সাধারণ রঙ্গালয় এক বিরাট প্রেরণা পেয়েছিল তা ঐতিহাসিক সত্য। বাংলা দেশের নাট্যরুচি যখন বিবর্তিত হচ্ছে এবং নাটকের অভাববোধও যখন গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে দীনবন্ধুর নাটকগুলিই বাঙগালীর রুচি ও রসবোধ তৃপ্ত করেছিল। নীলদর্পণ নামের অনুকরণে অন্য অনেক নাটক রচিত হয়েছিল, যেমন নিমচাঁদের অনুকরণ, হয়েছে পববর্তীকালে। কিন্তু এই অনুসরণ নাটকের নাম বা চরিত্রের ক্ষেত্রেই থেমে থাকেনি—বস্তুতঃ দীনবন্ধুর নাটকগুলিই বাংলা হাস্যরসাত্মক নাটক ও প্রহসনগুলির আদর্শ হিসেবে, পরবর্তীকালের নাট্যকাবদের অনুপ্রাণিত করেছে। অবশ্য প্রহসনের ক্ষেত্রে এই কৃতিত্ব প্রথম মধুসূদনের কিন্তু কিন্তু মধুসূদন প্রহসনে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিলেও তিনি লঘু নাটকের রীতিকে তাঁর শিল্পীচিত্তের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রও হাস্যরস সৃষ্টিতে শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও হাস্য--রসকে তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য দেন নি। অবশ্য তাঁর গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ দেবেন্দ্র, মানিকলালের পোষাক ও অস্ত্রসংগ্রহে যে হাস্যরস প্রকাশিত তাকে অনেক সময় দীনবন্ধুর হাস্যরসের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই জাতীয় হাস্যরসকে গ্রহণ করেছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসগুলির বিষাদ ও বেদনাকে আরো গভীর ও কঠিন করার জন্যে। বস্তুতঃ দীনবন্ধু সমকালের অধিকাংশ নাট্যকার, কবি-শিল্পীর পাশে দীনবন্ধুর এক বিশেষ মর্যাদা আছে। সে মর্যাদা শুধু সমকালের অন্যান্য নাট্যকারদের সঙ্গে তুলনায় নয়, সমগ্র সাহিত্যেও।

দীনবন্ধু পূর্ববর্তী শক্তিমান নাট্যকার রামনারায়ণ বা মধুসূদন যেখানে উৎকর্ষ দেখিয়েছেন তার ভিত্তি সামাজিক অসঙ্গতি, কিন্তু সামাজিক সমস্যার চিত্রণে আগ্রহ দেখানো সত্ত্বেও তাঁরা নাটকগুলিকে আড়ষ্টতা ও প্রাণহীনতা থেকে উদ্ধার করতে পারেন নি। প্রকৃত পক্ষে এঁরা কেউই নাটকের কোন আদর্শ দীনবন্ধুর সামনে রাখতে পারেন নি। অবশ্য মধুসূদনের প্রহসন দুটিতে লঘু নাটকের সূচনা ও বিকাশ লক্ষিত হয়েছিল এবং দীনবন্ধু নিশ্চিত এই দুটি প্রহসন থেকে প্রভাবিতও হয়েছিলেন। কিন্তু নাট্যকারের যে জীবন-দৃষ্টি সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হতে পারে তা রামনারায়ণের এবং মধুসূদনের মধ্যে পূর্ণভাবে বিকশিত হয় নি। মধুসূদনের নাট্যিক-প্রতিভা ছিল, কিন্তু

তার কল্পনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাঁর কাব্যে। তাঁর প্রতিভার প্রকৃতির সঙ্গে দীনবন্ধুর নাট্য-প্রকৃতির পার্থক্য মৌলিক, তিনি উচ্চতর ভাবলোক বা আদর্শলোকের সন্ধান করেন নি, হয়তো সে শক্তি তাঁর ছিল না। সমকালীন সমাজ-জীবনের মধ্যে এত বৈচিত্র্য, এত অফুরন্ত রস, এত অসঙ্গতি জনিত হাস্যপ্রবাহ, এত বিচিত্র চরিত্র যে ছিল, তার সন্ধান দীনবন্ধুই দিয়েছিলেন। কাব্য এবং কথা-সাহিত্যে যেমন মধুসূদন এবং বঙ্কিম এক নূতন নূতন জগতের আবিষ্কার করেছিলেন তেমনি দীনবন্ধু করেছিলেন এক জগতের আবিষ্কার। তা নিতান্ত দৈনন্দিন গদ্যময় জীবনের। মধু-বঙ্কিমের উচ্চতর ভাবলোক, বাস্তবলোকের সম্মিলন নয়, সেই জগৎ সম্পূর্ণ সুন্দর নয়, নীতির বিচারে আদর্শ নয়, কিন্তু দীনবন্ধু সেই জগৎকে ভালোবেসেছেন, নীতি দিয়ে বিচার করেন নি। বিচারকের ভূমিকা না নিয়ে দ্রষ্টার ভূমিকা নিয়েছেন। এইজন্যে অনেকে ভুল বুঝে তাঁর নাটকে অশালীনতা বা অনৈতিকতার অভিযোগ এনেছেন।

কাব্যে মধুসূদনের যে প্রকাশ, তা অমিতশক্তির অধিকারী তরুণ গরুড়ের মত। রেনাশাঁস মানুষের মত এক বিরাট জীবনবোধ তাঁর সমগ্র কাব্যদেহে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রও এক সুউচ্চ কবিকল্পনার অধিকারে জীবনের গভীর রহস্যের সমাধান চেষ্টায় ব্যর্থ ও বিক্ষত জীবনের হাহাকারকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বস্তুতঃ মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে মানুষের এক বিরাট পতন অবক্ষয়, বিষাদ ও বৈরাগ্যের রূপে চিত্রিত হয়েছে। জীবনে সুখ ও শান্তির চেয়ে দুঃখ ও বিষাদ, আনন্দ ও তৃপ্তির চেয়ে বৈরাগ্য ও শূন্যতা ট্রাজেডির শূন্যতাকে ধ্বনিত করেছে এঁদের সাহিত্যে। দীনবন্ধুর সাহিত্য এঁদের বিপরীত। তাঁর দৃষ্টিতে জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, তৃপ্তি-অতৃপ্তি এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। জীবনরসিকের স্নিগ্ধ ও দিব্য হাসিতে সব ব্যর্থতার বেদনা শান্ত কৌতুকে ও হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দীনবন্ধু-নাটকে হাসির উচ্ছলতা ও কৌতুকরসের প্রাবল্যের মধ্যে এমন এক প্রচ্ছন্ন বেদনা লুকিয়ে আছে, যা জীবনের সমস্ত অসঙ্গতিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে আরতি করতে পারে। দীনবন্ধু-উত্তরকালে দুজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের স্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এখানে দীনবন্ধুর পার্থক্য। ত্রৈলোক্যনাথ ও ইন্দ্রনাথ উভয়েই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে গ্রহণ করেছিলেন। সামাজিক অনাচার ও দুর্নীতিকে ক্ষমার চোখে কেউই দেখেন নি। ত্রৈলোক্যনাথের রঙ্গে যদিও এক স্নিগ্ধ হাসি ও নির্লিপ্ত উদাসীনতা আছে, কিন্ত তা কোথাও সহজ স্বচ্ছ হাস্যরসকে দীনবন্ধুর মত অবারিত করতে পারে নি। ইন্দ্রনাথ ব্যঙ্গরসকেই প্রধান করেছেন। দীনবন্ধুর হাস্যরস সৃষ্টিতে নির্লিপ্ত শিল্পের ক্ষেত্রে, জীবনের প্রতি নয়, তাই সামাজিক অসঙ্গতি ও অনাচারকে তার যথার্থ

রূপে অংকিত করে এক স্নিগ্ধ হাসিতে তার ক্ষতচিহ্নগুলিকে তিনি প্রলেপদান করতে সমর্থ। এক অখণ্ড দৃষ্টির অধিকারী হওয়ার ফলে জীবনের সামগ্রিক রূপটি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। পাপ বা দুর্নীতির প্রতি ব্যঙ্গের প্রকাশ ঘটিয়েও তাকে নিতান্ত হৃদয়হীনের মত পরিত্যাগ করেন নি—গেঁথে রেখেছেন সযত্নে তাঁর শিল্পে। তাই তাঁর শিল্পে এত হাস্যাস্পদ ও ঘৃণিত চরিত্র, কিন্তু এই চরিত্রগুলির সৃষ্টিতে স্রষ্টার মনোভাবটিও উজ্জ্বল।

দীনবন্ধু মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিভা এবং কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর প্রতিভাতেও একটি মহৎ শিল্পীর প্রেরণা ও শক্তি ছিল। তার প্রকাশ ঘটেছে দীনবন্ধুর নাটকে। বাস্তব-জীবনের এমন নিখুঁত ও পরিপূর্ণ চিত্র তাঁর সমকালের অন্য কোন শিল্পী সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত করতে পারেন নি। এখানেই দীনবন্ধুর স্বকীয়তা নয়, তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠত্ব হাস্যরসের ক্ষেত্রে। নাট্য-সাহিত্য ও হাস্যরসের ক্ষেত্রে যে বাঙ্গালী সাহিত্যকেরা বাস্তবধর্মী, তাঁদের দৃষ্টি, অভিজ্ঞতা ও সমগ্রতারবোধ দীনবন্ধুর তুলনায় হীন। সর্বোপরি হাস্যরসের বিপুল বৈচিত্র্যে ও জীবন-রসিকের অখণ্ডতার ক্ষেত্রেও দীনবন্ধু অদ্বিতীয়।

গ্রন্থপঞ্জী (ক)

দীনবন্ধু মিত্র, নীলদর্পণ	...	...	১৮৬০
নবীন তপস্বিনী		...	১৮৬৩
বিয়ে পাগলা বুড়ো		...	১৮৬৬
সধবার একাদশী	...	...	১৮৬৬
লীলাবতী	...	...	১৮৬৭
সুরধুনী কাব্য ১ম খণ্ড	...	...	১৮৭১
জামাই বারিক	...	...	১৮৭২
দ্বাদশ কবিতা	...	...	১৮৭২
কমলেকামিনী নাটক	...	...	১৮৭৩
সুরধুনী কাব্য ২য় খণ্ড	...	...	১৮৭৬

জেনানা যুদ্ধ, (১৩৩৩) ১৯২৬, (জামাই বারিক প্রহসনের অন্তর্গত)

দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী—(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ) ১৯৪৩-৪৪

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী—(১ম ও ২য় ভাগ) বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৫০